তুলি

[চিত্রকলা, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার মরমী কাহিনী]

বৈদ্যনাথ ঘোষ

সোল সেলিং এজেন্ট

নির্মল বুক এজেন্সী

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুখবন্ধ

১৯৩৪ সালের লেখা বড় গল্প। যৌবনারম্ভে কাঁচা হাতের লেখা গল্প, প্রিয়জনের উৎসাহে সযত্নে কপি করা লেখাটা বাণ্ডিল বাঁধা পড়েছিল, কোথাও ছাপতে পাঠানোর সাহসে কুলোয়নি। পঁচাত্তরের কোঠায় পৌঁছে, প্রিয়জনের হাতের লেখার আকর্ষণে পড়তে শুরু করে, পঁচাত্তরের তুফান থেকে পঁচিশের ঝরনার স্বচ্ছ জলে তলিয়ে গেলুম। আমাদের প্রিয় সেদিনের কলকাতার সহজ সরল মধ্যবিত্ত মানসিকতার হারানো কথা হারিয়ে না যায়, সেই লোভে নতুন করে লেখা আরম্ভ করলুম গল্পটাকে নিয়ে। লেখা শেষে পড়ে দেখি, অতীত দিনের ফ্রেমে বাঁধানো রঙিন ছবি, উপন্যাসও বলা যেতে পারে। পাঠক-পাঠিকার কাছে রসোত্তীর্ণ হলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

॥ ১ ॥

ভোরের সূর্য দেখা দেওয়ার আগেই হাওড়া স্টেশনের সন্ত ধোয়া প্ল্যাটফর্মে পাঞ্জাব মেইল, রাজকীয় আড়ম্বরে এসে থামলো। মাথায় পাগড়ী, লাল জামা, হাতের বাজুতে বাঁধা চকচকে পেতলের বাদামী সাইজের কুলী নম্বর আঁটা কুলীর সারি ট্রেনের কামরাগুলোর সমান্তরালে দাঁড়িয়ে। একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজার সামনে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ইশারায় কুলী ডাকলো। ই, আই, আর, রেলের দ্বিতীয় শ্রেণী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পুরু গদি আঁটা চারটি বার্থ উপরে, নীচে, মধ্যে, প্রশস্ত জায়গার একপাশে গোছানো সুনীলের সুটকেস বাস্কেট ও একটি টিন। দুজন মাত্র যাত্রী এই কামরায়। দুটি কুলী উঠে দুজনের মালপত্তর দেখে নিল। একজন বললে—'হাওড়া পুল খুলা হায় সাব!' সুনীল হাতের ঘড়ি দেখে নিয়ে বললে, 'ক্যান্টিন মে চলো!' প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গেটে টিকিট দিয়ে ডানদিকে এগুলো। ক্যান্টিন দরজায় কুলীকে বললে, 'সামান লেকর বৈঠো।' কুলী বললে, 'বহুৎ দের হোগা সাব!' সুনীল একটু হেসে বললে, 'ঠিক হ্যায়, বখশিস্ মিল যায়গা।' কুলি খুশি মনে মালপত্তর গুছিয়ে দরজার পাশে উবু হয়ে বসে হাত ঝাড়তে লাগলো খইনী বানাবার মতলবে। ফাঁকা ক্যান্টিনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো সুনীল। আস্তে আস্তে আরো কয়েকজন যাত্রী এসে গেল। উর্দি পরা বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেল সকলের। সুনীল অমলেট্ টোস্ট আর একপট চা অর্ডার দিয়ে, হলের কোণে বেসিনে চলে গেল হাত-মুখ ধুতে। রুমালে মুখ মুছে, দরজার বাইরে কুলীটাকে দেখে নিল, সে তখন খইনীতে চাপড় মারছে। চেয়ারে বসে আরামই লাগছে; চা টোস্ট আসতে বেশ সময়ও কেটে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছে, ভালই, যত দেরী হয় ততই ভাল। হাওড়ার ভাসা পুলের মাঝখান দিয়ে এখন স্টীমার, বড় নৌকোর যাতায়াত চলছে। চা পান শেষ করে যেতে যেতে পুলের খোলা অংশ জুড়ে যাওয়ার সময় হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। চা পান শেষ করে বেয়ারাকে পয়সা চুকিয়ে তাকে দু-আনা বখশিস্ দিয়ে সুনীল হল থেকে বেরোল। ঝিমনো কুলী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলিয়ে সাব, পুল লাগা দিয়া।' স্টেশনের বাইরে আসতেই গাড়ী-ওয়ালারা ছেঁকে ধরলো। ফিটন, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, সারবন্দী ঘোড়ার গাড়ীর আর রিক্সার ভিড়। হেদুয়া যাওয়ার একটা সেকেণ্ড ক্লাস, রবার লাগানো চাকার গাড়ী দরাদরি না করেই উঠে বসলো। কুলীটা গাড়ীর মাথায় মালপত্তর তুলে দিয়ে গাড়ীর দরজায় হাত পাতলো। অন্য সময় হলে চার আনা দিলেই হতো, আজ দেরীর

জন্যে একটা আধুলী দিতে কুলী খুশি মনে সেলাম ঠুকলো। গাড়ী চললো দুল্‌কী চালে, সুনীলের মনও নেচে উঠলো। সকালে কোন ভিড় নেই; ধোয়া পরিষ্কার রাস্তায় গড়িয়ে চললো গাড়ী। পাটনায় এমনটি পাওয়া যায় না। ফুরফুরে গঙ্গার বাতাসে সুনীলের চোখ জুড়ে আসতে চাইলো। ঘোড়ার ক্ষুরের নাল বাঁধা থপ্‌ থপ্‌ শব্দ; গাড়ী গড়িয়ে চললো, টাকৃশাল ডাইনে রেখে পোস্তার বাজারের দিকে। ভোরের জনহীন রাস্তা, মাঝে মাঝে গরুর গাড়ী আর গঙ্গাস্নান অভিলাষী নর-নারী দু'একজন। সুনীল হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগলো। ছুটি হলেই কলকাতা আসা; এবারে একটু দেরী হলো। বাবার শরীরটা খারাপ হওয়ায় বাবাকে একা ফেলে কি করে আসবে। যদিও বাবা বারবার বলেছিলেন, তুই চলে যা, আমি ঠিক হয়ে যাবো; তুই এখানে ছট্‌ফট্‌ করবি, ওখানে তোর মামণি ছট্‌ফট্‌ করবে। সুনীল চায়নি বাবাকে একা অসুস্থ ফেলে চলে আসতে। এখন সে বড় হয়ে গ্যাছে। এসব কথা মনে আসে। বাবা আজকাল তেমন আগের মত শক্তপোক্ত নেই। কেমন মনমরা, শুধু চাকর-বাকরের ভরসায় একলা বাড়ীতে দিনযাপন। কতবার বলি, বাবা, কলকাতা চলো, ভবানীপুরের বাড়ীর ভাড়া উঠিয়ে খালি করে আমরা বেশ থাকতে পারবো। নাই বা হলো এতবড় বাড়ী। বাবা বলেন 'দেখি, দেখি!' আসল কথা মায়ের স্মৃতি ছড়ানো ওই বাড়ী-ঘরদোর ওঁকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। ঘরে ঘরে মায়ের আঁকা ছবি, মায়ের ছবি, এসব তুলে আর কোথাও নিয়ে গেলে এই স্মৃতি যেন মুছে যাবে বাবার কাছে। বাবার কাছে মা পুরোপুরি হারিয়ে যাবেন। বাবার জন্যে বড় কষ্ট হয়, তারই মুখ চেয়ে বাবা দ্বিতীয়বার বিয়েতে রাজী হননি মামণির কাছ থেকে শুনেছে। বড় হয়ে সে বাবার কাছে এসেছে; দিনের পর দিন বাবার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা দেখে তার খুব খারাপ লাগে, যদি দু' একজন ভাইবোন থাকতো।

গাড়ি হাটখোলার রাস্তায় এসে পড়েছে। এবারে কলকাতা যাত্রা করা থেকেই বাবার কথা খালি মনে পড়ে যাচ্ছে। একেবারে একা মানুষ দীর্ঘদিন কি করে জীবন কাটিয়ে চলেছেন, আশ্চর্য! শুধু বিকেলে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে গল্পসল্প, আলোচনা। রাত্রি আটটার মধ্যে বাড়ী ফেরা, রাত ন'টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে মশারি ফেলে বিছানার মধ্যে বই পড়া। আমি জেগে থাকলে আমায় সঙ্গে স্কুল নিয়ে খবরাখবর নেওয়া। সুনীল চমকে উঠলো,—রাস্তায় ছব্‌···ছ···ব্‌··· শব্দে ধোয়া হচ্ছে রাস্তাঘাট। কালো পাথরের ইটে বাঁধানো কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন রাস্তা হাটখোলার। প্রাচীন বাসিন্দাদের বসবাস ছিল। গঙ্গার জলপথে বহু প্রাচীন কাল থেকে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা-বাণিজ্য। রাস্তা দেখতে দেখতে বাবার চিন্তা

চলে গেল সুনীলের। এখনও সব গ্যাস নেভানো হয়নি, মই কাঁধে ছুটছে বাতিওয়ালা। কালীবাড়ী নিমতলা বাঁয়ে ফেলে গাড়ী বাঁকলো ট্রামলাইন বরাবর। এই ট্রামলাইনটা প্রথম হয়েছিল ঘোড়ায় টানা।

হাটখোলায় দত্তবাড়ী ছাড়িয়ে, জোড়াবাগান থানা ছাড়িয়ে গাড়ী যখন চিৎপুর রোডে কোম্পানীবাগান এসে গেল, তখন রোদ বেশ উঠে গেছে। কোম্পানীবাগান ডাইনে রেখে বিডন স্ট্রীট ধরে গাড়ী সোজা চললো। বাবার কাছে শোনা, এইদিকটাই আদি কলকাতা। আমাদের পুরোনো বাড়ী এইদিকেই ছিল। রাস্তাটার নাম আমার কিছুতেই মনে থাকে না। মামণিকে জিজ্ঞেস করতে হবে এবারে। মামণিদের, মানে ফণীজেঠুদের পুরোনো বাড়ী আমাদের পাশাপাশিই ছিল। শুনেছিলুম নতুন-বাজারের কাছাকাছি কোথাও। এখন খালি দোকানঘর, দোকানি আর নানা বিদেশীর ভিড়। জমিদার, মধ্যবিত্ত আদি বনেদি বাঙালীরা বেশীর ভাগই কলকাতায় এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবার কত গল্প মনে পড়ছে পুরোনো বাড়ী নিয়ে। বাবারা তিন ভাই; ঠাকুরদা বেঁচে থাকতেই তিন ভাইকে ভাগাভাগি করে দেন। বড় দুই ভাইকে আদি বাড়ী পার্টিশন করে, ছোট ছেলে বাবাকে ভবানীপুরের ছোট বাড়ীটা দিয়ে, টাকা-পয়সা হিসাব কষাকষি করে, তিন ভাইকে এমন ভাগ করলেন, যাতে ভবিষ্যতে কোন মনোমালিন্য না হয়। এইটেই নাকি অনেক উচ্চ-মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের রীতি কলকাতায়। আমাদের পাশের বাড়ীর কর্তাও ঠাকুরদার দেখাদেখি তাঁর দুই ছেলের বড় ছেলেকে আদি বাড়ী দিয়ে, ছোট ছেলেকে হেদুয়ার কাছে একটি বাড়ী কিনে দিয়েছেন। হিসাবপত্তর করে কিছু কোম্পানীর কাগজও দিয়েছেন। ইনি বাবার ছোটবেলার বন্ধু; বয়সে কিছু বড় হলেও ছোটবেলা থেকেই সব ব্যাপারে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ-ভালবাসা চলাফেরা। যদিও এঁরা কায়স্থ। ফণীজেঠুর বিবাহ নিয়ে একটু গণ্ডগোল পাকিয়েছিল বুড়োদের আমলে। মামণির বাবা ছিলেন কট্টর ব্রাহ্ম সমাজের; বাধ্য হয়ে ফণীজেঠুর মামণির সঙ্গে বিবাহ হলো ব্রাহ্মমতে; জেঠু কিছু মানতেন না। কলকাতায় হিন্দু আর ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বিভেদও যত ছিল, মিলমিশও তত। কলকাতা সহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যা লোপ পেতে লাগলো। বাবা বলেন, ওকালতির অভিজ্ঞতার থেকে এটাই নাকি ভাল নাগরিক জীবনে। এইসব নানা চিন্তায় মজে থাকা সুনীল চমকে উঠলো গাড়োয়ানের চিৎকারে। 'হেদুয়ায় সাব, হেদুয়া!' সুনীল বাইরেটা দেখে নিয়ে বললে, 'থোড়া আগে ঘুমাকে লাল গেটকা সামনে রোখ!'

মোড় ঘুরে গাড়ী থামলো একটা দোতলা বাড়ীর লাল গেটের সামনে। সম্মুখে সারবন্দী বাড়ী দু'ধারে। সুনীল গাড়ী থেকে নামলো, গাড়োয়ান গাড়ীর চাল থেকে নেমে আগে

একটা থলিভরা ঘোড়ার খাবার ঘাস নিয়ে ঘোড়ার মুখের সামনে ঝুলিয়ে দিল। সুনীল গেটের ভেতর ঢুকে সামনে বিশে চাকরকে দেখে বললে, 'গাড়ী থেকে জিনিসপত্তর নামিয়ে আনো আর এই ভাড়াটা দিয়ে দাও।' তারপর পকেট থেকে দাড়ি-গোঁফ বার করে পরতে পরতে সামনে এগিয়ে কড়া নাড়লো। কামিনী দরজা খুলে তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কাকে চান বাবু?' সুনীল গম্ভীরভাবে বললে, 'সুলেখাদেবী আছেন?'

'হাঃ, বাবু।'

'তাকে খবর দাও।'

কামিনী চলে গেল। একটু পরেই ঘুম জড়ানো চোখে সুলেখা দরজায় গোড়ায় এসে সাহেবী পোষাক পরা দাড়িওয়ালা অপরিচিত ব্যক্তি দেখে বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি প্রয়োজন জানতে পারি?' সুনীল একটু কেসে নিয়ে বললে, 'আমি পাটনার শচীন্দ্রনাথ মুখার্জীর কাছ থেকে আসছি। তিনি কিছু জিনিসপত্তর পাঠিয়েছেন।' শচীন-কাকুর নাম শুনে সুলেখা তাড়াতাড়ি বললে, 'দাঁড়ান, মাকে ডেকে দিচ্ছি।'

সুলেখা ভেতরে যাওয়ার পর সুনীল দাড়ি-গোঁফ পকেটে ভরে দাঁড়িয়ে রইল। আনন্দময়ী ঘরে ঢুকতেই একলাফে পায়ের ধুলো নিয়ে বলে উঠলো, 'আমি মামণি, আমি চমকে দিতে চাইছিলুম।'

সুলেখা অবাক হয়ে চাইল—কোথায় দাড়ি-গোঁফ, এ তো সুনেদা! বদমাস!' রাগে ফুলতে লাগলো সে।

আনন্দময়ী খুশী ভরা গলায় বললেন, 'সুলেখা যে বললে, কে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক এসেছেন। কোথায় তিনি?'

সুনীল হেসে বললে, 'দেখ না, সুলেখা ঘুমের ঘোরে কি দেখেছে, আর তোমায় আজেবাজে বলেছে। এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুলে এইরকমই হয়, বুঝলে মামণি!'

রাগে চেঁচিয়ে উঠলো সুলেখা, 'মিথ্যুক কোথাকার, পাজি বদমাস কোথাকার!'

'দেখ মামণি, গোঁফ-দাড়ি আছে।'

সদ্য সবুজ গোঁফের ছায়াপড়া কৈশোর উত্তীর্ণ সজীব মুখখানা আদরে চেপে ধরে আনন্দময়ী হেসে স্নেহদৃষ্টিতে চাইলেন, আর বেড়ালের মত রাগে ফুলতে ফুলতে এসে সুলেখা এলোপাথাড়ি দু-হাতে সুনীলকে মারতে লাগলো। 'পাজি বদমাস মিথ্যুক!'

সুনীল আত্মরক্ষার ভরসায় আনন্দময়ীর সামনে পেছনে ঘুরতে লাগলো, 'মামণি, দেখ আমায় কি রকম মারছে, আমিও কিন্তু এবার হাত চালাব।'

'আঃ থাম থাম, তোদের বয়স বাড়ছে না কমছে? সুনেকে ঘরে যেতে দে, হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুক। সারারাত ট্রেনে এলো, রাস্তার জামা-প্যান্ট ছাড়ুক!'

'মামণি, বাবার এক মক্কেল বাড়ীর করা একটিন ঘি দিয়েছে। দেখ সব কোথায় রাখলো, না দাড়িওয়ালা লোকটা স্থলেখার ভয়ে ফেরৎ নিয়ে গেল।'

'ধেৎ! মিথ্যুক!' বলে স্থলেখা ঘরের বাইরে চলে গেল। আনন্দময়ী স্থনীলকে নিয়ে ভেতরের বারান্দায় যেতে যেতে বললেন, 'বিশে, দাদাবাবুর জিনিসপত্তর দাদাবাবুর ঘরে রেখে দাও দোতলায়। ঘর বিছানা টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করতে বলো কামিনীকে। স্থনে, তুই এখন আমার ঘরে আয়, পায়জামা-সার্ট দিচ্ছি, আমার কাছে আছে। কলঘরে ট্রেনের জামা-প্যান্ট ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নে, আমি দেখি ঠাকুর কি করছে।'

'মামণি, জেঠুবাবু?'

'এখনও শুয়ে আছেন, কাল অনেক রাত পর্যন্ত লাইব্রেরীতে ছিলেন।'

স্থনীল একটু হেসে বললে, 'এখনও নোটবই লেখা চলছে রাত জেগে?'

'কে বলতে যাবে বল?' ম্লান কণ্ঠে বললেন আনন্দময়ী। সেইসময় মণ্টু, মানে স্থলেখার ছোট ভাই পেছন থেকে বলে উঠলো, 'গুডমর্নিং স্থনেদা!'

'দূর বোকা, স্থপ্রভাত বল।'

স্থনীলের সামনে এসে সে বললে, 'ওটাও কিন্তু ধার করা।'

আনন্দময়ী রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'যাও ডেঁপো ছেলে, পড়তে যাও।' স্থনীলের দিকে চেয়ে বললেন, 'স্থনে, তোর বাবা কেমন আছে?'

'বাবার শরীর একটু খারাপ হয়েছিল, এখন ভাল দেখে এসেছি।'

আনন্দময়ী চলে গেলেন। আনন্দময়ীর দেওয়া পাজামা-সার্ট তোয়ালে গামছা নিয়ে কলঘরের দিকে এগোল স্থনীল। আনন্দময়ীর ডাক শোনা গেল, 'স্থলেখা, ও স্থলেখা, ময়দাটা মেখে বেলে দিয়ে যাও মা! কোথায় গেলি?'

স্থনীল কলঘরে বেশ সময় নিলো। সকালের কোন কর্মই হয়নি। মাথার ওপর ঝাঝ্‌রি খুলে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সাবান মেখে পুরো চান সেরে ঝরঝরে হয়ে বেরোল যখন, বারান্দায় মুখোমুখি হলো জেঠুবাবুর সঙ্গে।

'হ্যালো ইয়াংম্যান, খবর কি? চিঠিপত্তর না দিয়ে? বাবার শরীর ভাল তো? চিঠি পেয়েছিলুম ফ্লু-এর মত হয়েছিল?' গড়গড় করে বলে গেলেন বসুমশাই। পরনে খদ্দরের পাজামা, হাতকাটা পাঞ্জাবী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা।

পায়ের ধুলো নিয়ে স্থনীল বললে, 'দু-তিন দিন জ্বরটা নেই, ভালই আছেন। আপনাকে গরমের ছুটিতে পাটনায় পাঠাতে বলে দিয়েছেন।'

'বাবা, যা গরম তোদের ওখানে!'

'মোটেই ভয় নেই জেঠুবাবু, বাবা যা ব্যবস্থা করে রেখেছেন দার্জিলিং করে দেবেন।'

'কি রকম ?'

'বাবা চারটে বড বড খস্‌খসের পর্দা ত্ব'দিকের বারান্দায় ঝুলিয়ে পিচকিরি দিয়ে জল দেবার ব্যবস্থা, আপনার জন্যে এর মধ্যেই ঠিকঠাক, কবে আপনার টিকিট রিজার্ভ করবো বলুন !'

'বটে ! বটে ! এখনো সেই ভজন খানেক কাজের লোক নিয়ে ভূতভোজন চলছে ?'

হেসে স্থনীল বললে, 'বাবা বলেন, কোথায় যাবে ওরা, অনেক দিন আছে, তোমার মায়ের আমল থেকে, থাক্‌ থাক। বলুন কোন তারিখে যাবেন, একা একা গেলে আমি না হয় সঙ্গে যাবো পৌঁছে দিতে।'

'ওঃ কতবড তালেবর মাতব্বর, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন ! আনন্দ, শুনছো তোমার বড বেটার কথা ? চলো আগে জলখাবার খেয়ে নাও, পরে পরামর্শ করা যাবে।'

ফণীবাবু সামনের ঘরে এগোলেন, পেছন পেছন স্থনীল। রান্নাঘরের পাশে ঘরটি বেশ বড়, মেঝেটা সাদা-কালো মার্বেলপাথরের। একধারে ছোট একটি টেবিল, চারটি চেয়ার পাতা। সাধারণতঃ মেঝেতে মোটা ঘরেবোনা আসন পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ঘরের চারদিকে চারটি দেওয়াল আলমারী। একটিতে কাঁচের কাপ-ডিস ইত্যাদি, বাকি ত্বটোয় ভাঁড়ারের জন্যে একটা খাবার রাখার। মেঝেতে আসন পাতা হয়েছে, কাঁসার চকচকে গেলাস ঢাকা দেওয়া। স্থনীল, ফণীবাবু ও মণ্টু বসলো। আনন্দময়ী ঘরে ঢুকলেন ত্বটো থালা নিয়ে ছোট ছোট টেনিস বলের মত ধবধবে ফুলকো লুচি চুড়করা। স্থনীল আর ফণীবাবুর সামনে নামিয়ে আবার আনতে গেলেন মণ্টু, স্থলেখার জন্যে। আর ত্বটো লুচির থালা নামিয়ে দিলেন মণ্টুর সামনে আর পাশে স্থলেখার জায়গায়। বললেন, 'স্থলেখা, তুইও বসে যা, আলুরদম আর পটল ভাজা দিয়ে, বাকি কামিনী দেখবে পরে।' স্থলেখা পরিবেশন শেষ করে বসে পড়লো আসনে। একটা বড় কানা ওঠা থালায় চূড়করা লুচি আর আলুর দম রাখলো কামিনী। পরে লাগলে দেবেন বসে আনন্দময়ী একটা ছোট চৌকিতে বসলেন। পাথরের একটা বড় রেকাবীতে কাটা ফল এনে কামিনী রাখলো পাশে। সবাই খাওয়া শুরু করলো। আনন্দময়ী বললেন, 'জানো ! এবারেও এক টিন গাওয়া ভঁইষা ঘি ঠাকুরপো পাঠিয়েছেন।'

ঠাট্টার স্থরে ফণীবাবু বললেন, 'মক্কেলের ঘাড় ভেঙে উকিলবাবুদের…'

কথার মাঝে বলে উঠলো স্থনীল, 'না না জেঠুবাবু, ওদের ঘরের তৈরি ঘি মাখন প্রায়ই দিয়ে যায়, বারন করলে শোনে না। এবারে যেই জানলো আমি কলকাতা আসবো, ঘি নিয়ে হাজির হলো সকালে। বাবা জোর করে পথ খরচ বলে কিছু টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেন। ভয় দেখালেন, নয়তো ফেরৎ নিয়ে যাও।' সকলের খাওয়া

শেষ হতে কামিনী ফল দিলো পাতে পাতে, আনন্দময়ী আলমারী থেকে চেঙারিটা নিয়ে একটা করে কড়াপাকের সন্দেশ দেবার সময় সুনীল হাত নাড়তে বললেন, 'ওরে খেয়ে দেখ্, সিমলের গিরিশের সন্দেশ তোদের পাটনায় মেলে না, মিষ্টি হলেই বাবুর মুখ ভারি!' জোর করে একটা ফেলে দিলেন। খাওয়াশেষে ফণীবাবু বললেন, 'উঠছি, চা-টা লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দিও।' তিনি চলে গেলেন।

সুনীল বললে, 'দেখ দেখ মামণি, সুলেখার মুখটা হুতম পেঁচাকেও হার মানিয়ে দেবে।' সুলেখা খিঁচিয়ে উঠলো, 'মিথ্যুক! পাজি!' আনন্দময়ী হাত নেড়ে বললেন, 'আবার শুরু হলো?' সুলেখা বললে, 'দেখ মা, সুনেদা দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে ঘরে ঢুকলো আমাকে ভয় দেখাতে। যেই তুমি এলে, মুখ ফিরিয়ে কোথায় লুকিয়ে, তোমার কাছে আমায় মিথ্যুক বানালো!' মণ্টু হাসতে হাসতে বললে, 'দিদি, আমি ধরে ফেলেছি কলঘরে প্যাণ্টের পকেটে, ওগুলো আমি নেবো সুনেদা মাস্টারমশায়কে তাক্ লাগাতে!'

'নাওগে, দেখেই যখন ফেলেছ! কলঘরে ফেলে আসা বড়ই বেকুফি হয়ে গ্যাছে।'

সুলেখা চেঁচিয়ে বললে, 'দেখলে মা, তুমি তো সুনেদার কোন দোষই দেখতে পাও না! মণ্টু, মাকে দেখা তো।'

'আর দেখাতে হবে না, আমি যাই, আমার এখনও অনেক কাজ পড়ে।' তিনি উঠে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিনজন বারান্দা দিয়ে আনন্দময়ীর ঘরের দিকে গেল। ঘরজোড়া বড় খাট, সকলেরই আড্ডা দেওয়া, গড়াগড়ি খাওয়ার প্রশস্ত পছন্দসই জায়গা।

ক্লান্তির আমেজে খাটে গড়াতে গিয়ে সুনীল উঃ, আঃ···আঃ···করে চেঁচিয়ে উঠলো। মণ্টু ও সুলেখা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, 'কি হলো? কি হলো?'

'ওরে পিঠে ভয়ানক ব্যথা, দেখ তো গেঞ্জি তুলে!'

গেঞ্জি আস্তে তুলে, আর্ত-চিৎকার করলো সুলেখা—'ইস! এটা কোথায় ধাক্কা লাগালে?' সোনালী রঙের ডানদিকে লাল কালশিরে পড়া একটা ফোলা জায়গা। সুনীল বললে, 'মনে পড়ছে আমার। দেখি তোমার হাতটা।' সুলেখার দুটো হাত তুলে মোটা বালা দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হেসে বললে সে, 'অবলার বল, বালা, তাই না?'

লজ্জায় লাল হয়ে মাথা হেঁট করলো সুলেখা। মণ্টু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মাকে ডেকে আনি, দেখিয়ে কি করতে হবে জেনে নিই?'

সুনীল তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে বললে, 'চুপ। একদম না। মামণিকে যদি জানাও, তোমার সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে মণ্টু!' সুলেখা ভীরুস্বরে বললে, 'কিন্তু মাকে না জানালে, কি যে করা দরকার?' সুনীল ভেবে বললে, 'আয়োডেক্স আছে, নিয়ে

এসো।' সুলেখা উঠে গেল। সুনীল মন্টুর গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, 'মামণিকে বলো না, তুমি যাও, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।' আয়োডেক্স এনে সুলেখা আস্তে আস্তে গেঞ্জিটা কাঁধ পর্যন্ত তুলে নিলে, সুনীল কিছু বলার আগে আঙুলে আয়োডক্স নিয়ে গোটা পিঠে মাখিয়ে দিলে। খুব সাবধানে লালচে অংশটায় চেটো আর আঙুল দিয়ে মালিস করতে করতে অপরাধের আবেগে সুলেখা বললে, 'সুনেদা, লাগচে না তো? লাগলে বলবে।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে মালিস হবার পর সুনীল বললে, 'খুব ভাল লাগছে। তোমার এত নরম হাত, বালা না থাকলে মার খেয়ে আরামই হতো।' সুনীলের পিঠে কপাল ঠেকিয়ে সুলেখা কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বললে, 'আমায় ক্ষমা কর সুনেদা, আমি বুঝতে পারিনি, আমায় ক্ষমা করো!' গরম গরম চোখের জল পিঠে গড়িয়ে পড়ায় সুনীল চমকে পেছন দিকে হাত বাড়ালো। সুলেখাকে সামনে এনে মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, বোজা চোখ দুটোয় দুফোঁটা জল তখনও টলটল করছে। সুলেখার মুখ যেন নতুন দেখছে সুনীল; নিবিড় চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে ভারী গলায় বললে, 'কেন তুমি ক্ষমা চাইচো বারবার?' হাত চেপে ধরে বললে, 'দোষ আমার হয়েছে, মামণির কাছে মিথ্যা তো আমি বলেছি। কেন এত অপরাধী ভাবচো নিজেকে, ভুলে যাও। তার মুখটা দুহাতে তুলে বললে, 'হাসো বলচি সুলেখা, হাসো!' সুলেখার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটলো।

॥ ২ ॥

বিকেল গড়িয়ে চারদিকে আবীর রাঙানো সন্ধ্যা। ধোয়া পরিষ্কার চকচকে পিচের রাস্তায় ভ্রমণ ইচ্ছুক সুবেশ ভদ্রলোকদের হেদোর দিকে ঢিলেঢালা পদক্ষেপ চলছে। বিকেল থেকে দক্ষিণের হাওয়া জ্যৈষ্ঠের গরম ভুলিয়ে দেয় কলকাতার বাসিন্দাদের। সকলের মন ফুরফুরে হয়ে ওঠে। অবশ্য এ কথা হয়তো মধ্যবিত্ত বা চাকুরে বাবুদের বেলায়। রাস্তা দিয়ে বেলফুলের মালা নিয়ে হাঁক দিয়ে চলেছে। ছোকরারা, এমন কী মধ্যবয়সী বা বুড়োরাও মালা কিনে হাতে জড়িয়ে নিচ্ছেন। এই সময়ে রাস্তাটা বেশ লাগে সুলেখাদের দোতলার বারান্দা থেকে। একটি টেবিল আর চারটি চেয়ার পাতা। টেবিলের ওপর ট্রে-তে চায়ের সরঞ্জাম, ডিসে কিছু বিস্কুট রাখা। দোতলায় এসে আনন্দময়ী সুনীলের ঘরের দিকে চেয়ে ডাকলেন, 'ওরে সুনে, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!' বিকেলের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আনন্দময়ী চুল বাঁধা, গা ধোয়া সেরে, চওড়া লালপাড় শান্তিপুরী শাড়ী, হাফ হাতা ব্লাউজ, সাদা সায়া পরেছেন; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ স্নেহভরা ভারিক্কী মুখখানা সন্ধ্যার রক্তিম আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছিল।

'এই যে যাই মামণি' বলতে বলতে এসে চেয়ারে বসে আনন্দময়ীর দিকে চেয়ে রইল।

'কী রে, কি দেখছিস?' হেসে বললেন আনন্দময়ী।

'আমাকে তুমি আর তেমন ভালবাস না মামণি।' সুনীল ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললো মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে। আনন্দময়ী কাছে গিয়ে বললেন, 'কেন, কি অপরাধ করে ফেলেছি শুনি?'

'আগে আমায় ডাকতে না, বিছানায় গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে, সুনে, ওঠ বাবা, চা জুড়িয়ে যাবে।' সুনীল বললে আনন্দময়ীর গায়ে মাথা হেলিয়ে হাসতে হাসতে। আনন্দময়ী তার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বললেন, 'ঘাট হয়েছে বাবা, আর ডাকবো না, এখন দয়া করে চা-টা খাও দিকি।' সুনীল পট থেকে চা ঢেলে, চিনি দুধ নেবে কি নেবে না ভাবছে, সুলেখা ও মণ্টু এসে গেল। সুনীলকে চা করতে দেখে সুলেখা বললে, 'চিনি দুধ আমি দিয়ে দিচ্ছি, নয়তো খাওয়া যাবে না।' সে মায়ের পাথরের গেলাসে লিকার দিয়ে তার আর মণ্টুর দু' কাপ চা করে নিলে, আনন্দময়ী নিজে চিনি আর দুধ মেশালেন নিজের গ্লাসে। সবাই চেয়ারে বসে চায়ে চুমুক দিল। আনন্দময়ী বললেন, 'সুনে, তুই তো ছোটবেলায় হেদোর ক্লাবে সাঁতার শিখতিস, একা একা বসে না থেকে গেলেই তো পারিস। ছোটবেলার চেনা নিশ্চয় মিলে যাবে।'

'হ্যাঁ মামণি, ঠিক বলেছ, আমার ইস্কুলের পরা বয়সের বন্ধু সুপ্রকাশ এখনও সাঁতার কাটে, চিঠিতে লিখেছিল। কিন্তু আমার কেমন যেন বাইরে যেতে আর বেশী ভাল লাগে না বিনা দরকারে। তার চেয়ে বাড়ীতে বরং—'

মণ্টু বলে উঠলো,—'মা, সুনেদা আজকাল ভাবুক হয়ে উঠেছে। এবারে গল্পোও করছে না।' হাত বাড়িয়ে মণ্টুর কান ধরে সুনীল বললে, 'দেখ মামণি, কেমন ডেঁপো হয়ে উঠেছেন ইনি!' কানে হাত বোলাতে বোলাতে মণ্টু বললে, 'সত্যি কথা বললেই দোষ! দিদিকে জিজ্ঞেস করো মা!'

আনন্দময়ী চিন্তিত হয়ে বললেন, 'বাবার শরীর কেমন দেখে এসেছিস সুনে?'

'ভালই তো দেখে এলুম।' সুনীল বললে।

'তোরা বোস, আমি একবার ঠাকুরকে দেখে আসি নীচে থেকে।' সুলেখা সুনীলের দিকে চাইল, সুনীল রাস্তার দিকে চেয়ে সুপ্রকাশের কথা মনে পড়লো, কালই যাবে দেখা করতে। মণ্টু বললে, 'আমি নীচে যাচ্ছি দিদি, মাস্টার মশায়ের আসার সময় হয়েছে।'

'আমিও যাই চল।' সুনীলের দিকে চেয়ে সুলেখা নীচে চলে গেল।

সামনের রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্যোৎস্নার মত লাগছে। অনেক বাড়ীতে এখনও গ্যাস লাইট জ্বলে। ইলেকট্রিক যাঁরা নিয়েছেন, তাঁরা ছাড়া কোন কোন বাড়ীতে এখনও হ্যারিকেন ও টেবিল ল্যাম্প জ্বলে। সুলেখাদের ইলেকট্রিক হয়েছে। সুলেখাকে গম্ভীর

লাগছে এবারে। আগেকার হাসি, প্রজাপতির মত ছটফটানি নেই। বড় বড় হয়ে গ্যাছে হঠাৎ। সেই অবাধ সঙ্কোচহীন, মাখামাখি খুনসুটি যেন আর সম্ভব নয়। কিসের একটা বাধা, লজ্জা, তাদের ব্যবহারে ছেয়ে আসছে। সুলেখার হাতের স্পর্শ চমক জাগালো সেদিন, যা এর আগে কোনদিন অনুভব করেনি; অথচ ভয় পেয়ে কতদিন তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে রাস্তায় বহুরূপী কিম্বা মুশকিল আসানের গলা শুনে। মামণির কোলে দুজনে হিংসে করে, ঝগড়া করে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে রাত্রে ঘুমিয়েছে। মামণি দুজনকেই বুকের পাশে নিয়ে হাত বুলিয়ে শান্ত করেছেন। এবারে সেসব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আগে এই বারান্দায় দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে চুপচাপ বসে, অথচ আজ মণ্টু নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা চলে গেল, এড়িয়ে গেল একা একা বসে থাকা বলা চলে। কেন? এর মানে কি?

নীচে থেকে উঠে এসে সুলেখা বললে, 'ও মা! সুনেদা অন্ধকারে বসে আছে, আলোটাও জালাওনি?' কাছে এসে বললে, 'কি এত ভাবছো, শরীর খারাপ হয়নি তো?' সুনীলের কাঁধে হাত রাখলো ব্যস্তভাবে। সুনীল কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বললে, 'যাও, কথা বলবো না।'

নীচের থেকে আনন্দময়ীর ডাক এলো, 'সুলি, সুনের ঘুগনীটা নিয়ে যা।' তরতরিয়ে নীচে নেমে আবার উঠে এলো, হাতের গরম ঘুগনীর ডিসটা টেবিলে রেখে মুচকি হেসে অন্যদিকে চেয়ে বললে, 'মশাই এখানে যিনি আছেন গরম গরম ঘুগনীটা খেয়ে নেবেন দয়া করে!'

সুনীল বললে, 'মশাই এখানে কেউ নেই, কসাই আছে, তোমায় জবুই করতে।' হেসে বললে সুলেখা, 'এই যে কথা বললে।'

নীচে থেকে আবার ডাক এলো 'সুলেখা, শিগ্‌গীর নেমে আয়, বাবু ডাকচেন।' ঘুগনীর ডিসটা সুনীলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে মিনতিভরা ইঙ্গিত করে সুলেখা নেমে গেল। সুনীলের চোখ আবার চলে গেল আকাশের দিকে রাস্তা পেরিয়ে।

বেশ খানিক বাদে বারান্দায় এসে আনন্দময়ী চেয়ার টেনে সুনীলের কাছ ঘেঁষে বসলেন। সুনীল চট করে মাথা ঘুরিয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'সারা হলো মামণি, ঘর-সংসার পতিসেবা ইত্যাদি।' সুনীলের গালে হালকা চড় বসিয়ে বললেন আনন্দময়ী, 'পাজি কোথাকার! সন্ধ্যের পর উপাসনায় বসতে হয় না!'

'তা বটে, তুমি তো আবার ব্রহ্মজ্ঞানী! আচ্ছা জেঠুকে তো কিছু করতে দেখি না?'

'জেঠু তোমার কিছুই মানেন না বই নোটবই ছাড়া।' তারপর একটু থেমে হালকা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তোর বাবা পূজা-আহ্নিক করেন?'

'দেখিনি ; তবে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজীর ভক্ত মনে হয়।'

'তোর পৈতেটা দেখছি না এবারে ?'

'হারিয়ে গেছলো একবার চান করার সময়ে, বাবার চোখে পড়ে, সেটি নিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে বললেন, ওটার অপমান করার দরকার নেই। গায়ত্রী তো ভুলে গ্যাছো, ওটা গলায় না ঝোলালেও চলবে।' সেই থেকে আমার আর ভাবনা নেই। পিতৃ-আজ্ঞা কি করে লঙ্ঘন করি বলো!'

'ফাজিল কোথাকার! এক চড় দেবো।' সুনীল গালটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'মারো না মামণি, অনেকদিন তোমার মার খাইনি।' হেসে ফেললেন আনন্দময়ী। সেই সময় সুলেখা হাতে একগাদা লাল্‌ রিবন বাঁধা বই নিয়ে এসে বললে, 'দেখ সুনেদা, কত প্রাইজ পেয়েচি এবারে। তোমার মত গড়িয়ে গড়িয়ে পাশ করি না।' বইগুলোর দিকে চেয়ে সুনীল বললে, 'ওগুলো তোমায় বোধহয় কন্‌সোলেশন প্রাইজ দিয়েছে, নয়তো কান্নাকাটি করো পাছে।'

'না গো মশাই, পড়ে দেখ চোখ তো আছে ?' সুনীল বইগুলো দেখতে লাগলো। আনন্দময়ী সুনীলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুনে, লেখাপড়া কেমন করছিস, পাশ করবি তো ?' সুনীল হেসে বললে, 'কি জানো মামণি, লিখতে কিছু কসুর করি না, পরীক্ষকেরা বুঝতে পারলে হয়।' আনন্দময়ী রাগতভাবে বললেন, 'হাসতে লজ্জা করে না ? তোর বাবা তোর মাথাটা চিবিয়েছে। আমার কাছে যতদিন ছিলি, লেখাপড়া তো ভালই করতিস।' সুনীল বললে, 'এখানে সুলেখার সঙ্গে হিংসে করে লেখাপড়া ভাল হয়ে যেতো।' সুলেখা বললে, 'উঃ, কি হিংসুটে। আমাকে মা কোলে নিলেই তুমি নাকি 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করতে!' আনন্দময়ী গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সুনে, লেখাপড়া মন দিয়ে করো, ফাজলামি করে ঘুরে বেড়িও না।' সুনীল বললে তাড়াতড়ি, 'ফাজলামি করে ঘুরে বেড়াই ? তুমি আমার বদ্‌নাম করছো মামণি! আমি বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ীতেই থাকি।'

'পড়াশুনা তো ভাল করছিস না।' ধমকের সুরে বললেন আনন্দময়ী। সুলেখা ঠাট্টার সুরে বললে, 'খাও বকুনী খালি পেটে, কেমন জব্দ ?' সুনীল বললে, 'দেখ মামণি, তুমি সুলেখার সামনে আমায় বকছো, আমার কিন্তু রাগ হয়ে যাবে!' আনন্দময়ী বললেন, 'লেখাপড়া ঠিকমত না করলে সুলেখা তোকে টপকে পাশ করে যাবে ম্যাট্রিক, তখন কেমন লাগবে ?' একটু থেমে আবার বললেন, 'জেঠুকে দিয়ে তোর বাবাকে চিঠি লেখাতে হবে এখানে পড়ার ব্যবস্থা করার, নয়তো তুমি ওখানে বয়ে যাবে।' প্রতিবাদ করে সুনীল বললে, 'বয়ে অমনি গেলেই হলো ? জানো এবারের পাটনা আর্ট প্রদর্শনীতে

আমার ছবি সবচেয়ে ভাল হয়েছে, ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছি। বাবা তো খুব খুশী। ছবি আঁকতে দেখলে উঁকি মেরে দেখে যান। মায়ের সেই বুড়ো মেম টিচারকে খুঁজে এনে আমার আঁকার টিচার করে দিয়েছেন। তুমি তো তাঁকে দেখেছ মামণি, যখন মাকে শেখাতেন?'

'মিস লিলি এখনও পাটনায় আছেন, প্রায় বুড়ী তো?'

'রিটায়ার করেছেন গার্লস্কুল থেকে, কিন্তু পাটনা নাকি ওর ভাল লাগে, শরীর ভাল থাকে। পাটনা মিউজিয়মে কিছু কাজ করেন, ছাত্রীদের বাড়ীতে আঁকা, শৌখিন কাজকর্ম শেখান। এর পর দেশে ফিরবেন বলছেন। আমায় সপ্তাহে একদিন আঁকার নিয়মকানুন, মানে টেক্‌নিক শেখাচ্ছেন আর নিয়ে যাচ্ছেন পাটনা মিউজিয়মে পুরোনো শিল্পকলা দেখাতে বোঝাতে। জানো মামণি, উনি ফরাসী মহিলা শিল্পী ঘরানার। বাবা দাদা ভাই সকলেরই পেশা শিল্পকলা। ওখানে পারীতে ওঁদের স্কুল আছে অঙ্কন-বিদ্যার। বাবা ওঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে চিঠিপত্তর লেখালেখি করেছেন। আমাকে বাবা বলে রেখেছেন, ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলেই পারী পাঠাবেন। বাবা বুঝে নিয়েছেন লেখাপড়ায় আমার বিশেষ সুবিধা হবার সম্ভাবনা নেই।' হাসতে লাগলো সুনীল। লাফাতে লাফাতে মণ্টু এসে আঁকার কথা শুনে বলে উঠলো, 'সুনেদা, অন্যবারে তুমি আমার জন্যে ছবি আনো, এবারে ত কিছুই আনোনি?'

'জানিস, এখন আমি প্রাইজ পাওয়া আর্টিস্ট, আমার ছবি লোককে পয়সা দিয়ে কিনতে হবে।'

'ধ্যুৎ, তোমার ছবি আবার পয়সা দিয়ে কিনবে, পয়সা সস্তা কিনা! ছবি দেবে বলেছিলে দিচ্ছ না তুমি কালীঘাটের...' বলতে যাচ্ছিল যা সকলের জানা। আনন্দময়ী রেগে ধমক দিলেন, 'চুপ অসভ্য ছেলে, মার খাবে!' সুলেখা বললে, 'দেখাও না সুনেদা তোমার সেই প্রাইজ পাওয়া ছবিটা।' সুনীল হাত নেড়ে বললে, 'উঁ-হুঁ— খুব যে বড় বড় কথা হচ্ছিল মামণির সামনে।' সুলেখা, মণ্টু দুজনেই বলে উঠলো, 'না দেখাও তো বয়ে গেছে!' আনন্দময়ী হেসে বললেন, 'দেখা সুনে, কি রকম ছবি এঁকেছিস দেখি।' মণ্টু হাততালি দিল। সুনীল তাকে বললে, 'ঘরের থেকে আমার এটাচিটা নিয়ে আয় মণ্টু।' মণ্টু এটাচি নিয়ে এলো। চাবি খুলে সুনীল বললে সুলেখাকে, 'সাবধানে ছাখো আর মামণিকে দেখাও।' মণ্টু বললে, 'সুনেদা, তুমি আমাকে একটা "হিপোপটেমাস" এঁকে দেবে বলেছিলে।' মণ্টুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে, নিজে কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসে গেল। আনন্দময়ী ও সুলেখা ছবি দেখতে ব্যস্ত। মণ্টু জিজ্ঞেস করলে, 'কি করছো সুনেদা?'

'কেন ? হিপোপটেমাস আঁকছি।'

সুলেখা হেসে উঠলো। মণ্টু বললে, 'তার মানে ?' সুলেখা বললে, 'তার মানে তুমি একটি "হিপোপটেমাস", পাটনায় কোথায় পাবে ?' রেগে মণ্টু বললে, 'তুমি একটি বেবুন !' বলে চেয়ার থেকে উঠে পালালো। ছবি দেখা শেষ করে আনন্দময়ী সুনীলের মাথায় গালে আদর করে বললেন, 'খুব ভাল লাগলো ছবি, তোর মায়ের হাতও খুব ভাল ছিল। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'চ নিচে চ, রাত হলো, খেয়ে নিবি চ। আমি এগোচ্ছি।' সুলেখা ছবি দেখতে দেখতে বললে, 'খুব ভাল লাগছে তোমার আঁকা। আবার দেখবো পরে, চলো নীচে যাই।

॥ ৩ ॥

মসৃণ জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত বনেদী পরিবারগুলি বেশীর ভাগ আত্মকেন্দ্রিক। বিশেষ করে কলকাতার ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজ। এঁদের মধ্যে একটি বিচিত্র মিশ্র সাংস্কৃতিক ধারা উনিশ শতক থেকে চলে আসছে। যার সঙ্গে মনে হয় সারা ভারতের মিল পাওয়া শক্ত। কলকাতায় এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের আচারে-ব্যবহারে সামাজিক রীতিনীতিতে প্রভেদ দেখা যাবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ সুবর্ণ-বণিক গন্ধবণিক সকলের মধ্যেই মিল-অমিল। কিন্তু এতে কিছু এসে যায় না। কারণ একটা মিশ্র নাগরিক মানসিকতা জোরদার থাকায় ব্যক্তিগত বা সমাজগত পার্থক্য কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। নবাগত নাগরিকরা চলতি স্রোতে মিশে যায়। এমন কি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বহুদিন দেখা যায়নি কলকাতায়। হঠাৎ ১৯২৬ সালে এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত সারা দেশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় কলকাতাও বাদ গেল না। এ ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসী আন্দোলন সাধারণ কলকাতার জীবনে ঢেউ তুলেছিল, যাতে কলকাতার শান্ত পরিবেশটি নাড়াচাড়া খেয়েছিল ; তবু অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতিতে অভ্যস্ত আত্মকেন্দ্রিক বিরোধবর্জিত জীবনযাত্রাই কামনা করে। ইংরাজ শাসনে বহুদিন যাবৎ শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে নাগরিক জীবনযাত্রায় কসমোপলিটান মনোভাব গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। কেউ কারুর সাতে-পাঁচে থাকা পছন্দ করেন না। পুরোনো কলকাতার বাসিন্দারা গায়েপড়া আত্মীয়তা, অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলার সঙ্কোচ, পরের ব্যাপারে মাথা গলানো, চিন্তায় কর্মে কিছুটা নির্লিপ্ত ভাব, নবাগতের কাছে অনেক সময়ে দম্ভের প্রকাশ বলে মনে হয়ে যেতে পারে। নাগরিক এই অভ্যাস কিন্তু স্বভাবজাত। কোন বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব কি অহংভাব প্রকাশের জন্য নয়, এটা

কলকাতার অনেক দিনের অভ্যাস্। ফণীন্দ্রনাথ বসু আর শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়ীতে মানুষ। উভয় পরিবারে মেলামেশা আত্মীয়তা এক পরিবারের মত গড়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে হঠাৎ ফণীবাবুর ব্রাহ্ম কন্যাকে বিবাহ কিছু সাময়িক বিভ্রাট ঘটেছিল, এখন তার কোন চিহ্ন মেলে না। সবাই মানিয়ে নিয়েছে। ফণীবাবু ও শচীনবাবু আধুনিক কালের হওয়ায় একেবারে সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্ব। কাজেই সুনীলের আনন্দময়ীর কোলে সন্তানের মত মানুষ হওয়ায় কোন সমস্যাই দেখা দেয়নি।

নীচে থেকে আনন্দময়ীর কণ্ঠ শোনা গেল—'সুনে, খাবার দেওয়া হয়ে গ্যাছে, নেবে আয়।' ফণীবাবু, সুনীল, সুলেখা, মণ্টু যে যার আসনে এসে বসে গেল। ঠাকুর সাজিয়ে রাখা থালা-বাটি সকলের সামনে নামিয়ে দিল। কাঁসার জলভর্তি গেলাস দিল কামিনী। একটু দূরে একটি পিঁড়িতে বসলেন আনন্দময়ী তদারকিতে। রাস্তা দিয়ে হেঁকে চলেছে, 'মালাই ব—র—প—কুলপি—মালাই'। সুনীল আর মণ্টুর মধ্যে চায়াচায়ি হলো। সকলে মাথা নীচু করে খাওয়া শুরু করলে। ঠাকুর আরো দুটো করে গরম রুটি দিলে পাতে পাতে। ফণীবাবু মাথা তুলে বললেন, 'সুনীল মাস্টার, আজ তোমার বাবার মস্ত চিঠি পেয়েছি। আমার ঘাড়ে একটা কাজ চাপিয়েছে। হাইকোর্ট পাড়ায় এটর্নি, তোমাদের আত্মীয়ের অফিসে। একদিনের কাজ এঁরা পাঁচদিনে করে থাকেন। আমার কলেজ ছুটি, তোমার বাবার নির্দেশে কাজ সেরে কাগজপত্তর নিয়ে পাটনা যেতে হবে।' সুনীল বললে, 'খুব ভালো আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

'তোমার যাওয়া নট্। মামণি আমার ওপর ফায়ার হয়ে যাবে তোমায় নিয়ে গেলে।'

সুনীল চিন্তিত স্বরে বললে, 'একা একা তুমি যাবে?'

'না বাবা না। আমার একটি ছাত্র পাটনা মিউজিয়ম দেখার খুব ঝোঁক, তাকে নিয়ে যাবো। তুই এখানে মামণির আদর খেয়ে নে।' একটু থেমে জল খেয়ে আবার বললেন, 'শুনছি, তুই খুব ভাল ছবি আঁকছিস। তোর বাবাও লিখেছে, এখানে মামণিও বলছিল তুই নাকি ফাষ্ট´ হয়েছিস। আমায় দেখাসনি তো?'

সুনীল লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে রইলো। আনন্দময়ী বললেন, 'লজ্জা পাচ্ছে তোমাকে, খাওয়ার পর জেঠুকে ছবিগুলো দেখিয়ে আসবি সুনীল।' সুনীল মাথা নাড়লো। সুলেখা ও মণ্টু তার লজ্জিত অবস্থা দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। খাওয়া হয়ে যেতে সবাই বেরিয়ে গেল। কামিনী এসে বললে, 'মা, আপনার খাওয়ার জায়গা করি?' আনন্দময়ী বললেন, 'করো।'

ফণীবাবুর লাইব্রেরী ঘর দেওয়াল ভরা বইয়ের র‍্যাক। মাঝখানে বড় টেবিল। একদিকে একটি ডিভান, বাকি দুদিকে সার দেওয়া চেয়ার। টেবিলে বই ছড়ানো, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, তার সামনে একটি ঘোরানো চেয়ার ফণীবাবুর লেখাপড়া করার জন্যে। ডিভানে শুয়ে ফণীবাবু বিশ্রাম নিচ্ছেন চোখ বুজে ; স্থনীলের ঘরে ঢোকার শব্দে চোখ বুজেই বললেন, 'বসো মাস্টার, আমি একটু বিশ্রাম করে নিই।' স্থনীল এটাচিটা টেবিলের ওপর রেখে বাইরে বেরিয়ে ছ্যাখে, মণ্টু-স্থলেখাও আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দুজনের চুল মুঠি করে ধরলে দুহাতে। স্থলেখাকে বললে, 'কি হচ্ছে এখানে অন্ধকারে ?' স্থলেখা হাত নেড়ে বারান্দার ওদিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করলে। তিনজনই আনন্দময়ীর ঘরে ঢুকলো। স্থনীল কাছে গিয়ে বললে, 'দেখ মামণি, এই দুটোতে জেঠুবাবুর লাইব্রেরীতে উঁকি দিচ্ছিল।' আনন্দময়ী হেসে বললেন, 'কি রে, ছবি দেখালি না ?'

'তুমি আমায় কি বিপদেই ফেললে। জেঠুবাবু বিশ্রাম করছেন, একটু পরে যাবো।'

'বোস তোরা খাটে।'

স্থনীল আনন্দময়ীর দিকে চেয়ে বললে, 'মামণি, তুমি কোন্ স্কুলে পড়েছো ?' আনন্দময়ী বললেন, 'বীণাপাণি পর্দা স্কুল।' স্থনীল প্রশ্ন করলো, 'কি করে যাতায়াত করতে ?'

'কেন ? স্কুলের খড়খড়িওয়ালা ঢাকা গাড়ী ছিল দু' ঘোড়ায় টানা, আমরা অনেক মেয়ে একসঙ্গে যেতুম। বাড়ী বাড়ী তুলে নিতো মেয়েদের। নামা-ওঠার সময় ছাড়া কাউকে দেখার স্থযোগ ছিল না।'

'কতদিন পড়েছিলে ?'

'ওখান থেকে আমি এনট্রান্স পাশ করি, তারপর বিয়ে হয়ে গেল, কলেজে আর পড়া হলো না। তোমার জেঠুবাবুর ইচ্ছে ছিল, আমি রাজী হলুম না। সংসার দেখবো না কলেজ করবো ?'

'আচ্ছা মামণি, তখন মেয়েদের লেখাপড়ার চল ছিল না, কিন্তু তোমার তো মন্দ হয়নি।' অবাক হয়ে স্থনীল বললে।

'ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহ ছিল। তাছাড়া অনেক হিন্দুবাড়ীতেও বিদ্যাসাগরের কল্যাণে চর্চা শুরু হয়। আমাদের স্কুলে নীচের ক্লাশের দিকে অনেক হিন্দু-বাড়ীর মেয়েরা পড়তো, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত।' আনন্দময়ী বললেন। স্থনীল বললে, 'রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের চলাফেরা এখনও কম, স্কুল-কলেজের গাড়ী বা নিজেদের গাড়ী না থাকলে মেয়েদের পড়া অস্থবিধা ছিল না, মামণি ?'

'এখন অনেক পাল্টে যাচ্ছে. আমাদের সময়থেকে। এখন অনেক মেয়ে হেঁটেই ইস্কুল-কলেজ যাতায়াত করে। অবশ্য একা একা সবাই পারে না।' ফণীবাবুর বেল শোনা গেল, সুনীল উঠে পড়লো, 'যাই, জেঠু ডাকছেন।'

ফণীবাবু ঘোরানো চেয়ারে বসেছেন। সুনীল ঘরে ঢুকতেই ফণীবাবু বললেন, 'দে দেখি তোর ছবি।' সুনীল এটাচি খুলে সামনে এগিয়ে দিলো, নিজে কাছের চেয়ারে বসে পড়লো। টেবিল ল্যাম্পের তলায় এক একটা ছবি ধরে, কাছে দূরে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগলেন ফণীবাবু। সুনীল তাঁর মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল। বেশ খানিক সময় নিয়ে সব ছবি দেখা শেষ করে ফণীবাবু হেসে বললেন, 'বাঃ, মাস্টার, খুব ভাল হয়েছে আরম্ভ হিসেবে। খুব ভাল। করে যাও। আচ্ছা মাস্টার, বলতে পারো ইউরোপের দু'-একটা বড় আর্টিস্টের নাম?' মিস লিলির কাছে শোনা নাম কটা গড়গড় করে বলে গেল সুনীল—'মিকায়েল আঞ্জেলো, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, র‍্যাফায়েল।'

'গুড; ভেরী গুড! এঁদের জন্ম কোথায়, কোথায় এঁদের কাজ আছে, কোন্ সময়ে এঁরা কি কি অমর সৃষ্টি রেখে গেছেন জানো?' সুনীল বললে, 'না তা তো জানি না!' ফণীবাবু চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বইয়ের র‍্যাক্ খুঁজে একটা ক্ষুদে পেঙ্গুইন সিরিজের বই বার করে নিয়ে এসে সুনীলের হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও মাস্টার, এটা তোমাকে দিলুম। পড়ে নিও, এঁদের সব খবর পেয়ে যাবে।' সুনীল খুশী মনে বই নিয়ে ছবির এটাচি বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত দশটা বেজে গেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। ঝিঁ ঝিঁর ডাক, মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে হেদোর ধারের গাছ থেকে। দোতলায় ওঠার সময় চোখে পড়লো, পাঁচিলের ওপর সার বেঁধে সভা বসেছে বেড়ালদের। কলকাতার এত বেড়াল, পাটনায় নেই, বড় সুন্দর ভঙ্গী চালচলন বেড়ালদের। কলকাতার বেড়াল মানুষ ঘেষা, ভয় করে না। পাটনার বেড়াল বুনো ভাব। সুনীল ঘরে ঢুকে বই হাতে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

॥ ৪ ॥

অনেকদিন কেটে গেল সুনীলের। মামণির আদর, সুলেখার খুনসুটি, মণ্টুর আব্দার সারাদিন। আর কি চাই? জেঠুবাবু পাটনায় গেছেন। কাজেই বাবার ভাবনা মনে আসে না। বিকেলে কলকাতার ফুটপাত ধরে চটি টেনে টেনে ঘুরে বেড়ানো। দু'বেলা ধোয়া চকচকে ফুটপাত; শুধু রাস্তার ধারে বড় গাছের তলায় সাদা সাদা কাকদের স্বাভাবিক কর্ম চোখে পড়ে। কলকাতা ছাড়া রাস্তায় চটি টেনে চলা যায় না। ধুলো-বালির ঠেলায় জুতো পরে রাস্তায় বেরোতেই হয়। কলকাতায় এসে জুতো পরা ভুলেই

গেল স্থনীল। বিডন স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের সব বাড়ী-ঘর মুখস্থ হয়ে গেল। হেদোয় বসে দু'-চারখানা ছবিও আঁকার চেষ্টা হয়েছে। স্থপ্রকাশের সঙ্গে আড্ডাও ক'দিন হয়ে গেল। পাটনায় ফিরতে হবে, স্কুল খুলবে। জেঠুবাবুর ফেরার অপেক্ষায়। মাঝে মাঝে মনটা ভারী হয়ে উঠছে। মামণি, স্থলেখা, মণ্টু এদের ছেড়ে পাটনায় আবার শূন্য দিন-যাপন, পূজার ছুটির দিন গোনার পালা। এই চিন্তা নিয়ে বাড়ী ফিরলো স্থনীল। বসার ঘরে দেখলে একজন অপরিচিতা বয়স্কা মহিলার সঙ্গে মামণি ও স্থলেখা বসে গল্প করছেন। তাকে দেখে আনন্দময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেচলি স্থনীল, এত দেরী ?'

'আজ একটা লম্বা দৌড় দিয়েছি; মাথখোলা দোতলা বাসে বালীগঞ্জ-লেক, আর সেই বাসেই ফেরং। দু'-একটা শেয়ালের ডাকও শুনে এলুম সন্ধ্যেবেলা।' স্থনীল উৎসাহে বললে। আনন্দময়ী বললেন, 'খুব অন্যায় করেচো। এই কিছুদিন আগে, কাগজে পড়েছিলুম একটা দোতলা বাস উল্‌টে যাচ্ছিল, কোনরকমে রক্ষা পেয়েছে লাইটপোষ্টে ঠেকে। কেন, একতলা বাসে গেলেই তো হয়!' অপরাধীর গলায় স্থনীল বললে, 'হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হলো, ওপর থেকে সব দেখতে দেখতে যাবো।' স্থলেখা ঠাট্টার স্থরে বলে উঠলো, 'পাটনাই বুদ্ধি আর কি! দেখবার আর জায়গা পেলেন না, ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুর!' তার দিকে চেয়ে, উলবোনা ঠেস দিয়ে স্থনীল হেসে বললে, 'সুতানটি, উলনটি দেখে দেখে চোখ পচে গ্যাল, তাই!' আনন্দময়ী হেসে বললেন, 'যা, ফাজিল কোথাকার!' স্থনীল স্থলেখার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে দোতলায় চলে গেল। স্থনীলের চলে যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বললেন, 'ছেলেটিকে চিনতে পারলুম না ?' আনন্দময়ী উত্তর দিলেন, 'আমাদের এক বন্ধুর ছেলে, আমার সই ওর মা, ওর জন্ম-কালেই মারা যায়। আর কেউ ছিল না। আমাকেই তুলে নিতে হয় সেই ছেলে, স্থলেখা তখন পেটে। ভাল ঝি রেখে অনেক কষ্টে দুটোকে একসঙ্গে মানুষ করেচি দিদি, দুটোকে দুদিকে দুধ খাইয়ে প্রায় যমজ মানুষ করা!' ভদ্রমহিলা একটু হেসে বললেন, 'ঠিক তাই। যমজ।' আনন্দময়ী দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'এখন এত কষ্ট হয় ওর পাটনায় চলে যাওয়ার পর থেকে, কি বলবো!'

'ওকে এখানে রাখলেই তো পারতে ?' ভদ্রমহিলা বললেন।

'বার-তের বচর পর্যন্ত আমার কাচেই ছিল, পরে ওর বাবা একটা চিঠি দিলেন আমাদের দু'জনকেই। লিখেচিলেন, তাঁর বড় একা একা লাগচে; যদি সম্ভব হয় স্থনীলকে পাঠিয়ে দেন, ওখানে স্কুলে ভর্তি করে নিজেই যত্ন নেবেন। ওখানে যত্ন অবশ্য বেশীই পায়। বড় বাড়ী, চাকর-বাকর লোকজন, বাবা ওখানের বড় উকিল। ছেলের মায়ায় দ্বিতীয়বার বিয়েও করেননি। কি আর করি দিদি। তার কথা ভেবে পাঠিয়ে দিলুম

বাবার কাছে অনেক কষ্টে ; ওখানে যাবার পর ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লো, অনেক ওজন কমে গেল। ডাক্তার-বদ্যি করে প্রায়ই দারোয়ানের সঙ্গে সুনীলকে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়ে কোনরকমে ওবোন হলো আমায় ছেড়ে পাটনায় বাস করা।' করুণভাবে হেসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলেন আনন্দময়ী। মহিলাটি একটু থেমে বললেন, 'তা ভাই ছেলেটি বেশ লাগলো, অবস্থাও ভাল। তা ওকে আপনার করে নিতে বাধা কি ?' আনন্দময়ী কথাটা বুঝতে না পেরে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। 'বুঝতে পারলে না ভাই, আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো আপন হয়ে যাবে।'

সুলেখা ছটফট করে উঠে চলে গেল। আনন্দময়ী হেসে বললেন, 'তা হয় না দিদি! ওরা ব্রাহ্মণ, আর আমরা ব্রাহ্ম কায়স্থ। তাছাড়া ও তো আপন হয়েই আচে। কেউ ওকে বলে না দিলে ও আজও আমায় মা বলেই জানতো। ওরা দু'জন ভাই-বোনের মতই আমার কোলে মানুষ হয়েচে আমার দুধ খেয়ে। ওদের বিয়ের কথা কি ভাবা যায় দিদি!'

একটু লজ্জিত হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার ভুল হয়েছে ভাই, কিছু মনে করো না। আজ আসি ভাই, একদিন আমার ওখানে এসো।'

'যাব দিদি, সময় পেলেই যাবো। ছেলেটা পাটনা না যাওয়া পর্যন্ত আমার কি ফুরসৎ আচে ?' আনন্দময়ী তাঁকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন।

॥ ৫ ॥

সুনীলের ঘর। দরজা খোলা, খাটের ওপর একপাশ ফিরে সুনীল ঘুমোচ্ছে। রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে। সুলেখা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভাবছে ঢুকবে কি ঢুকবে না। কাল ওই ভদ্রমহিলার, তাদের বিবাহ নিয়ে কথা শুনে থেকে তার কেমন লজ্জা লজ্জা করছে সুনেদাকে। অজানা একটা ভাবনা মনটাকে চেপে ধরেছে। এতদিনের সরল সহজ ভালবাসার সম্পর্ক কেমন যেন ওলট-পালট হতে চলেছে! 'ধোৎ!' শব্দ করে ঢুকে পড়ল সুলেখা। সুনীলের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো. ওই মুখে তো কোন পরিবর্তন দেখছে না, চুলগুলো শুধু কপাল ঢেকে মুখের ওপর লোটাচ্ছে। সুনেদার কি যে স্বভাব, তেল দেবে না, কাটবে না ; চুল কপালে ছড়িয়ে থাকলে অস্বস্তি হয় না ? চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দেবো ? দিই না! যদি ঘুম ভেঙে যায় ? তাতে কি! আমি কি আজ প্রথম সুনেদার চুলে হাত দেবো ? এ সব ভাবনা আসে কেন ? ধ্যাৎ! সুলেখা এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে চুলগুলো ওপর দিকে তুলে দিতে লাগলো। সুনীলের ঘুম ভেঙে গেল, চাইতেই দেখলে, সুলেখা তার মাথার দিকে চোখ

নীচু করে দাঁড়িয়ে। একটু চমকে বলে উঠলো, 'কি স্থলেখা, কিছু মতলব ছিল নাকি? ঘুমটা যখন ভেঙেই গেল, তখন মতলব ত্যাগ করে খাটে বসে পড, গল্প করা যাক্।'

'চারটে বাজে, এখনও মোষের মত ঘুমোচ্ছিলে?' বলে স্থলেখা খাটের নীচের দিকে উঠে বসলো। তার দিকে চেয়ে স্থনীল বললে, 'দেখ স্থলেখা, এইমাত্র তোমার ওপর আমি ভয়ানক চটে গেছি।' স্থলেখা ভীতস্বরে বললে, 'কেন, আমি কি করলুম?' স্থনীল ভারী গলায় বললে, 'একটা স্থন্দর স্বপ্ন দেখছিলুম, তুমি এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।' স্থলেখা হেসে বললে, 'কি স্বপ্ন, রাজকন্যার না রাক্ষসীর?' স্থনীল ভাবনার স্বরে বললে, 'রাজকন্যাই হবে বোধহয়। তিনি তাঁর তুলতুলে নরম আঙুলগুলি দিয়ে আমার চুল নিয়ে খেলা করছিলেন। কী আরাম যে লাগছিল! তুমি ঘুম ভাঙালে, রাজকন্যা ভাগলো।' একটু ইতঃস্তত করে স্থলেখা বললে, 'তাই নাকি? আমি তো ভারী অন্যায় করে ফেলেচি! ওকি পাশ ফিরলে যে, আবার তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করচো? আর ঘুমিও না লক্ষীটি! অসময় ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে, আমি এখুনি চা আনচি।'

'না না, আমি ঘুমবো না। চা এলেই দেখবে সজাগ।'

স্থলেখা জোরে বললে, 'আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, তুমি এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে।' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর চা নিয়ে এলো, পাশের টেবিলে রেখে ডাকলে, 'স্থনেদা! স্থনেদা!' একটা ধাক্কা দিল। উহুঁ-হুঁ করে পাশ ফিরলো স্থনীল। 'ওঠো বলচি। ভাল হচ্ছে না। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু! আমার সে-ই দাওয়াই: আমি আঙুল বের করচি—এক—দুই—তিন।' স্থলেখা স্থনীলের পেটে কাতুকুতু দিল।

স্থনীল তড়াক্ করে তার আঙুল চেপে ধরে উঠে বসলো। 'ওহো, এই অস্ত্র প্রয়োগটা জানিয়ে দিয়ে বড়ই ভুল করেছি দেখছি! কাল থেকে রবারের জামা পরে শোবো।' স্থলেখা বললে, 'তা আর হয় না মশাই, আমার আঙুল রবার প্রুফ্।' স্থনীল তার দিকে চেয়ে বললে, 'তাই নাকি, দেখি পরখ করে।' স্থনীল স্থলেখার হাত নিয়ে নাড়াচাড করে নিজের কপালে রাখলো। তারপর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে স্থলেখার দিকে চাইলো। স্থলেখা হাত টেনে নিল। স্থনীল হাসলো। স্থলেখা বললে, 'হাসলে যে?' উদাসভাবে স্থনীল বললে, 'এমনি।' স্থলেখা মিনতি ভরা কণ্ঠে বললে, 'বলবে না কেন হাসলে?'

স্থনীল বললে, 'যদি না বলি?' স্থলেখা অভিমানী কণ্ঠে বললে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলবো না, আড়ি!' স্থনীল তার দিকে নিবিড়ভাবে চেয়ে বললে, 'তুমিই আমার চুলে হাত বুলিয়েছিলে, না স্থলেখা?' ব্যস্তভাবে স্থলেখা বললে, 'চুলগুলো তোমার মুখে

পড়ছিল তাই সরিয়ে দিচ্ছিলুম।' সুনীল অন্যমনস্কভাবে বললে, 'হুঁ।' দু'জনেই নীরব রইলো।

সুনীল যখন চাইলো সুলেখার দিকে, সুলেখা অপরাধীর মত মাথা নীচু করে নিলে। সুনীল দু'হাতে সুলেখার মুখ তুলে ধরে বললে, 'কি হয়েছে? তুমি এমন লজ্জা পাচ্ছ কেন?' সুলেখা কান্নার মত বললে, 'কিছু মনে করো না সুনেদা, আমি শুধু চুলগুলো সরিয়ে—'

'বেশ তো, তাতে হয়েছে কি?' সুনীল বললে। সুলেখা ম্লান স্বরে বললে, 'তুমি কি ভাবচো?'

'অবাক করলে, আমি আবার কি ভাববো?' সুনীল সহজভাবে বললে। সুলেখা আবার ব্যস্তভাবে বললে, 'তোমার চুলগুলো মুখে এসে পড়ছিল—' সুলেখার কথা শেষ করতে না দিয়ে সুনীল বললে, 'আঃ, কে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে? তুমি কি আমার গায়ে মাথায় কখনো হাত দাওনি? যদি হাত বুলিয়েই থাকো, তাতেই বা কি? যাও, নীচে মামণি ডাকছেন।' সুলেখা চলে গেল। সুনীল বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করতে লাগল কুঞ্চিত ললাটে।

সুলেখা ডিসে হিংয়ের কচুরী তরকারী, জিলিপী এনে টেবিলে রেখে বললে, 'মহেশের দোকানের কচুরী জিলিপী, গরম গরম খাও, মায়ের আদেশ। আমি নীচে যাচ্ছি।' সুনীল রাগের ভান করে বললে, 'বেশ আমিও যাই, একটা জরুরী কাজ আছে!' সুলেখা হেসে বললে, 'ইস্, ভারী রাগ দেখানো হচ্ছে। কচি খোকা কি না তাই খাইয়ে দিতে হবে!'

সুনীল বেরোবার ভঙ্গি দেখালো। সুলেখা তাড়াতাড়ি বললে, 'না না, আমি বসচি খাও।' হাত ধরে বসিয়ে দিলে বিছানায়। সুনীল হেসে বললে, 'এই তো গিন্নীর মত কথা।'

সুনীল খেতে শুরু করলে, সুলেখা বললে, 'আমি কি গিন্নী? বলো ত গিন্নীকে ডেকে দিই তাঁর আদুরে বড় বেটাকে খাইয়ে দিয়ে যান।'

'অত খই ফুটিও না মুখে, বিক্রী হবে না।' সুনীল বললে হেসে।

'নাই বা হলো। ঘরে একটা আস্ত রাক্ষস রয়েচে, ভাবনা কি।' সুলেখা বললে।

সুনীল রাগের ভান করে বললে, 'আমায় রাক্ষস বলা! দাঁড়াও মামণিকে বলে আসি।'

সুনীল উঠে পড়লো। সুলেখা বললে, 'উঠে পড়লে যে বড়, বাকিগুলো কে খাবে?' সুনীল বললে, 'আমি আর খেতে পারবো না।' হেসে বললে সুলেখা, 'ভয় নেই, সত্যি সত্যি কিছু আর তোমায় রাক্ষস বলা হয়নি মশাই!'

সুনীল আবার খেতে শুরু করে বললে, 'রাক্ষস বল, খোক্কস বল আমার বয়ে গ্যাচে।'

সুলেখা খুশী মনে চেয়ে রইলো সুনীলের খাওয়ার দিকে নজর রেখে। সুনীল খাওয়া শেষ করে চায়ে চুমুক দিয়ে সুলেখার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'ওটা তোমায় মানায় না সুলেখা।'

'কোন্‌টা?'

'তোমার ডিকসেনারীর মত মুখ।'

সুলেখা হেসে উঠলো। সুনীল বললে, 'মামণির কাছে যাই বলে আসি, আজ রাত্রে আমি মামণির কাছে ঘুমুবো। আমার জায়গা যেন ঠিক থাকে। দুটো ভাগিদার আছে, বেদখল না হয়ে যাই।'

'যাও যাও, আমি তোমার মামণিকে দুধের বোতলটা নিয়ে শুতে বলবো'খন।' হাসতে হাসতে বললে সুলেখা।

সুনীল বেরিয়ে যেতে, সুলেখা সুনীলের জামা, পায়জামা বই কাগজ ছবি আঁকার প্লেট তুলি ইজেল গুছিয়ে, বিছানা বালিশ চাদর ঝেড়ে ঠিক করে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে জানালার দিকে চেয়ে রইলো। এমন কিছু রয়েছে সুলেখার মনকে আচ্ছন্ন করে। বাল্যের আনন্দধারা কৈশোর-শেষে বিষাদময় হয়ে ওঠে বুঝি। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মন্থর গতিতে সে নেমে গেল নীচে।

॥ ৬ ॥

'সুনেদা, সুনেদা! দরোজা খোলো, চা জুড়িয়ে যাবে!' চায়ের কাপ হাতে সুলেখা দাঁড়িয়ে দরজার গোড়ায়। সকালের অভ্যাসমত চান সারা হয়ে গেছে; একটা ফিকে চাঁপা রঙের শাড়ী হলুদ রঙের গোল গলা হাফ হাতা ব্লাউজ, ভিজে চুলের রাশি পিঠের নীচে পা পর্যন্ত ঝুলছে সারা পিঠ ঢেকে। কপালের সামনে অলকগুচ্ছ চুল আঁচড়ানো হয়নি এখনও। সুনীলের সাড়া না পেয়ে দরজায় আঘাত করলো। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো 'হুঁ হুঁ'।

'হুঁ হুঁ কি! বেলা আটটা বাজে, এখনও বাবুর হুঁস নেই, কি ঘুম বাবা!' সুলেখা আরো জোরে ধাক্কা দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দরজা খোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন সুলেখা বললে, 'আমি চললুম মাকে ডাকতে।' এই কথার পরই ছিটকিনি খোলার শব্দ পাওয়া গেল। খোলা দরজায় ঢুকে দেখলে সুনীল আবার শয্যা নিয়েছে। চোখ কপালে তুলে সুলেখা বললে, 'তুমি আবার শুলে, বেলা দুপুর হতে

পলো।' সুনীল হাত পায়ের আড় ভেঙে ঝাকাঝাকি করে পাশ ফিরে শুলো। 'বেশ আমি নীচে চললুম, চা খেয়ে কাজ নেই।'

'আমি উঠছি, চা-টা টেবিলে রেখে দাও।'

সুলেখা মুখে একটা শব্দ করে বললে, 'যা উঠবে আমার জানা। কালকের মত ওটা জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে, মায়ের বকুনির ভয়ে তাই ঢক ঢক গিলবে। শিগগির ওঠো বলছি, নয় তো আমার সেই দাওয়াই শুরু হবে।'

পরিত্রাণ নেই দেখে অগত্যা সুনীলকে উঠতে হলো। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললে, 'কে করেছে চা-টা?' ব্যস্ত হয়ে সুলেখা বললে, 'কেন—কেন?' মুচকি হেসে সুনীল বললে, 'বুঝে নিয়েছি।' সুলেখা বললে, 'কি করে বুঝলে?' সুনীল বললে, 'আমি যেঁ মুখ গুনতে পারি।

'ধ্যাৎ! মুখ আবার গোনা যায়!'

সুনীল চায়ে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে সুলেখার আপাদমস্তক দেখতে লাগলো। অভিমানের স্বরে সুলেখা বললে, 'মা বলে তুমি কড়া চা ভালবাস তাই তো কড়া করলুম।' সুনীল বললে, 'নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ।'

'তা বইকি? চলো না মাকে ভজিয়ে দিচ্ছি।' সুলেখার রাগে গলা ভেঙে এলো। সুলেখার গালে একটা চড় বসিয়ে সুনীল বললে, 'দূর বোকা মেয়ে, ঠাট্টাও বোঝে না!'

'আঃ ভারী অসভ্য!' রাগের ভান করে সুলেখা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুনীল ভাবলে, সুলেখা সত্যিই রাগ করলো নাকি, ওর গালের রঙটা বেশী লালচে মনে হলো। সেইদিনের পর থেকেই সুলেখা যেন একটু গম্ভীর গম্ভীর হয়ে উঠেছে; সুনীলের ভাল লাগছে না ওর ঝরণার মত চঞ্চলতা, ওর মুখে সব সময় একটা হাসির রেখা মন ভরে দেয়, চোখের তৃপ্তি আনে। ওর আলগা শ্যামলা মুখশ্রী লাবণ্যভরা। গাঢ় কালো টানা টানা স্বপ্নালু চোখ সরু ভুরুর নীচে অস্থির। ওকে রাগাতে, কাঁদাতে, আবার ভোলাতে সুনীলের ভালই লাগে। প্রায় সমবয়সী খেলার সাথী এত নিজের মনে হয়। ওর মুখের সামান্য ইতরবিশেষ হলেই সুনীলের চোখে পড়ে, ব্যথা পায়। উঠে গেল সুনীল ছটফট করে, নীচে গিয়ে ডাকলে, 'মামণি, ও মামণি! কোথায় সব গেলে? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!'

কলঘর থেকে আনন্দময়ীর উত্তর এলো, 'একটু বস, আসচি।'

'তোমার একটু তো এক ঘণ্টার আগে নয়। স্নান বলে কথা' ফিরে যাচ্ছিল, সুলেখার ঘরে উঁকি মারলো। দেখলে সুলেখা মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে আছে। চমকে উঠলো সুনীল। ওপর থেকে এসে নীচে শুয়ে আছে! সুনীল গিয়ে সুলেখার মাথাটা

তুলে ধরলো। বালিশের ওয়াড় ভিজে গেছে, সুলেখার চোখও জলে ভরা। মাথাটা ছেড়ে দিয়ে কোমল স্বরে বললে সুনীল, 'চড় মেরেছি বলে রাগ হলো নাকি? ক্ষমা চাইছি সুলেখা!'

সুলেখা চোখ মুছতে মুছতে একটু হেসে বললে, 'না না, কিছু নয় এমনি।'

'যাক, এবার জানা গেল এমনি এমনিও কাঁদা যায়!' গম্ভীরভাবে কথাটা বলে সুনীল ওপরে চলে গেল। কদিন কেমন যেন হয়ে গেছে সুলেখা!

ঘরে এসে জানালার দিকে দাঁড়ালো, আকাশের দিকে চাইল। মনের মধ্যে মাকড়সার জাল বুনছে। সুলেখা, মামণি। মামণি সুলেখার মুখ বারেবারে ভেসে বেড়াচ্ছে কেন? সুলেখার জলভরা চোখে মুখে কিবা কথা ছিল? সে বললে, 'এমনি!' সুনীলও মনে মনে আওড়ালে, এমনি। ঘরের মধ্যে ইজেলের সামনে এসে দাঁড়ালো, রঙ মেশানোর ডিসটা না পেয়ে সকালে খাওয়া চায়ের প্লেট নিয়ে রঙ মিশিয়ে ইজেলে কাগজ আঁটছে, এমন সময়ে সুলেখা ঘরে ঢুকলো। চায়ের প্লেটে রঙ দেখে বললে, 'চায়ের ডিসে রঙ মিশোলে যে বড়?'

ওর দিকে চেয়ে সুনীল বললে, 'সরি, আমার রঙের প্যালেটটা পেলুম না বলে—'

'ও: তাইতো, বড় মুশকিল! কোনদিন তোমার কাছাটা খুঁজে পাবে না। ওটা কি খাটের পায়ার পাশে?' অপ্রস্তুত সেইদিকে এগোতে গেল সুনীল। সুলেখা বললে, 'যাক মশায়, ওটা ধুতে হবে, আমি নিয়ে যাচ্চি।'

সুনীল তার দিকে চেয়ে রইল। প্যালেটটা নিয়ে নীচের থেকে ধুয়ে এনে টেবিলের ওপর দিয়ে সুলেখা দেখলো গম্ভীর মুখে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। সুলেখা পেছন থেকে একটা চিমটি কেটে পালালো। সুনীল মুখে 'উঃ' শব্দ করে আবার তন্ময়। তুলি নিয়ে একটু পরে আঁকতে শুরু করলো।

এদিক ওদিক নড়েচড়ে দেখতে দেখতে সুনীল বললে নিজের মনে, 'ঠিকই হয়েছে।' সুলেখা এসে পেছন থেকে বললে, 'ছাই হয়েচে।' সুনীল ফিরে দেখল, সুলেখা তার তলার ঠোঁটটা উল্টে ছবিটাকে ভেঙচাচ্ছে 'তুমি আবার এসেছো, লক্ষ্মী মেয়ের মত দাও তো ওই তুলিটা।' খুশী মনে সুলেখা তুলি নিয়ে এসে সুনীলের হাতে দেবার সময় খপ্ করে তার হাত চেপে ধরে বললে সুনীল, 'বড় যে চিমটি কেটে পালানো হয়েছিল?'

'ছেড়ে দাও সুনেদা, লাগচে!'

'এই যে দিচ্ছি।' বলে সুনীল চট্ করে সুলেখার নাকের তলায় গোঁফ টেনে বললে, 'যাও।'

'যাচ্ছি মাকে দেখাতে!' বলতে বলতে সুলেখা চলে গেল।

॥ ৭ ॥

অজানা অস্বস্তিতে সুনীলের মনে চাঞ্চল্য, কেন, কিসের, এ প্রশ্নের জবাব মিলছে না। কৈশোর প্রান্তে সব যেন বদল হয়ে যাচ্ছে। কলকাতা এসে থেকে তার আবাল্য সাথী সুলেখা দিনে দিনে অপরিচিতা হয়ে উঠছে। আঁকা ছেড়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলো। এ কিসের ছটফটানিতে পেয়ে বসেছে তাকে? পাশের বাড়ির মেয়েটি তার দিকে চেয়ে আছে। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল—এটা এবারে সে কয়েকবারই লক্ষ্য করেছে। সেকি একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে পড়ল নাকি? ইজিচেয়ারটায় বসল সে, জানালা দিয়ে দেখা যাবে না। সুলেখার কথা মনে পড়ল। পিঠে মালিশ করা, চোখের জলের গরম ফোঁটা তার সঙ্গে তার মুখের কপালের ছোঁয়া। সেদিন ঘুমের ঘোরে চুলের ওপর স্বপ্নের মত তার আঙুলের স্পর্শ যেন নতুন অচেনা আবেশে আচ্ছন্ন করেছিল। ছোটবেলায় উলঙ্গ দুজনকে স্নান করিয়েছেন মামণি। পরস্পরের দিকে চেয়ে তারা কত হাসাহাসি করেছে। আদরে জড়াজড়ি মারামারি করেছে, কোন দিন এমন অজানা আসক্তি অনুভব করেনি। কতদিন রাতে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়েছে, মামণি পরে ঠিক জায়গায় শুইয়ে দিয়েছেন। পাটনা থেকে আসার পর এই বড় বয়সেও প্রথম প্রথম দু-একদিন একটু জড়তা থাকত ব্যবহারে, তারপর কখন উবে যেত মালুমই হতো না। এবারে যেন অন্য কিছু? সুলেখার শরীরের পরিবর্তন চোখে পড়ে, তার নিজের শরীরে পরিবর্তন নিশ্চয় এসেছে। কেমন যেন ভয় আশঙ্কা ছেয়ে আসে মনের মধ্যে। বারেবারে মামণির কথা মনে পড়ে। তাঁর কাছে মনে মনেও অপরাধী হওয়ার কথা ভাবতেই পারে না সুনীল। চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসল। মামণি কি ভাবতে পারেন, একই বুকের দুধে মানুষ করে দুজনকে অন্য কোন কথা! তাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারুণ্যের তাড়নায় পালা বদল! সুনীলের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। ভাবনায় ডুবে রইল সে।

সুলেখা ঘরে ঢুকল। নির্জীব ভঙ্গিতে সুনীলকে ইজিচেয়ারে দেখে তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল সামনে, চমকে উঠল গালের ওপর জল গড়ানো লক্ষ্য করে। শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকল, 'সুনেদা, কি হয়েচে?'

ধড়ফড় করে সোজা হয়ে বসে সুনীল বললে, 'কিছু না, কিছু না!'

কোছার খুঁট খুঁজছে দেখে, সুলেখা নিজের আঁচলটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'চোখ মোচ, কিছু না অথচ জল গড়াচ্চে! আমায় মিথ্যে বললে, গোপন করচ!' কান্নার স্বর শোনাল সুলেখার গলায়।

সুনীল ম্লান হেসে বললে, 'এমনি এমনি, চোখে কিছু পড়ে থাকবে হয়ত।' সুলেখার

কণ্ঠে সন্দেহ ফুটে উঠল, 'কেন মিছে কথা বলচ ?' খোলা জানালা দিয়ে পাশের বাড়ীর মেয়েটিকে দেখে বলে উঠলো, 'ওই মেয়েটা ভারী অসভ্য! একটা পর্দা দিয়ে দিতে হবে। রাগী রাগী পা ফেলে জানালা বন্ধ করে এল। পাশে চেয়ার টেনে বসল সুলেখা সুনীলের দিকে চেয়ে। সুনীলের মনটা হাল্‌কা করার জন্যে মুচকি হেসে বললে, 'কি, পছন্দ নাকি ? ব্রাহ্মণকন্যা, ফরোয়ার্ড খুব, তোমাকে দেখারও আগ্রহ কম নয়। বল তো দেখতে পারি যোগাযোগ করে।'

'ফরসা যদি দরকার হয়, লাল ফরসার দেশে যাবো এক বছর বাদে। তখন অনেক জুটবে বাছাই করার, বুঝেছো ?' গম্ভীর গলায় সুনীল বললে।

'ও তাই নাকি ?' সুলেখা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে ; তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে দেখে সুনীল ব্যস্ত হয়ে বললে, 'রাগ হলো মনে হচ্ছে ; আমায় খোঁচাতে আসা কেন ?'

সুলেখা হাতজোড় করে বললে, 'ঘাট হয়েচে, আর খোঁ:াতে যাবো না, এখন দয়া করে বলবে, কেন একা একা বসে চোখের জল ফেলা হচ্চিল ?'

'একা একা ছাড়া দোকা পাই কোথায় ? ছবি আঁকতে গিয়ে পারলুম না, তোমার ফরসা কন্যার দৃষ্টি এড়াতে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লুম, মনের মধ্যে আজেবাজে কত কথা ভিড় জমালো। তারপর এত শূন্য নিরর্থক লাগলো, এমনি এমনি চোখ দিয়ে জল গড়াল !'

'আমার সেদিনের কথায় পাল্টা ঠাট্টা হচ্ছে ? বেশ, আর কিছু জানতে চাইব না। আমি যাই।' রেগে বললে সুলেখা। সে উঠে পড়তে তার হাত চেপে ধরে মিনতি ভরা কণ্ঠে সুনীল বললে, 'রাগ করো না সুলেখা। আজ নয়, একদিন সব বলবো।'

সুনীলের চোখ আবার ছলছল করে উঠলো। সুলেখা অপরাধীর মত বললে, 'থাক্ থাক্ ! যখন তোমার ইচ্ছে বলো, এখন নীচে চলো।'

॥ ৮ ॥

কলকাতায় ভোরের এ্যালাম লাগে না। লেজ বোঁচা ঘাড় ছাঁটা বেঁটে বেঁটে আরবী টাট্টু ঘোড়ায় টানা, লোহার চাকায় করোগেটের তৈরী ময়লা ফেলা ধাঙড়দের গাড়ীর ধাতবমুখর শব্দ সারা পাড়া জাগিয়ে দেয়। তারপরই পানিদারদের পাইপে জলের শব্দ রাস্তা ধোয়ার সুনীলকে বিছানা ত্যাগের ইঙ্গিত দেয়। বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে যায়। কলঘরে ঢোকার আগে বারান্দায় দেখা হয়ে যায় আনন্দময়ীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'কি রে, আজ চা না খেয়েই নেবে এলি ?'

'চা দাও মামণি, তাড়া আছে।'

'বোস।' আনন্দময়ী একটু পরে চায়ের কাপ আর বিস্কুটের ডিস নামিয়ে বলেন, 'তুই খেয়ে নে, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।'

সুনীল বিস্কুট তুলে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে, চারিদিক চেয়ে সুলেখাকে দেখতে না পেয়ে অবাক লাগে, চেঁচিয়ে বলে, 'মামণি, সুলেখা কোথায় গেল?' রান্নাঘর থেকে বললেন আনন্দময়ী, 'শুয়ে আছে, বলচে শরীরটা ভাল নেই। রাত্রে ঘুম হয়নি, একটু বেলায় উঠবে।'

সুনীলের কপাল কুঁচকে গেল, চা শেষ করে সে কলঘরের দিকে গেল। প্রাতঃক্রিয়া শেষ করতে সুনীল সময় নিলো। রাত্রে তারও ভাল ঘুম হয়নি, কলের তোড়ে মাথা দিয়ে স্নান সারলো। সে যখন বারান্দায় এলো, দেখলে সুলেখা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে সুনীল বললে, 'শরীর খারাপ অথচ উঠে পড়েছো!'

মুচকি হেসে সুলেখা নিম্নস্বরে বললে, 'মহাশয়ের বেড-টির আগেই নীচে আগমন, ভাবনা হলো।'

'লাভ হলো, মামণির হাতের চা।' বলে সুনীল চেয়ে রইলো সুলেখার সদ্য ঘুম-ভাঙা, অগোছালো চুলের রাশি ঢাকা মুখমণ্ডলের দিকে।

'কি দেখচো?' আস্তে বললে সুলেখা।

লজ্জিত জড়ানো কণ্ঠে সুনাল কি যে বললো বোঝা গেল না। সে চকিতে সুলেখার দিকে চেয়ে ওপরে উঠে গেল।

আকাশের দিকে চাইল সুনীল বারান্দার ধারে। আকাশের কোণে মেঘ জমেছে, ঘন কাজল রঙের ওপরে ফিকে নীল এখনও আছে, থাকবে না, ধূসর হলো বলে। আঁকা যাবে? কে জানে! ঘরে ঢুকলো, ইজেলে কাগজ আঁটলো। রঙ-তুলি নিয়ে একমনে আকাশ মেঘ আঁকতে লেগে গেল। নীচে থেকে মামণির ডাক, 'নীচে আয় সুনে, খাবার দেওয়া হয়েচে।' সুনীল ছবির আকাশ মেঘ দেখে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'হয়নি।' তুলি রেখে নীচে নেমে গেল। আসনে সুলেখা বসে, মণ্টু বসে, সুনীল গিয়ে বসলো খাবার ঘরে। ঠাকুর লুচি তরকারির থালা, কামিনী জলের গেলাস দিয়ে গেল। আনন্দময়ী বড় একটা পাথরের বাটিতে কাটা ফল আর সন্দেশের চেঙারি নিয়ে সামনে বসলেন। তিনজনে খাওয়া শুরু করে দিল।

ছুটির দিনে সকালের খাওয়া একটু বিশেষ রকম। বেলা করে দুপুরের ভোজন। সুনীল বললে, 'মামণি, এবারে কিন্তু উড়িয়ার দোকানের বেগুনী চপ মুড়ি খাওয়া হয়নি।'

'বেশ তো একদিন বিকেলে আনিয়ে দেবো।'

সুলেখার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সুনীল বললে, 'মামণি, সুলেখা বকুনি টকুনি খেয়েছে আজ ? মুখটা কোলাব্যাঙ করে আছে !'

মণ্টু বলে উঠলো 'এঁকে নাও, প্রাইজ পেয়ে যাবে সুনেদা।'

সুলেখা ধমক দিলে, 'দেখবি ! ফাজিল কোথাকার।'

আনন্দময়ী বললেন, 'ওর খেতেই ইচ্ছে ছিল না, বলছিল শরীর ভাল নেই।'

সুনীল ভাবলো হতে পারে, সকালে তাকে ডাকতে যায়নি এমন তো হয় না ! 'থারমিটার দিয়েছ ? জ্বর হয়নি তো ?' সুনীল জিজ্ঞেস করলে।

'না জ্বর হয়নি মা, থারমিটার দেওয়ার দরকার নেই।' সুলেখা জোর দিয়ে বললে।

খাওয়া শেষে সকলে উঠে গেল। সুলেখার পেছনে সুনীল ওর ঘরে ঢুকলো। সুলেখা পড়ার টেবিলে বসতে সুনীল কাছে গিয়ে বললে, 'কই দেখি জ্বর নেই বলছো।' কপালে হাত দিয়ে বললে, 'ছ্যাক্ ছ্যাক্ করছে থারমিটার দিলে পারতে !' একটু হেসে সুলেখা বললে, 'জ্বর নেই এমনি।' হেসে ফেলে সুনীল বললে, 'এমনিতে আমাদের পেয়ে বসেছে, তাই না ?' সুলেখার মুখ ভার হয়ে উঠলো, সুনীলের মুখ বিষণ্ণ, সে নিজেকে সংযত করে কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুলেখা উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালো। রাতে ঘুম হয়নি, শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, দুঃস্বপ্নের মত কত চিন্তা। মায়ের সেই ভদ্রমহিলাকে বলা কথা—দিদি, তা হয় না। ওরা ভাইবোনের মত মানুষ হয়েছে। ইত্যাদি সব কথা বারেবারে। খুব রাগ হলো সুলেখার সেই মহিলার অযাচিত আগ্রহে। কি দরকার ছিল ওঁর বিবাহ ভাবনার ? সুলেখা শুয়ে পড়লো বিছানায়, অনিরুদ্ধ আবেগে সে মুখটা চেপে ধরলো বালিশে।

তুলি-রঙ নিয়ে সুনীল তন্ময়। আকাশ আর মেঘের ভাবনা চলে গেছে। স্বপ্নাচ্ছন্ন শিল্প-চেতনা সুনীলের তুলিতে, ঘুম ভাঙা বিষণ্ণ একটি মুখ। বেদনাক্লিষ্ট তার গাঢ় চোখের ভাষা তুলির স্পর্শে ফুটে উঠছে, যা সে কি মনে প্রাণে চায়। এর আগে এমন করে সে তো চায়নি। আজ আর কোন বাধা তুলির মুখে নেই, গাঢ় চোখের ভাষাও স্পষ্ট ফুটে উঠছে প্রসক্ত প্রেয়সীর মিলন কামনার উত্তরণ ছবির মধ্যে। সখি নয়, ভগিনী নয়, প্রেয়সীর প্রতীক্ষা দৈব্যসূত্র, জৈবসূত্র, ভবিতব্য অস্বীকার করে মিলনাকাঙ্ক্ষায়। ছবি যত শেষ হয়ে আসতে লাগলো, সুনীলের মন আবেশে ভরপুর হয়ে উঠলো। ধূসর মেঘপুঞ্জে নীল আকাশ ছেয়ে গেছে। প্রেয়সী প্রতিমার আঁখিতারা জীবন্ত হয়ে উঠলো তুলির শেষ টানে। মুগ্ধ নেত্রে ধ্যানস্থ হলো সুনীল।

খেয়াল নেই কখন সুলেখা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। মুখ দিয়ে আর্তনাদের মত বেরিয়ে এলো, 'এ কি করেছো !'

সুনীলের সাড়া নেই। সুলেখার মাথা ঘুরছে ঝিমঝিম করছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিদ্যুৎ স্ফুরণ। সে আর থাকতে পারলো না, ঝড়ের মত নীচে নেমে গেল।

॥ ৯ ॥

দোতলার বারান্দায় চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি সন্ধ্যা থেকেই। চাঁদের দিকে পিঠ করে সুলেখা বসে সতরঞ্চির ওপর। দক্ষিণের বাতাস বেশ পাওয়া যায় এখানে। সুলেখার মাথার সামনের দিকে কুঞ্চিত কুন্তল চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। মুখের আলো-ছায়ায় মনে হচ্ছে পাথরে খোদাই করা বিষাদের প্রাণহীন প্রতিমূর্তি। হাতে তার ফ্রেমে আঁটা সেলাইয়ের রুমালে কি যেন কাজ হচ্ছে, নাম লেখাও বাকি। এখন ছুঁচটাকে অজায়গায় বিঁধে রাখা হয়েছে। দরজায় ঠেস দিয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আনন্দময়ী বসে আছেন। বারান্দার আলো নেভানো। আনন্দময়ীর প্রশান্ত মুখশ্রীতে অশান্তির ছায়া। মেয়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'সুনীল তো এখনও এলো না?' সুলেখা চুপ করে রইল। আনন্দময়ী আবার বললেন, 'সুনে আজ ক'দিন খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যায় আর রাত করে বাড়ী ফেরে। তুই কি কিছু জানিস কোথায় যায়?'

'আমি কি করে জানবো!' নির্লিপ্ত কণ্ঠে সুলেখা বলে।

'তোকেও কিছু বলে যায় না?'

'না!' সুলেখার না বলার সঙ্গে সঙ্গেই চটির শব্দ হলো সিঁড়িতে। মা, মেয়ে চাইলো সেইদিকে। ধীরে ধীরে সুনীল উঠে এলো, চটি খুলে এগিয়ে এলো আনন্দময়ীর দিকে। চোখ দুটো লাল টকটকে, মুখটা লালচে, চোখের কোলে যেন একপোচ কালি লেপে দিয়েছে, চলার ভঙ্গিতে একটা থমথমে ভাব, শ্রান্তিতে যেন ভেঙে পড়বে। আনন্দময়ীর কোলের কাছে বসে পড়লো সুনীল। আস্তে আস্তে গড়িয়ে গেল আনন্দময়ীর কোলে মাথা দিতে। ব্যস্তভাবে আনন্দময়ী তার মাথাটা ঠিক করে তুলে নিলেন কোলে, চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এঁ্যা, গা যে তোর পুড়ে যাচ্চে! আজ কদিন অত্যাচার করে জ্বর করলি হতভাগা ছেলে। কি এমন রাজকার্যে যেতেচিলে? এখন!'

আনন্দময়ীর হাতটা টেনে নিয়ে কপাল চেপে ধরে সুনীল বললে, 'মামণি, বকুনি পরে দিও, এখন মাথাটার ব্যবস্থা করো, ভয়ানক যন্ত্রণা!' চিন্তায় ভয়ে ব্যস্ততায় মুখ নামিয়ে চেপে ধরলেন সুনীলের কপাল। আনন্দময়ীর রাগের লক্ষণ আর নেই, তার বদলে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ ভরা। দু'হাত দিয়ে হাত বোলাতে বোলাতে সুনীলের মাথাটা টেনে নিলেন ঠাণ্ডা বুকের মধ্যে, হাত তখন গরম হয়ে উঠেছে। সুলেখা তাড়াতাড়ি উঠে

ওডিকলনের শিশি, জলের বাটি, ন্যাকড়ার টুকরো নীচের থেকে নিয়ে এলো। মামণির বুকের মধ্যে চোখ বুজে সুনীল শুয়ে।

যে অশান্তি কদিন তাকে ক্ষিপ্তের মত কলকাতায় ঘুরপাক খাইয়ে বেড়াচ্ছিল, সিনেমার তিন-তিনটে শো দেখেও মনটাকে শান্ত করতে পারেনি। কত অজুহাত মনে মনে কল্পনা করেছে, কোন মীমাংসাই হয়নি। শুধু একটা নির্মম হতাশা, এক অন্ধকার অভিশপ্ত ভবিষ্যতের ঘূর্ণাবর্তে ডুবে গেছে সে। মামণির কোলে এ কি যাদু, শান্তি প্রলেপ! কোলের ওপর মাথা রেখে ওডিকলন ভেজা ন্যাকড়া দিতে দিতে আনন্দময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'মাথার যন্ত্রণা একটু কমেচে সুনে?'

'একটু কি মা, অনেক কমে গ্যাচে।'

একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দময়ী সুলেখাকে বললেন, 'থারমিটার আন্, জ্বরটা দেখি।'

সুনীল চোখ বুজে ভাবতে লাগলো, কি যে পাগলের মত ছুটে বেড়ালো, মামণির কাছে থাকলে এত অশান্তি ভুগতে হতো না। তার ভয় হচ্ছে সে বোধহয় স্বাভাবিক নয়, মানসিক কোন বিকৃতি তাকে মাঝে মাঝে উন্মাদ করে তোলে। সুলেখা থার্মোমিটার দিল, আনন্দময়ী সুনীলের শার্টের বোতাম খুলে হাত তুলে আঁচল দিয়ে মুছে, থার্মোমিটার লাগিয়ে হাত চেপে রাখলেন। মিনিট দুই রেখে থার্মোমিটার বার করে সুলেখার হাতে দিয়ে বললেন, 'আলো জ্বেলে দেখ্ তো কত জ্বর।'

ঘরের আলো জ্বেলে দেখে নিয়ে সুলেখা বললে, 'মা, জ্বর একশো দুয়ের একটু ওপরে।'

'সুলেখা, রাস্তার পাজামা পাঞ্জাবী ছাড়াতে হবে, সুনের পাজামা গেঞ্জি নিয়ে আয়, আর কামিনীকে একটু জল গরম করে আনতে বল্, আর ঠাকুরকে এক কাপ দুধের চা করে দিতে বল্। কি রে সুনে, বিকেলে চা খাসনি তো?' আনন্দময়ী সুনীলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন।

'মামণির কিছু ফাঁক যাবার জো নেই।' হেসে তাঁর দিকে চেয়ে সুনীল বললে।

পাজামা গেঞ্জি এনে দিয়ে সুলেখা নীচে চলে গেল। আনন্দময়ী সুনীলের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সিঁড়ির দিকে চেয়ে রইলেন গরম জলের অপেক্ষায়।

একটা গামলায় গরম জলে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে, গামছা তোয়ালে নিয়ে সুলেখা এল। আনন্দময়ী সুনীলের মাথাটা আস্তে নীচে নামিয়ে বললেন, 'তোর হাত-পা মুচে দি সুনে!'

সুনীল তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, 'আমি মুছে নিচ্ছি, তোমাকে মুছতে হবে না।' গামলাতে গামছা ভিজিয়ে আনন্দময়ী সুনীলের হাতে দিল। সুনীল সার্ট খুলে প্রথমে মুখ হাত পা মুছে নিল, আনন্দময়ী শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে নিলেন সব। গেঞ্জিটা পরিয়ে

দিয়ে বললেন, 'তুই শুয়ে পড়, আমি পায়ের দিক মুচে দিচ্চি।' বলে উঠে গামছা ভিজিয়ে পা দুটো পরিষ্কারভাবে মুছে জল দিয়ে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছলেন।

সুনীল হাত বাড়িয়ে বললে, 'তুমি একটু এগিয়ে এস মামণি।'

'কেন?' অবাক হয়ে আনন্দময়ী এগিয়ে এলেন, সুনীল পায়ে হাত দিয়ে নিজের মাথায় ঠেকাল। আনন্দময়ী 'পাগলা!' বলে হেসে তার চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চুম্বন করলেন, 'পাজমাটা পায়ে গলিয়ে দিচ্চি, তুই কাপড়টা টেনে বের করে ফেলে দে, পাজামা ওপরে তুলে নে।'

সুনীল কাপড় টেনে ফেলে পাজামা তুলে নিল। আনন্দময়ী বললেন, 'চল্ সুনে, বিছানায় শুবি চল্।'

সুনীল উঠে বসলো। উনি বললেন, 'দাঁড়া।' তারপর সুলেখাকে ইসারায় ডাকলেন, সুলেখা এসে দাঁড়াল। আনন্দময়ী সুনীলের একটি হাত ধরে অন্য হাতটা সুলেখাকে ধরার ইঙ্গিত করলেন। সুনীল বিরক্ত হয়ে বললে রাগ করে, 'তোমরা আমায় একেবারে রুগী করে দিয়েছ! আমি নিজেই উঠে যেতে পারবো।'

'জ্বর রয়েছে মাথা ঘুরে যেতে পারে। চল্ না বাবা, এত রাগ করে না, আস্তে আস্তে চল্।'

সুনীল মুখ ভার করে সুলেখার দিকে চাইল। সুলেখা একটু মুচকি হাসল। দুজনকে টেনে নিয়ে গড়গড়িয়ে সুনীল ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কামিনী দুধের চা আনতে সে উঠে বসে কাপটা নিয়ে চুমুক দিল। আনন্দময়ী তার কপাল, বুক, হাতের উল্‌টো পিঠে ছুঁইয়ে দেখে বললেন, 'মনে হচ্চে গা মুছে জ্বরটা নেমেচে। একটু পরে থারমিটার দিবি সুলেখা। যদি জ্বর না কমে, বিশেকে পাঠাতে হবে ডাক্তারবাবুকে আনতে। তুই একটু বোস ওর কাচে, আমি একবার নীচে যাব। আজ উপাসনায় বসা হয়নি, সেরে আসি।'

আনন্দময়ী চলে গেলেন। সুলেখা খালি কাপটা টেবিলে রেখে, কাঁধে চাপ দিয়ে শুইয়ে দিল সুনীলকে। সুনীল সুলেখার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দ্বিধাগ্রস্ত মনে সুলেখার একটি হাত তুলে কপালের ওপর রাখল, একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। কারুর কোন কথা বলার ইচ্ছা হলো না। তন্দ্রাচ্ছন্ন সুনীলের মুখের ওপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ায় সুনীল চমকে চোখ খুললো, সুলেখা লজ্জিত হয়ে আঁচল দিয়ে মুছে নিলে জলের ফোঁটা। সুনীলের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না, সুলেখার একটা হাত টেনে নিয়ে চেপে ধরে চোখ বুজলো আবার। সুলেখা অন্য হাত দিয়ে কপাল, চুলের মধ্যে আঙুল ঘোরাতে লাগলো।

আনন্দময়ী নীচের থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কপালটা ঠাণ্ডা লাগচে একটু। থারমিটার দে জ্বরটা দেখে নে, রাত হয়ে গেলে ডাক্তার আসতে চাইবে না।' সুলেখা উঠে গেল। আনন্দময়ী মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'মনে হচ্চে কমেচে।' সুলেখা থার্মোমিটার ঝেড়ে মায়ের হাতে দিল। তিনি হাত তুলে আঁচল দিয়ে মুছে থার্মোমিটার দিলেন, ওপর থেকে হাত চেপে রাখলেন। আধ মিনিটের জায়গায় প্রায় দু'মিনিট বাদে থার্মোমিটার বের করে সুলেখার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখ্!'

সুলেখা দেখে খুশীর সুরে বললে, 'অনেক কমেচে মা, একশোর নীচে দু' পয়েন্ট।' আনন্দময়ী নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তাহলে রাত্রে ডাক্তার ডাকার দরকার নেই, সকালে দেখা যাবে।' সুলেখা বললে, 'সুনেদা কি খাবে রাত্রে?'

'আজ কিছু খাবে না, দুধ, একটা সন্দেশ। আমিও দুধ সন্দেশ খাবো। তোরা নিজেরা খেয়ে নিবি।'

মণ্টু ছুটে ওপরে উঠে জিজ্ঞেস করলে, 'মা, সুনেদার কি হয়েছে?'

'কিছু না, একটু জ্বর। তোমার মাস্টার মশায় চলে গ্যাচেন?'

'হ্যাঁ, আমি এখানে বসবো মা?'

'না বাবা, তুমি নীচে যাও, নীচে কেউ নেই। সুলেখা, তুই মণ্টুকে নিয়ে আমার ঘরে রাত্রে শুতে পারবি তো? কামিনীকে মেঝেতে শুতে বলবি। বিশেকে ওপরে বারান্দায়, আমি সুনের কাছে শোবো। দরজাগুলোয় চাবি দেখে নিবি শোয়ার আগে। আমাদের খাবার পাঠিয়ে দিয়ে তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়োগে।' সুলেখা চলে গেল। আনন্দময়ী সুনীলকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

॥ ১০ ॥

সুনীল সুস্থ হয়ে এসেছে, কিন্তু বাড়ীর বাইরে যেতে দেননি আনন্দময়ী। একতলায় নিজের কাছে শোয়াচ্ছেন। দু'দিনের যত্নেই তার মুখের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বেশীর ভাগ সময় বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে কাটাচ্ছে, মণ্টুর সঙ্গে আনন্দময়ীর সঙ্গে গল্প করে। সুলেখার সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা হয় না, সুলেখাও এড়িয়ে চলে। একতলায় উঁকি মেরে সুনীলকে ঘুমোতে দেখে সুলেখা উঠে গেল দোতলায়। সুনীলের ঘরে ঢুকে চারদিক খুঁজতে লাগলো। এটাচিটা খুলতেই সামনে তার ছবিটা দেখে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, এই তো! তুলে নিল ছবিটা দু'হাতে। দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলো, তার চেহারা এত ভাল! তার চোখ এত সুন্দর! মুখের ভাবে বিষাদিত প্রতীক্ষা। কেন এমন ছবি আঁকলো? এমন মুখ কেন আঁকলো? আমার মুখ

দেখেছে কদিন, কিন্তু নিজের মুখ আয়নায় দেখেনি। আমি আঁকতে পারলে আমিও এঁকে দিতুম ওর মুখের বিষাদক্লিষ্ট যন্ত্রণা, অস্থিরতা। মনে করে আমি কিছু লক্ষ্য করিনি; আমি যে পেছন থেকে দেখে গেছি, ছবির সামনে তন্ময় হয়ে বসে থাকা, তারপর উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ানো। আমি যেন কিছুই বুঝি না!

সুনীল ঘরে ঢুকে দেখলো, সুলেখা ছবি নিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। ফিরে যাবে ভাবছিল, পারলো না। ডাকলো, 'সুলেখা!' চমকে সুলেখা উত্তর দিল, 'কি?' সুনীল শুধালো, 'ছবিটা ভাল লাগছে?' রুদ্ধকণ্ঠে সুলেখা বললে, 'কেন তুমি এ ছবিটা আঁকলে?' ধীর গলায় সুনীল বললে, 'কি জানি! ক'দিন নিজেকেও প্রশ্ন করছি।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বললে, 'মনের ঝোঁকে কি যে হয়ে গেল, তোমার ছবি কেন যে আঁকলুম, বারেবারে মনে সেই প্রশ্ন আসছে, কিন্তু উত্তর মিলছে না। এবারে কলকাতা এসে থেকে তোমার চোখে মুখে ব্যবহারে কি যেন পেলুম, এর পূর্বে অনুভব করিনি। মনটা চঞ্চল বিষণ্ণ হয়ে উঠলো, অথচ কি কারণে বুঝিনি।'

ধরা গলায় সুলেখা বললে, 'এই ছবিটা ছিঁড়ে ফেলি।'

আকুল আগ্রহে ছবিটা কেড়ে নিয়ে সুনীল বললে, 'না না, ওটা আমি নষ্ট হতে দেবো না, ওটা আমার সৃষ্টি মনে রেখো, ছবিটা এখনও ফিনিশ হয়নি, পরে করবো।'

'মা বা আর কারো চোখে যেন না পড়ে, আমার অনুরোধ।' ধরা কণ্ঠে বললে সুলেখা।

'কোন ভয় নেই, ওটা আমি চাবির ভেতরে রাখবো।' সুনীল বললে আশ্বাস দিয়ে।

মৃদু কণ্ঠে সুলেখা বললে, 'অনেকক্ষণ ওপরে এসেচো, নীচে চলো, নয়তো মা উঠে আসবেন তোমার খোঁজে।' সুনীল একটু হেসে বললে, 'ঠিক বলেছো, চলো চলো।'

রাস্তায় তপ্‌সে মাছ যাচ্ছে হাঁকতে হাঁকতে, আনন্দময়ীর গলা পাওয়া গেল, 'বিশে, তপ্‌সে মাছওয়ালাকে ডাক্।' বারান্দায় বেরোবার আগে সুনীলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তপ্‌সে মাছ খাবি তো সুনে? তোর আবার মাছ খাওয়ার বাচবিচার!'

'নিশ্চয় খাবো মামণি।'

কাঠের বারকোশে সাজানো বিকেলে গঙ্গায় ধরা তপ্‌সে মাছ নিয়ে চেনা মাছওয়ালা বারান্দায় এলো। আনন্দময়ী ওজন দেখে মাছ নিলেন। ভালমন্দ দরদস্তুর বাছাবাছির কোন প্রয়োজন থাকে না, চেনা মেছো সব বেছে দিয়ে দাম নিয়ে চলে গেল। রান্নাঘরে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলো, 'কি দাম নিল মা?'

'বারো আনা সের।'

'মা, আজ দাম বেশী নিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা দেখলুম, দশ আনা।'

'হবে হয়তো।' বলে আনন্দময়ী ঘরে এলেন। সুনীল শুয়ে আছে, সুলেখা একটা টুলে বসে বই পড়ছে; তাদের দিকে চেয়ে আনন্দময়ী বললেন, 'উনি তো কাল সকালে ফিরবেন লিখেছেন।' সুনীল উঠে বসলো, বললে, 'জেঠুবাবুকে আনতে হাওড়ায় যাবো মামণি?'

'তোমার শরীর খারাপ, সঙ্গে সুবোধ আছে চিন্তা নেই। তোমরা চলো, এখন রাত হয়েছে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও, আমি যাচ্ছি।'

॥ ১১ ॥

ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে। বিশু হাসিমুখে গেট খুলে দিল। বারান্দায় বাড়ীর সকলে অপেক্ষায়, সুনীল শুধু এগিয়ে গেল। তাকে দেখে ফণীবাবু বললেন, 'সুনীল মাস্টার, তোমার বাবা ভালই আছেন। আরে তোমার মুখটা একটু শুকনো দেখাচ্ছে যে।'

সুনীল একটু হাসলো। ফণীবাবু বললেন, 'বিশু, গাড়ীর চাল থেকে জিনিসগুলো সাবধানে নামিয়ে নে।' গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে, নিজের সুটকেশটা হাতে নিয়ে ভেতরে গিয়ে আনন্দময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, 'কেমন ছিলে সব?' মুচকি হেসে আনন্দময়ী বললেন, 'ভালই।' সুলেখা হেসে বাবার হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে নিল।

সবাই বাইরের ঘরে বসলো, ফণীবাবু চেয়ারে বসে আরামের নিঃশ্বাস নিলেন। আনন্দময়ী ভেতরে গেলেন চা আনতে। তাঁর জানা আছে, কর্তা চা না খেয়ে আর এক পা-ও নড়বেন না। কামিনী চায়ের ট্রে নামিয়ে দিল বাবুর সামনে টিপয়ে, আনন্দময়ী একটা প্লেটে বাবুর প্রিয় জেকবের ক্রীম ক্র্যাকার দিয়ে চা তৈরী করতে লাগলেন। চায়ের কাপ হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত কি এনেচো ঝুড়ি ঝুড়ি?'

ফণীবাবু বললেন, 'শচীনের মক্কেলরা তাদের বাগানের আম লিচু আরো কি সব জোর করে চাপিয়ে দিলো, আমার আপত্তি কিছুতেই শুনলো না।'

আনন্দময়ী বললেন, 'আহা দ্যাখ ত বাজারে বিক্রি করলে দাম পেত।' সুনীল বললে, 'ওরা ওই করে।'

ফণীবাবু বললেন, 'শহরে তোমরা বুঝতে পারো না, শহরের বাইরে এখন যে কি অভাব চলছে! ফসলের দাম পাচ্ছে না, চাষীরা নগদ টাকার জন্যে মহাজনের কাছে ধার-দেনা জমিজমা বাঁধা পড়ছে। পাঁচ-সিকে দেড় টাকা মণ ধান বেচতে হচ্ছে, গম একটু বেশী

দাম। বললে, বাবু, হাজার হাজার আম গাছের তলায় পড়ে পচছে, বাজারে কে কিনবে? দাম যা পাবে খরচা উঠবে না বওয়ানির।'

আনন্দময়ী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তাহলে লোকে চাষবাস করবে কেন?'

ফণীবাবু বললেন, 'এটা আর্থিক সঙ্কট চলছে। সারা দুনিয়ায় এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে, আমাদের মত কৃষি প্রধান দেশে তো চরম অবস্থা। আমেরিকার মত দেশে গাডী গাডী কমলালেবু ইত্যাদি সমুদ্রের জলে ফেলে দিচ্ছে দাম ঠিক রাখার জন্যে। এখন চাষীদের দুর্দিন, নগদ টাকা যারা পায় তাদেরই সুবিধা। আমাদের দেশে এখন চাকুরে বাবুরা সবচেয়ে সুখী আছে, সস্তায় বাজার করে, কলকাতা বা ছোট শহরের লোক তত বোঝে না, কুলী মজুর নগদ পয়সা রোজগারের লোকরা সস্তায় মাল পায়, কিন্তু দেশে শতকরা আশী ভাগ লোক মর্মে মর্মে বুঝছে এই সঙ্কটের দিন! আমরা চাকুরে গোষ্ঠী, আমাদের এতেই সুখ, বুঝেচো?'

আনন্দময়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তা তুমি এতসব জানলে কি করে?'

ফণীবাবু একটু হেসে বললেন, 'পাটনায় আদালতের কাজে অনেক গ্রামের লোক আসা-যাওয়া করতো, বিহার চাষ প্রধান প্রদেশ, ওখানে ঘরে বসেই অনেক খবর জেনে গেলুম। ওখানে লেখাপড়া করতে হয়নি, গল্প করেই সময় কেটে যেতো।'

'যাক্ এখন ওঠো কলঘরে যাও, আমি কাপড গামছা দিয়ে আসছি।' আনন্দময়ী চলে গেলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে ফণীবাবু নিজ ঘরে আরাম করছেন বিছানায় শুয়ে। গরমের দ্বিপ্রহরে অন্ধকার করা ঘর, পাখা চলছে, দু'বেলা মেঝে মোছার দরুন বেশ ঠাণ্ডা ঘর। আজ আর লাইব্রেরীঘরের ডিভানে বিশ্রাম নয়, তাঁর যেটা অভ্যাস। দিবাভাগে ঘরের বিছানায় শোয়া তাঁর রীতিবিরুদ্ধ। অনেকদিন কলকাতা ছাড়া, আনন্দময়ীর সঙ্গে একটু কথাবার্তার মতলবে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে আনন্দময়ীর বেশ একটু দেরি হলো, ঘরে এসে অবাক হলেন কর্তাকে বিছানায় দেখে। লজ্জা মিশ্রিত সুখানুভূতিও যে হয়নি তা নয়। ধীরে ধীরে দরজাটা ভেজিয়ে খাটের পাশে এসে মাথা নীচু করে কর্তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'লজ্জা করে না বুড়ো বয়সে দিনের বেলা এ ঘরে শুতে?'

চট্ করে তার হাতটা ধরে বিছানায় টেনে নিয়ে ফণীবাবু বললেন, 'বোস বোস, এমন কিছু আর জরাগ্রস্ত হয়ে যাইনি আমরা।'

আনন্দময়ী মাথার দিকে বসলেন, তাঁর কোলে একটা হাত রেখে ফণীবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'শচীনের অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হয় আনন্দ। কত কম বয়স থেকে

সঙ্গীহীন, আমায় পেয়ে ক'দিন কী খুশী! রামু বললে, আপনি এলে বাবু যেন জোয়ান হয়ে যান আনন্দে!'

আনন্দময়ী টাকরায় একটা আওয়াজ করে বললেন, 'আহা বেচারা!' ফণীবাবু দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'অদ্ভুত চরিত্র এই শচীনের, এরকম দেখা যায় না। এখনও রোজ একবার বৌমার আঁকা ছবিগুলো নাড়াচাড়া করে, ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আমায় গোপন করছিল। আমি আঁচ করেছি কদিন!'

'তুমি হলে করতে?' ধরা গলায় বললেন আনন্দময়ী।

ফণীবাবু হেসে বললেন, 'মরে দেখো না।'

আনন্দময়ী বললেন, 'সুবিধেই হবে আর একটা বিয়ে করে নেবে।' ফণীবাবু বললেন, না গো না।' কর্তার চুলে আঙুল খেলাতে খেলাতে আনন্দময়ী বললেন, 'ঢের দেখা আছে গো! এক বছর যেতে না যেতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে ঠাকুরপোর অবস্থা হলে।' দুটো হাত তুলে আনন্দময়ীকে জড়িয়ে একটু আদর করে নিলেন ফণীবাবু।

'আঃ ছাড়! কি যে কর! দরজায় খিল দেওয়া নেই।' কপট রাগের ভান করলেন আনন্দময়ী।

ফণীবাবু সামলে নিয়ে বললেন, 'এরপর আর একটা খবর শোন। একবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর ডাক্তার নাকি বলছেন, ওর হার্ট একটু খারাপ মালুম হচ্ছে। খাওয়ার ব্যাপারে ধরাকাট করে দিয়েছেন আর একবার বড় ডাক্তার দেখাতে বলেছেন কলকাতায়। একে তো ওই মনিষ্যি তায় ডাক্তারের অনুমান। তাই আমায় চিঠি দিলে তাড়াতাড়ি উইলপত্তর টাকাকড়ি দলিল করতে এটর্নীর কাছে তাগদা দিয়ে, যাতে সুনীল না ফ্যাসাদে পড়ে কিছু হয়ে গেলে। আমায় বলে কিনা, ও তো আনন্দবৌদির ছেলে, ওকে তো তোমাদের দিয়েই দিয়েছি, তুমি আর বৌদি উইলের একজিকিউটর হও, আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি সোজা বলে দিলুম, আমি লেখাপড়ার মানুষ, টাকাপয়সা সম্পত্তির দায়িত্ব নিতে পারব না, তুমি তোমার আত্মীয় এটর্নীর দায়িত্বে রাখ, আমি দেখার দরকার হলে দেখে দেব, তোমার বৌঠানকে জিজ্ঞেস করে দেখব কলকাতা গিয়ে। ওর একটা বদ্ধমূল ধারণা, সুনীল আমাদের বাড়িরই হয়ে যাবে। খুলে কিছু বললে না বটে, তবে কথায় আঁচ পেলুম। ও বললে সুনীলের পৈতেটা নাকি খুলিয়ে রেখে দিয়েছে। সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, কিছু মানে না, শুধু পৈতে গলায় ঝুললেই ব্রাহ্মণ হবে? বৌঠানের ছেলে বৌঠানেরই থাক।'

আনন্দময়ী ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠলেন, 'এ আবার কি কথা, পৈতে থাকলে আমার ছেলে থাকবে না?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে ফণীবাবু বললেন, 'ওসব কথা থাক, শচীনের মনে সুনীলকে নিয়ে অনেক সমস্যা রয়েছে। ওর ধারণা সুনীল লেখাপড়ায় ভাল কিছু করতে পারবে না ভবিষ্যতে। একমাত্র আঁকায় যদি কিছু করতে পারে। সুনীলের স্বভাব লক্ষ্য করে ওর বিশ্বাস, সুনীলের অর্থের মায়া বা টান নেই, কাজেই কোনদিন পেশাদারি ব্যবসা-বুদ্ধি ওর হবে না। টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করতে পারলে ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। তবে লোকে সুবিধে পেলে ঠকাতেও পারে, তাই আমাদের ওপর ভরসা রাখতে চায়। শচীনের বিশ্বাস, সুনীল তোমার কথা কোনদিন অমান্য করতে পারবে না। ওর মনের ইচ্ছা যতদূর বুঝলুম, সুনীলের সঙ্গে সুলেখার বিয়ে হলে সবদিক বজায় থাকে।'

আনন্দময়ী ছটফট করে বললেন, 'না-না, সেকি করে হয়? ওরা দুজনেই আমার দুধ খেয়ে মানুষ, ওরা যে ভাই-বোন হয়ে গেচে।' ফণীবাবু চুপ করে গেলেন। আনন্দময়ী তাঁর গায়ে হাত বোলাতে গিয়ে বললেন, 'তোমার এত ঘামাচি হয়েচে, ওখানে পাউডার দাওনি গরমের সময়?'

'কে দেবে, শচীন না রামু, নিজে তো কোনদিন ওসব পারি না।'

'অকম্মার ঢেঁকি!' বলে উঠে গেলেন আনন্দময়ী। পাউডারের কৌটো নিয়ে দরজায় আস্তে আস্তে খিল তুলে দিয়ে ফিরে এলেন বিছানায়। পাউডার ছড়িয়ে সারা গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। ফণীবাবু আরামের শব্দ করে বললেন, 'আনন্দ, তোমার হাত এত নরম এখনও, আশ্চর্য! সংসারের কাজ করে বেড়াচ্চ। অথচ এই বয়সে হাতটিকে কুমারীর করে রেখেচ!'

আদরের চাপড় মেরে আনন্দময়ী বললেন, 'যাও, খোসামুদির দরকার নেই। পাশ ফেরো, পিঠে দিয়ে দি।'

'পিঠে লাগিয়ে শুয়ে পড়ো আনন্দ, খেয়ে আসার পর একবারও পিঠ ঠেকাওনি বিছানায়।'

আনন্দময়ী আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'শোব, কিন্তু মণ্টুর স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়ে গ্যাচে, মনে থাকে যেন মশাইয়ের।' আনন্দময়ী পাশে শুয়ে পড়লেন, ফণীবাবু তাঁর গায়ে একটা হাত ফেলে চোখ বুজলেন।

॥ ১২ ॥

আজ রাতের ট্রেনে সুনীল ফিরবে পাটনায়। সকাল থেকে মনটা বিক্ষিপ্ত। গতকাল একটা গ্রুপ ফটো আর নিজের, মামণির, সুলেখার, আলাদা আলাদা ফটো।

তুলিয়ে নিয়েছে 'রতন' কোম্পানীর লোককে বাড়ীতে এনে। আজ বিকেলে ফটোগুলো আনতে যেতে হবে। ভাবনায় ডুবে আছে। সুলেখার সান্নিধ্য শেষ করতে হবেই ? কেন ?

মামণির স্নেহময়ী মুখ ভেসে ওঠে। সদ্য গোঁফের ছায়া পড়া সুনীল শৈশবের শান্তির নীড়ে ফিরে যায়। ভুলে যায় দ্বিধান্বিত সদ্য প্রাপ্ত পুরুষালির অনিরুদ্ধ আকর্ষণ। আশৈশব প্রীতিবন্ধনের আশাতীত অনুকল্প ঘটে গেছে এবারে। আগুন জ্বলে গেল ঠাণ্ডা কাঠের ঘর্ষণে। গার্হস্থ্য আইনে ভুলতে হবে সেকথা। হ্যাঁ, তাই। মা আনন্দময়ী কি সবাই হতে পারে ? তাঁর মাতৃস্নেহ নিংড়ে নিয়েছি, প্রতিদানে কতটা দিতে হবে সে খেয়াল থাকা উচিত নয় কি ? সুনীল হৃৎপিণ্ডে দ্রুত কম্পন অনুভব করলো, চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিলে। সত্যি তো সে সুলেখার যোগ্য পাত্র নয়, এ কথা যদি এ বাড়ীতে কেউ ভাবে সেটা মোটেই ভুল হবে না সংসারিক বিচারে। বয়সে, সামর্থ্যে, ধর্ম-বিশ্বাসে তার সুলেখার ওপর কোন দাবী থাকা চলে না, তার ওপর মামণির মাতৃত্বের অনন্য দাবী। সমাধান চিন্তায় আত্মস্থ হয়ে পড়লো সুনীল। তার অজান্তে কখন নিশব্দে সুলেখা এসে বসেছে চেয়ারে, তার মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে আছে মুগ্ধতা মেশানো। সুনীল চোখ না খুলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কেন এলে ?' তার স্বরের রূঢ়ত্ব চাবুকের মত পড়লো সুলেখার ওপর। তার ঠোঁট ফুলে উঠলো, মুখ রক্তাভ হলো, আহত কণ্ঠে বললে, 'তোমার মামণি বললেন, সুনের জিনিসপত্তর গুছিয়ে দিয়ে যেতে, রাত্রের ট্রেনে যাবে।' মাথা নাড়তে নাড়তে সুনীল ভারী গলায় বললে, 'কেন এলে কথাটা তোমাকে নয়, আমারই আর্তনাদ ; তোমাকে বলা নয়, এইক্ষণে নয়, হয়তো কোনদিনেরই নয় !'

'কি পাগলের মত বকচো ?' সুলেখা বললে।

'পাগলই বটে। তুমি না এলে আমি নিঃস্ব থেকে যেতুম, আমার অস্তিত্ব গুলিয়ে যেত। তবু বলবো তুমি এসো না, তোমার স্রোতের মুখ পাল্টাও। তুমি কি জানো আমার প্রীতি, প্রেম হয়ে নিষিদ্ধ সাগরে শতদল হয়ে ফুটে উঠছে ! কেন এলে আমার জীবনে একথা দম্ভ নয়, আদেশ নয়, অভিমান নয়, আক্ষেপ। শুধু তোমাকে বাঁচাবার স্বাভাবিক সরল মানবিকতা।'

সুলেখা ম্লান হেসে বললে, 'কি বাজে বকচো ?'

মিনতির স্বরে সুনীল বললে, 'আমায় ভুলে যাও সুলেখা। স্নেহের বেশী কিছু নয়, শুধু তোমার একটু স্নেহ পেলেই আমি সন্তুষ্ট।' দু'জনেই নীরব হয়ে গেল, দুজ্ঞেয় রহস্যে ঘেরা বয়ঃসন্ধিক্ষণে। সময়ের হিসেব ছিল না। কামিনী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'মা জানতে চাইলেন, দাদাবাবু কি চা খাবেন ?' সুনীল বললে, 'নিয়ে এসো।' সুলেখা তুলি রং জামা-কাপড় গোছাতে লাগলো সুনীলের সুটকেশে। সুনীল মন হালকা করার জন্যে

সুলেখার দিকে হেসে চেয়ে বললে, 'আরে, তোমার হাতের বালাগুলো তো দেখছি না?' সুনীলের দিকে আড়চোখে চেয়ে ঠাট্টার স্বরে সুলেখা বললে, 'যাক্ এতদিনে চোখ পড়লো হাতে?' চোখ অবশ্য আগেই পড়েছে এখন এটা না পড়ার ভান: সুলেখার সবকিছু মায় চলাফেরা ভাবভঙ্গি সব সুনীলের মুখস্থ; তার চোখের দৃষ্টি খুব তীব্র, তাই যত যন্ত্রণা। সে বললে, 'সুলেখা, ক'দিন তোমার ডিক্সেনারী মার্কা মুখটা দেখতে মোটেই ভাল লাগছে না, একটু হাসিমুখ করো, যাবার সময় দেখে যাই।' গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে সুলেখা, 'নিজের মুখ তো কেউ দেখতে পায় না তাই রক্ষে।' কামিনী চা দিয়ে গেল। কাপ তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বললে সুনীল, 'মামণির চায়ের রং দেখো, (সুলেখা উঁকি দিল) ঠিক তোমার গালের রঙ।' বলে সুনীল চায়ে চুমুক দিল।

'যাও, তুমি দিনে দিনে বড় অসভ্য হয়ে উঠচো।' সুলেখার গালের রঙ পাল্টায়। সুনীল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সুলেখা জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি পরে যাবে ট্রেনে?' একটু দেরীতে উত্তর দেয় সুনীল, 'খাকি হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট সাদা আর ফুল মোজা বার করে রেখো।' জানালার বাইরে চেয়ে সুনীল আবার সমাহিত হলো। সুলেখা কাজ সেরে বসে পড়লো চেয়ারে। আনন্দময়ী হাতে একটা বাণ্ডিল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সুলেখার দিকে চেয়ে বললেন, 'গোছানো হয়েচে না ভাই-বোনে গপ্পই চলচে?' জোরে বললে সুলেখা 'গোচানো হয়ে গ্যাচে।' সুনীল চমকে উঠলো। বাণ্ডিল খুলে একজোড়া কাপড় সুনীলের হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখ পচন্দ কি না, শান্তিপুরী জরির পাড়। এ বচর পুজোয় পরবি। (কালো পাড়ের শান্তিপুরী একজোড়া দিয়ে) ঠাকুরপোকে আমার নাম করে দিবি। কর্তা শুনে এসেচেন এ বচর পুজোয় তোর কলকাতা আসা হবে না, সামনে পরীক্ষা। একেবারে ফাইনাল শেষ করে মার্চ মাসে তোমার আসা, প্রায় এক বচর বাদ। দেখি যদি পারি তো আমরা একবার ঘুরে আসবো।' সুলেখা হেসে বললে, 'আমারও যে পরীক্ষা সেটা বুঝি মনে থাকে না?' আনন্দময়ী হেসে বললেন, 'ও মা তাই তো, তোরও তো পরীক্ষা! সুলেখা, কাপড়গুলো তুলে দে, কটা জিনিস হবে?' সুলেখা বললে, 'এখানে দুটো সুটকেশ।' আনন্দময়ী বললেন, 'নীচে একটা ঝুড়ি আর জলের জায়গা।'

'ঝুড়ি আবার কিসের?' সুনীল প্রশ্ন করলো।

'বেশী ভারী নয়, আমি ঠিকমত বেঁদেছেঁদে দেবো'খন। সিমলের সন্দেশ কড়াপাক আর সোনামুগ ডাল ঠাকুরপো ভালবাসে, সবে মিলে সের-দশ ওজন হতে পারে। তোরা নীচে চ আমি ভাত বাড়তে বলিগে।' আনন্দময়ী চলে গেলেন।

দুপুরে বাড়ি থেকে বেরোল সুনীল। ফটোগুলো আনা, সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করা,

বিদায় নেওয়া মাসীমার সঙ্গে ; দুটো কাজও করার আছে। সকাল থেকে মন বিয়োগান্ত নাটকের সমাপ্তি পর্বের জন্মে প্রস্তুত হয়ে চলেছে। এবারে পাটনায় ফেরার সঙ্গে অন্ত-বারের অনেক ফারাক। এ যেন চির বিদায়ের মত মুহূর্ত। আসা যাওয়া বন্ধ না করলে স্থলেখার মন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। ঘনিষ্ঠতার প্রীতি থেকে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়ে দুজনেরই বাসনার ব্যাপ্তি ঘটবে। মামণি দুঃখ পাবেন, স্থলেখার জীবন ব্যর্থ হতে পারে। স্নেহ-প্রীতি থাক প্রেমাসক্তি নয়, যেটা তার অসতর্ক মনে আশালতার মত গজিয়ে উঠছে এবারের অশুভ যাত্রায়। পাটনায় একাকিত্বে খুবই অভ্যস্ত সে। পরীক্ষার পড়া আর কল্পলোক নিয়ে ভোলার চেষ্টা করবে। স্থলেখাও পরীক্ষার চাপ নিয়ে কৈশোরশেষের চিত্ত-চাঞ্চল্য, চটুলতা মনে করে মানিয়ে নেবে। এছাড়া আর কোন মঙ্গলচিন্তা স্থনীলের আসছে না, আজই এর শেষ হয়ে যাক্, স্থনীল নিজেকে শাসন করে চলেছে, প্রস্তুত করে চলেছে।

হেদোর ধার দিয়ে হেঁটে ফটোর দোকানে এল। ছবি প্যাকেট রেডি করা আছে। বিল মিটিয়ে, ছবিগুলো দেখে নিয়ে, রাস্তায় নেমে, ট্রামে চেপে সে স্থপ্রকাশের বাড়ির দিকে চললো। প্যাকেট খুলে আবার ছবিগুলো দেখতে শুরু করলে, কখন ট্রাম হ্যারিসন রোড পেরিয়ে গেছে খেয়াল হয়নি। গোলদীঘির সামনে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল, পেছনেয় গলি আর বইয়ের দোকানগুলো পেরিয়ে পটলডাঙার দিকে স্থপ্রকাশের বাড়ীতে যখন পৌছল, বেলা প্রায় দুটো। স্থপ্রকাশের সঙ্গে দেখা হলো না, বেরিয়ে গেছে। মাসীমার সঙ্গে দেখা করে, সম্ভব হলে স্থপ্রকাশকে হাওড়ায় যেতে বলে স্থনীল ফিরল ট্রামে। হেদোর মোড়ে নেমে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট পেরিয়ে বিডন স্ট্রীটের ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবলটার ডানপাশ দিয়ে পূর্বদিকে বাড়ীর রাস্তা ধরলো। সাড়ে তিনটের মধ্যেই বাড়ী পৌছে, চটপট দোতলায় নিজের ঘরে বিছানায় বসে ছবিগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ ছবি রেখে যাবে বাছতে আরম্ভ করল। প্রত্যেক ছবি তিন কপি করে পেয়েছে। নিজের ছবি এখানে না রেখে যাওয়াই স্থির করেছে। যেগুলো আলাদা সরিয়ে রাখলে, তার সঙ্গে এক কপি স্থলেখার ছবি। বাকি ছবিগুলির মধ্যে এক কপি করে সে নেবে আর সব মামণির হাতে দিয়ে যাবে। স্থলেখা ঘরে ঢুকে বললে, 'কাজ সব সারা হলো ?'

'এই যে এসে গ্যাছে, প্যাকেটটা ছাখো।' স্থনীল বললে।

স্থলেখা আগ্রহের সঙ্গে ছবি দেখতে লাগল, ক্রমে তার মুখ ভারী হয়ে এলো, ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, 'কই তোমার ছবি তো দেখছি না, ওঠেনি নাকি ?'

অপ্রস্তুত হয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে স্থনীল বললে, 'ওগুলো আমি আলাদা রেখেছি।'

রাগের গলায় সুলেখা বললে, 'কেন ? দেখলে কি ক্ষয়ে যাবে মহাশয়ের ছবি ?'

'না-না তা নয়, এই যে দেখো।' বালিশের তলা থেকে প্যাকেটটা বার করে দিলে সুনীল। ছবিগুলো দেখতে দেখতে নিজের ছবিটা দেখে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললে, 'এটা কেন এখানে, ভুল হয়ে গ্যাচে বুঝি ?' সুনীলের মুখ লাল হয়ে উঠলো। সুলেখা সহজ সাবলীলভাবে মুচকি হেসে বললে, 'বেশ, আমার ছবির বদলে আমি একটা মহাশয়ের ছবি নিলুম।' সুনীলের একটি ছবি তুলে আঁচলের তলায় রাখল। ব্যাকুলভাবে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল সুনীল, 'আমার ছবি নিও না সুলেখা !' সুলেখা দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'নিশ্চয় নেবো, এই নিলুম।' ছবিটা বুকে ব্লাউজের ভিতর গোপন করলো। আর্তনাদের মত সুনীল বললে, 'মামণি, মামণি দেখলে দুঃখ পাবেন সুলেখা। তার চেয়ে মামণিকে দিয়ে যাব।'

'দিতে হয় আলাদা একটা দিয়ে যেও এটা পাবে না। আমার ছবি আর আমাকে আঁকা ছবি যদি দাও, এটা ফেরৎ দেব।' তার মুখের চেহারা দেখে সুনীল কিছু বলার সাহস পেল না।

সীসের মত ভারী মুহূর্তগুলি বয়ে চলেছে। সকাল থেকে এত প্রস্তুতি, মনের সঙ্গে এত বোঝাপড়া সব কি বিফলে যাবে ? বেশ খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর সুনীল বললে বেদনার্ত গলায়, 'শোন সুলেখা, মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো। আমাদের আশৈশব স্নেহ-প্রীতি থাক, এর পরিবর্তন ঠিক নয়। সাংসারিক মানে, বিচারে আমি তোমার যোগ্য নই। মামণিকে সজ্ঞানে আঘাত দিতে পারি কি, তুমিই বল না ?'

কান্নায় ভেঙে পড়া কণ্ঠে সুলেখা বললে, 'কে যোগ্য কে অযোগ্য, কিসে ভালমন্দ—সে কথা কে বলতে পারে ? আমরা নিজেদের এমন নিবিড়ভাবে জানি যে, বাইরের গুণাগুণ বিচার আমি মানি না। যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মনের মাপ হয় না সুনীল !' একটু থেমে আবার বললে; 'তুমি আমায় ভুলতে বলচো বলেই আমি ভুলতে পারবো সেকথা এখনই কি করে বলবো। তুমি যদি নিজে ভুলতে পারো, আমি তোমায় অপরাধী করবো না। কিন্তু কোনদিন সুনেদা হিসেবে ফিরে আসার দাবী করো না, তা আমি সইতে পারবো না। তোমার আমার বয়স প্রায় এক। কিন্তু ভুলে যেও না, ছেলে আর মেয়ের মধ্যে মানসিক পরিণতি এক হয় না, তোমার কাছে যেটা সহজ আমার কাছে তা দুরূহ হতে পারে।'

নীচের থেকে সুনীলের ডাক এলো কামিনী মারফৎ। সে ধীরে ধীরে নেমে গেল। খাবার ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে বসলো ছোট টেবিলের সামনে। আনন্দময়ী প্লেটে নিজের করা সিঙ্গাড়া নিমকি নামিয়ে দিলেন আর দুটো প্লেটে সন্দেশ আর কাটা ফল।

বললেন, 'রাত্রে ট্রেনে খাওয়ার জন্তে লুচি, শুকনো আলুমরিচ আর সন্দেশ কৌটতে দেওয়া হয়েচে, মনে করে খেয়ে নিও, জলের বোতলটা ফেলে যেও না ট্রেনে। এখানে বিশে যাচ্ছে ভাবনা নেই, পাটনায় ভুলে যেও না।' সুনীল খেতে খেতে আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাইতে লাগলো, তাঁর কপালে কোঁচ ঠোঁটের ভঙ্গি বিদায়ক্ষণে, সুনীলের পরিচিত। মনের কোণে মেঘ জমছে। আনন্দময়ী বললেন, 'সুলেখা, চা-টা করে দে।'

সুনীলের দিকে চেয়ে নিয়ে সুলেখা বললে, 'তুমিই করে দাও চা-টা, তোমার করা চা বেশী পছন্দ।' সুনীলের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো সুলেখার, মুখে মুচকি হাসি।

আনন্দময়ী বললেন, 'কি যে বলিস, চায়ের আবার পছন্দ-অপছন্দ!'

খাওয়া শেষ করে সুনীল হাত ধুয়ে এসে মুছছে, মণ্টু ছুটতে ছুটতে এলো। 'হেদোয় দেরী হয়ে গেল, সরি সুনেদা! সাঁতার মাস্টার দেরী করে দিলেন।' তাকে ধরে আদর করে সুনীল বললে, 'কই দেরী? ঠিক সময়ে ত এসেছ; এবারে পুজোর ছুটিতে পাটনায় এসো অনেক জিনিস দেখিয়ে দেবো, অনেক ছবি দেবো।'

'কি করে যাবো, একা যে যেতে পারি না তোমার মত।' ক্ষুন্ন স্বরে বললে মণ্টু।

'যাওয়া ঠিক হলে চিঠি দিও দারোয়ানকে পাঠিয়ে দেবো।' সুনীল বললে।

লাইব্রেরী ঘরে জেঠুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল সুনীল। তাকে দেখে ফণীবাবু বললেন, 'সুনীল মাস্টার, এই নাও তোমার টিকিট বার্থ রিজারভেশন স্লিপ। সঙ্গে স্টেশনে কে যাচ্ছে?'

'বিশু যাবে আর কারুর দরকার হবে না।'

'ঠিক কথা, একবছর পরে বিলেত যেতে হবে তোমার বাবা প্রায় ঠিক করে রেখেছে। একা একাই তো ঘুরতে হবে! শোন মাস্টার, গিয়ে আদাজল খেয়ে লেখাপড়ায় লেগে যাও। পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে, নয়তো সব ফসকে যাবে।' সুনীল হেসে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'আমি আসি জেঠুবাবু!'

'এসো বাবা।' তার মাথায় হাত দিলেন।

সুনীল বেরিয়ে সোজা দোতলায় গেল পোশাক বদলাতে। প্যাণ্ট সার্ট মোজা পরার পর জুতোর জন্তে বারান্দায় যাওয়ার মুখে সুলেখা এসে হাজির হলো। চট্ করে হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিতেই হতভম্ব হয়ে সে হাত দুটো চেপে ধরলে, বললে, 'আরে আরে কি করো, কি করো? আমাকে কবে আবার প্রণাম করেছ, এঁ্যা!'

'এমনি করলুম,' বলে ফিরে চলে গেল সুলেখা।

সুনীলের মনে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙলো। নীচে এসে আনন্দময়ীকে সামনে পেয়ে পায়ের ধুলো নিতে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

কপালে চুমু খেলেন, সুনীল আর সামলাতে পারলো না। আনন্দময়ীর কাঁধে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার মাথাটা তুলে ধরে আনন্দময়ী বললেন সান্ত্বনার স্বরে, 'ছি ছি বুড়ো ছেলে কাঁদে না, ভাই-বোনরা কি ভাববে ?' আঁচল দিয়ে সুনীলের চোখ মুখ মুছিয়ে বললেন, 'তুই একটু বোস চেয়ারে, আমি বিশুকে গাড়ী ডাকতে বলি।' তিনি চলে গেলেন, চোখে তাঁর টলটলে জল নিয়ে আড়ালে। সুলেখা মুখে আঁচল চেপে সুনীলের দিকে চেয়ে রইলো। মণ্টু এসে সুনীলের পাশে দাঁড়াতে সুনীল সামলে নিয়ে মণ্টুর হাত ধরে বাইরের দিকে এগোল। বিশু গাড়ী গেটে দাঁড করিয়ে ভেতরে মালপত্তর নিতে এলো। বামুন ঠাকুর খাবারের পুঁটলি, জল নিয়ে, কামিনী ঝুড়ি নিয়ে, বিশু দুটো সুটকেশ নিয়ে এসে সব গোছগাছ করে ওঠালো গাড়ীতে। বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন ফণীবাবু, আনন্দময়ী, সুলেখা, মণ্টু। ঠাকুর, ঝি, সকলের হাতে পাঁচ টাকা করে দিয়ে সুনীল শেষ-বারের মত বারান্দার দিকে চাইল বিদায় নিতে। সকলে হাত তুললো, আনন্দময়ী ওপর দিকে হাত তুলে নমস্কার করে সুনীলের দিকে চেয়ে হাত ওঠালেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। বিশু কোচোয়ানের পাশে উঠে বসলো। সুনীল গাড়ীতে উঠলো, গাড়ী চলতে শুরু করলো। জানালা দিয়ে বারান্দার দিকে চাইলো। মামণি, সুলেখা, মণ্টু তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। বিডন স্ট্রীট ধরে যে পথ দিয়ে এসেছিল একমাস আগে, সেই পথেই ফিরতে হবে হাওড়া স্টেশনে। এর আগেও বহুবার সে আসা-যাওয়া করছে কিন্তু এবারের সঙ্গে কোন মিল নেই। মনের মধ্যে এখন শূন্যতা, সর্বস্বান্ত নিঃস্ব অনুভূতি হয়নি। সবই আছে কিন্তু কিছু নেই। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের তালে বাঁধা শব্দ কানে আসছে না। গ্যাসের আলো, চাঁদের আলোর মত আলোকিত পথ, কোন কিছুই সুনীলের চেতনায় নেই। এবারের কলকাতা যাত্রায় মনের পরিণতি সরল আর নেই। যে অচিন্ত্য বোধিকা, যে আত্মদর্শন ঘটে গেল তা ভোলা যাচ্ছে না। সুলেখার অভিমান ভরা কথাগুলোর মধ্যে পেয়েছে অনুরাগিণীর ক্ষুব্ধ অভিযোগ, 'সুনেদা হয়ে কোনদিন যেন ফিরে এসো না, সইতে পারবো না।' বারেবারে এই কথাগুলি কানে বাজছে। কত অপরিচিত হয়ে উঠলো সুলেখা। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখমুখ মুছতে লাগলো, গাড়ী হাওড়া ব্রিজে উঠে পড়েছে। সুনীল প্রস্তুত হয়ে বসলো। ব্রিজের ওপর মাঝে মাঝে ফোর্ড, শেভ্রলে, প্রাইভেট মোটর সোঁ সোঁ করে চলে-যাচ্ছে গাড়ীকে পেছনে ফেলে। গাড়ী ধীরে ধীরে স্টেশনের গাড়ীবারান্দার তলায় দাঁড়ালো। ঝকঝকে আলোয় ভরা চারিদিক। কুলীদের তাড়াহুড়ো লেগে গেল কে কোন গাড়ীর মাল নেবে। বিশু চাল থেকে নেমে পড়লো, গাড়োয়ান দরজা খুলে দাঁড়ালো, সুনীল গাড়ী থেকে নামলো, চারিদিকে চাইলো। গাড়ী ভাড়া একটাকা মিটিয়ে চার আনা বাড়তি দিতে গাড়োয়ান

খুশী হয়ে কপালে হাত ঠেকালো। বিশু মালপত্তর কুলীর মাথায় দিয়ে খাবার ও জলের বোতল নিজের হাতে নিলো। সুনীল সামনের দিকে চাইল, নজরে পড়ল সুপ্রকাশ দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি দুই বন্ধু এগিয়ে গেল। সুনীল হেসে বললে, 'কতক্ষণ ?'

'এই একটু ক্ষণ।'

তারা এগোতে লাগলো ভেতর দিকে। সাদা প্যান্ট আর কালো কোটের ওপর সোনার মত চকচকে পেতলের তক্‌মা আঁটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর দিশি স্টেশন কর্মচারীরা চারিদিকে ঘুরছে। এই সময়টার আবার বিশেষ মর্যাদা, পাঞ্জাব মেল ছাড়ার সময়। বড় বড় অফিসার দিল্লী যায়। সাহেব মেম ছেলে মেয়ে নিয়ে সিমলা পাহাড়ের নানাদিকে যাত্রীর ভিড়। অ্যাংলো টিকিট চেকার, মেমেরা লেডিস্‌দের তদ্বির করার কাজে ব্যস্ত। প্ল্যাটফর্মের মেইন গেটের সামনে অ্যাংলো চেকারের হাতে টিকিট ইত্যাদি এগিয়ে দিল। তিনি ভুরু কুঁচকে মালপত্তর দেখে, টিকিট ইত্যাদি ফেরৎ দিয়ে ভেতরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। সুনীলের নজর এলো, একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক তাকে আর সুপ্রকাশকে খুঁটিয়ে চোরা চাউনিতে বারেবারে দেখছে। সুনীল ভাবলো কি কারণ ? সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ট্রেনের দিকে রিজার্ভেসান সিট খুঁজতে। ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিন পেরিয়ে বেশিদূর যেতে হলো না। আপার ক্লাশ বগি সব সময় পেছনের দিকেই থাকে। বগিগুলো যেন এখুনি কারখানা থেকে বেরিয়েছে। পাঞ্জাব মেল বলে কথা, যত্নের কোন ত্রুটি থাকলে চাকরি নিয়ে টানাটানি। সুপ্রকাশ একটা বগির দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলো। সুনীল উঠে সামনেই লোয়ার বার্থ-এর গায়ে তার নাম নম্বর দেখে বসে পড়লো। বিশু ও কুলী জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখলো। সুনীল জানালার দিকে চাইতেই চোখে পড়লো সেই লোকটা। সে সুপ্রকাশের দিকে হেসে বললে দেখ, ওই লোকটা সেই থেকে আমাদের লক্ষ্য করছে, এখানেও এসে ওই সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কি ব্যাপার বল্‌ তো ?' সুপ্রকাশ চট্‌ করে দেখে নিয়ে বললে, 'টিকটিকি হবে।' হেসে সুনীল বললে, 'সে আবার কি ?' সুপ্রকাশ বললে, 'বুঝতে পারলি না ? তুই একেবারে গোলা হয়ে রইলি ! আমাদের বয়সের দুজন বাঙালী মধ্যবিত্ত ছোঁড়া পুলিশের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় আজকাল, তাই পেছনে ফেউ। তুই কবে সাবালক হবি ?' সুনীল হেসে বললে, 'ও বোমা-টোমার ব্যাপার ভাবছে ? তুই কলকাতায় থেকে অনেক চালাক হয়ে গেছিস।' এই সময় একজন ভদ্রলোক হাতে স্যুটকেশ নিয়ে উঠলেন, তাঁর সিট দেখে ওদের দুজনের দিকে চাইলেন। সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোথায় যাবেন ?' 'পাটনা।' 'তোমরা ?' 'আমি যাবো না, আমার বন্ধু যাচ্ছে পাটনা।' 'পাটনা কোথায় ?'

স্থনীল পাড়া ও বাবার নাম বললে, 'তুমি মিস্টার মুখার্জির ছেলে, বা বেশ।' স্থপ্রকাশ বললে, 'ভালই হলো আপনিও যাচ্ছেন।' স্থনীল স্থপ্রকাশের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। স্থপ্রকাশ বললে, 'আমায় নেমে যেতে হবে। গার্ডসাহেবের বাঁশী শুনে লোক ঘড়ি মেলায়।' 'যা বলেছিস, কি পোশাক বেল্ট ক্রশবেল্ট টকটকে লাল রঙ মেজাজ পঞ্চমজর্জ; আমার ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল পাঞ্জাব মেলের গার্ড হবো।' সময় হয়ে গেছে, আলিঙ্গন করে বিদায় নিলে স্থপ্রকাশ। ট্রেন ধীরে ধীরে গতি নিল।

॥ ১৩ ॥

ফণীবাবুর বাড়ী, স্থনীলের চলে যাওয়ার পর নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। ফণীবাবু লাইব্রেরী ঘরে বই নিয়ে বসে পড়ছেন নিয়মমাফিক। কাল কলেজ আছে, তাঁর দুটো ক্লাশ নিতে হবে। আনন্দময়ী ঠাকুরকে ভাঁড়ার বার করে দিয়ে নিজের ঘরে খাটে শুয়ে। স্থলেখা তার ঘরে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ হাতে নিয়ে মন দেবার চেষ্টায়। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে হেলান দিচ্ছে চেয়ারে। থমথমে মুখ, কপালে কোঁচ পড়া। মণ্টু মাস্টারের কাছে পড়ছে বাইরের ঘরে। কামিনী ঝিমুচ্ছে বারান্দায়। বিশু এখনও ফেরেনি হাওড়া থেকে।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। তারপর কড়ানাড়ার শব্দ হলো সদর দরজায়। কামিনী গিয়ে দরজা খুলে দিতে বিশু ঢুকলো হাওড়া ফেরৎ। আনন্দময়ী উঠে এসেছেন বারান্দায়। তাঁকে দেখে বিশু বললে, 'দাদাবাবু ট্রেনে একজন লোক পেয়ে গ্যাছেন, পাটনার চেনা। দাদাবাবুর বন্ধু স্থপ্রকাশবাবুও উঠিয়ে দিতে এসেছিলেন।'

নিশ্চিন্ত স্বরে আনন্দময়ী বললেন, 'ভাল। তুই যা, হাত-পা ধুয়ে একটু বস, পরে খাবার জায়গা করে দিবি।' ঘরে চলে গেলেন।

ঘড়িতে যখন ন'টা বাজলো, ঠাকুর ও কামিনী বারান্দায় এলো আনন্দময়ীর আহ্বানের প্রত্যাশায়। মায়ের সাড়া-শব্দ না পেয়ে স্থলেখা এসে বললে, 'মা কই? মণ্টুকে ডেকে আনো, খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করো, আমি আসছি।' মায়ের ঘরে ঢুকে স্থলেখা দেখলে আনন্দময়ী বালিশে মুখ চেপে শুয়ে আছেন; কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে 'মা, শুয়ে আছ যে। শরীর খারাপ লাগছে?"

আনন্দময়ী পাশ ফিরে বললেন, 'তোরা সব খেয়ে নে নিজেরা দেখেশুনে। আমি কিছু খাব না, শরীরটা ভাল লাগচে না।' স্থলেখা চলে গেল খাবার ঘরের দিকে। আসন পাতা হয়েছে। কামিনী বাবুকে মণ্টুকে ডাকতে গেল; স্থলেখা দাঁড়িয়ে রইল অপেক্ষায়। ফণীবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'মা কোথায়, তাঁকে তো দেখছি না?'

সুলেখা বললে, 'মা শুয়ে আচে—শরীরটা ভাল নেই বলচে।'

'ও বুঝেচি, বড় বেটা প্রবলেম! তোমরা ভাই-বোন আজ মায়ের কাছে শোবে, কেমন?'

'তুমি?' বললে সুলেখা।

'আমি লাইব্রেরীতেই শোব।' সুলেখা মাথা নাড়লো, সবাই খেতে বসে গেল। খাওয়া শেষে সবাই উঠে যাওয়ার পর কামিনী এক গেলাস দুধ আর দুটো সন্দেশ সুলেখার হাতে দিয়ে বললে, 'মায়ের জন্যে নিয়ে যাও।' সুলেখা দুহাতে নিয়ে মায়ের ঘরের দিকে এগোল। মায়ের কাছে গিয়ে বললে, 'দুধটা খেয়ে নাও মা।'

আনন্দময়ী উঠে গেলাস নিয়ে খেতে যাবেন, সুলেখা বললে, 'খালি পেটে দুধ খেও না, সন্দেশ দুটো খেয়ে নাও।'

আনন্দময়ী একটু হেসে বললেন, 'বড় পাজি তোরা।'

সুলেখা বললে, 'বাবা বলে গেলেন, আমাকে মণ্টুকে তোমার কাছে শুতে।'

'আর তিনি কোথায় শোবেন?'

'লাইব্রেরীতে।'

'তবে আর কি, সারারাত চলবে।' কামিনী জল গামছা নিয়ে এলো। আনন্দময়ী হাত-মুখ ধুয়ে মুছে আবার শুয়ে পড়লেন। মণ্টু এসে মায়ের পাশে মাকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সুলেখা সব দরজা দেখে সারাবাড়ি ঘুরে মার ঘরে ঢুকে, খিল দিয়ে নিয়ে মায়ের পিঠে হাত রেখে শুয়ে পড়লো।

* * *

পাটনায় পৌঁছে সহযাত্রী ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে, কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এলো টাঙ্গা গাড়ীর সারিতে। চেনা টাঙ্গাওয়ালা সেলাম করে সামনে দাঁড়ালো। তাকে মাল তোলার ইঙ্গিত করে, কুলীদের পয়সা মিটিয়ে সুনীল গাড়ীতে উঠে বসল। এখানের গাড়ী অন্য রকম, আধা ফিটন, কলকাতায় সঙ্গে মিল নেহ অত জায়গাও নেই। সাবধানে বসতে হয়, উল্টোদিকে মুখ করে। টাঙ্গার চলন অবশ্য দ্রুতগতি। মোটরে গেলে বরাতে লাল ধুলো। মোটর অবশ্য যায়ই না প্রায়। বাড়ী পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। গেটে গাড়ী দাঁড়াতেই দারোয়ান, বাগানে কাজের দুজন চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদাবাবু আ গইল!' তার নিজের লোক রামুদা ছুটে বেরিয়ে এলো হাসিমুখে। এরা যেন ফেটে পড়বে।

সুনীলের যাবার সময় সব যেমন মুখ ভার, ফিরে এলে তেমনি হাসি মুখ। দীর্ঘদিনের বাবার সব পুষ্যিপুত্তুর। সাহেবি কায়দায় চারিদিক ঘেরা বাগানওয়ালা বাংলো

বাড়ী। ফলের গাছ, ফুলের গাছ, মোরাম দেওয়া লাল রাস্তা, সবুজ লন, সব রাজকীয় ব্যাপার। পশ্চিমদিকে লম্বা ব্যারাকের মত। কাজের লোকদের থাকার জায়গা, ঘর বারান্দা, অনেকে সপরিবারে বাস করে। দুটো বড় ইঁদারা, একটি জলচলদের জন্যে, একটি জল-অচলদের। জলচল-অচল নিয়ে এদেশে খুব বাড়াবাড়ি এখনও। এই হাতার মধ্যে যেন একটা বিরাট পরিবার গড়ে উঠেছে শচীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতির কল্যাণে। বন্ধুদের সমালোচনার উত্তরে শচীনবাবু বলেন, এটা আমার একটা সখ ধরে নিন না। লোকে নেশা ভাঙ করে, আমার না হয় এটাই বদ-অভ্যাস। বাবার বন্ধুদের কথা স্নীলের কানে এসেছে। শচীনবাবু যদি ইচ্ছা করতেন, অন্য উকিলবাবুদের মত লাখ লাখ টাকা জমাতে পারতেন, তাঁর রোজগার কারুর চেয়ে কম নয়। গরীব মক্কেল, হাতজোড় করে কাঁদা-কাটা করলেই ফিস্ মাপ, এমনটি দেখা যায় না।

স্নীল বাবার অফিসঘরে গেল। তাকে দেখে শচীনবাবু উঠে এলেন, তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে স্নীল দাঁড়ালো। শচীনবাবু তার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে নিয়ে বললেন চিন্তিত ভাবে, 'অন্যবারে কলকাতা থেকে এলে হাওয়া বদলের লক্ষণ দেখি, এবারে খারাপ মনে হচ্ছে। শরীর খারাপ হয়েছিল ?'

'তেমন কিছু নয় একটু জর একদিনের, ভালই আছি।'

'যাও, হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম করগে, রামু জানে তুমি এসেছো ?'

'হ্যাঁ, আমার জিনিসপত্তর তুলতে গেছে বাবা! মামণি তোমার জন্যে সোনামুগের ডাল আর সন্দেশ পাঠিয়েছেন।'

'আচ্ছা' হেসে বললেন শচীনবাবু, 'কেমন আছেন সব ?'

'ভালই।' স্নীল নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

রামু ঘরদোর ঝাড়াঝাড়ি, বিছানার চাদর বালিশ পাতা প্রায় শেষ করে এনেছে। তাকে দেখে বললে, 'যাও দাদাভাই, বাথরুমে সব দেওয়া আছে। ট্রেনের জামা-টামা মেজেতে ফেলে রাখো, ধোবা এসে নিয়ে যাবে খবর দিয়েছি।' রামু এদেশী লোক, কিন্তু সাত বছর বয়স থেকে এ বাড়ীতে স্নীলের মার কাছে কাজ শুরু করেছে টুক্‌টাক্। তিনি ওকে বাংলা হিন্দি লেখাপড়াও একটু একটু শিখিয়েছেন। এতদিন বাঙালী বাড়ীতে থেকে বাংলা বলা, চালচলন দেখলে বাঙালী ছাড়া কেউ ওকে বিহারী বলতে পারবে না। এই পরিবারের সঙ্গে ওর নাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ছোট থেকে স্নীলের দেখাশুনা সবকিছু ওর দায়িত্ব। এ বাড়ীর সব লোকজন ওকে বাবুদের মতই ভয় সম্মান করে। ওর কড়া দৃষ্টি সকল কাজে। প্রয়োজনে স্নীলকেও ধমক দিতে কসুর করে না। ভালও বাসে ছেলের মত। ঝি চাকর ধোবা নাপিত ঠাকুর

দরোয়ান সকলের সঙ্গে ব্যবহার ভাল রেখে কাজ করিয়ে নেয়। শচীনবাবু তাই এত লোক নিয়েও নিশ্চিন্ত রামুর ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে; তার ওপর মায়াও পড়ে গেছে। রামুর বিয়ে দিয়েছেন, ওদের গ্রামে চাষের জমি করে দিয়েছেন। ওর পরিবারের ছেলে মেয়ে কখন এখানে থাকে, চাষের সময় গ্রামে থাকে। রামুর একদিনও ছুটি নেই বার মাস; শচীনবাবু তাই ওকেও সংসারের একজন মনে করেন। ওর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন। ও না থাকলে আনন্দময়ীর কাছ থেকে সুনীলকে পাটনায় আনতে পারতেন না সাহস করে। মামণির আদরে মানুষ সুনীল কোনদিনই কিছু করে নেওয়ার তালিম পায়নি। এখানে এসে রামুদা ভরসা। সুনীলের চেয়ে রামু দশ বার বছরের বড়। বাথরুমের দরজায় রামু চেঁচালো, 'এখন স্নান করো না দাদাভাই, কতদিন তেলমালিশ হয়নি। যা চেহারা হয়েছে, একটু বেলায় তেলমালিশ করে স্নান করিয়ে দেবো।'

সুনীল ভেতর থেকে 'আচ্ছা' বলে, প্রাতঃকৃত্য সেরে যখন বেরোল, রামু জলখাবারের জায়গা করায় ব্যস্ত। আসন পেতে মেঝে মুছে, গেলাস ঢাকা জল রেখে, ঠাকুরকে তাগাদা দিতে গেল। এখানে খাওয়া ছোঁয়ার ব্যাপারে সাবেকী আইন মেনে চলতে হয়। টেবিল চেয়ারে বসে খাওয়া চলে না, ঠাকুররা চাকররা ঝুঠা বস্তুটি খুবই মেনে চলে।

বামুনবাড়ীর হালচাল সংস্কার শচীনবাবু না মানলেও লোকজনের খাতিরে মেনে চলেন। সুনীল এসে আসনে বসলো। ঠাকুর গরম পুরী লালচে রঙের বড় বড়, চার-খানাতেই থালা ভর্তি আর ভাজি দিয়ে গেল। দ্বিতীয়বারে রেকাবীতে পটল ভাজা ও আমের চাট্নী দিয়ে গেল। সুনীল থালার চারিদিকে জল ছিটিয়ে খাওয়া শুরু করলে। রামু লাড্ডু আখের গুড় আর দুধের বাটি এনে রাখলো। সন্দেশের হাঁড়িটাও এনে রাখলো। সুনীল হেসে বললে, 'মেঠাই, গুড় আবার সন্দেশ রামুদা, তুমি আমায় রাক্ষস পেয়েছো নাকি?'

'খাও না যা পারো!'

'তুমি আমায় একটা সন্দেশ দাও আর সব সরিয়ে নাও।' সন্দেশ খেতে খেতে সুনীল বললে, 'রামুদা, তোমার জন্যে সন্দেশ নাও।'

'হবে হবে!'

'হবে হবে নয়, এখুনি আমার সামনে খেতে হবে, আমি হাত ধুয়ে আসি।' সুনীল উঠে গেল। হাত ধুয়ে এসে চারটে সন্দেশ রামুর হাতে দিয়ে বললে, 'খাও।'

'আমি এখন খাবো না, ঘরে গিয়ে খাবো দাদাভাই।'

'ও হো, ভুল হয়ে গেছে, (আরো চারটে সন্দেশ তার হাতে দিয়ে) যাও আগে ঘরে খেয়ে এসো, আমার এখন কিছু দরকার নেই। বিশ্রাম করব।' রামু বেরিয়ে

গেল, সুনীল ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর কলকাতায় চিঠি দেওয়ার জন্যে টেবিলে গিয়ে বসল। পৌঁছোনোর খবর না পেলে মামণি ছটফট করবেন। দুপুরে ফেলে দিলে ঠিকমত চলে যাবে। ড্রয়ার থেকে কাগজ খাম বের করে লিখতে লাগল। মনটাকে কলকাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিল। আবার ভেসে উঠছে সুলেখার মুখ। অস্বস্তি, এবারের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। প্রীতির পরিণতি অনুরাগে! কৈশোরের অনুভূতি, মামণি, সুলেখার আনন্দময় সান্নিধ্য কোথায় উবে গেল অজ্ঞেয় বেদনার অস্থিরতায়। আজ চিঠিতে শুধু নিরাপদে পৌঁছনোর সংবাদ দিয়ে পত্র শেষ করে দিল। রামুদা আসতে বললে, 'চিঠিটা ফেলে দিও, আর আমার সাইকেলটা মোছামুছি করে রেখো, বিকেলে বেরোব।' 'সাইকেল পরিষ্কারই আছে বলে রামু চলে গেল চিঠি নিয়ে।'

* * *

দুপুরে খাবার ঘরে শচীনবাবু আর সুনীল পাশাপাশি খেতে বসেছে। আজ রবিবার, একটু বেলায় শচীনবাবু খান। ছুটির দিনে তাঁর অভ্যাস। সুনীলের দিকে চেয়ে বললেন, 'সুনীল, তোমাদের স্কুলের মোহিতবাবুকে ঠিক করেছি তোমাকে পড়ানোর জন্যে; কাল থেকে আসবেন। ভাল করে প্রস্তুত না হলে পরীক্ষায় ভাল হবে না। ভাল করে পড়াশুনা আরম্ভ করো; আর লিলি আন্টির কাছে একটু একটু ফরাসী ভাষা শেখার চেষ্টা করো। 'পারী' যাও যদি, সুবিধা হবে। মিস্ লিলি পারীতে আর্টস্কুলে তোমার ভর্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, মন দিয়ে প্রস্তুত হও।'

সুনীল খুশী মনে মাথা নাড়লো। খাওয়ার শেষে দুজনেই উঠে গেল।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সুনীল ঘুমিয়ে পড়েছিল। রামু ডাকে, 'দাদাভাই, চা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

চোখ খুলে দেখে পশ্চিমে সূর্য চলে গেছে। 'রামুদা, সাইকেল বের করে রাখো, আমি চা খেয়েই বেরোব। দেরি হয়ে গেছে।'

সাইকেলে চেপে সোজা গিয়ে মিউজিয়মের গেটে ঢুকলো। দারোয়ান সেলাম দিতে জিজ্ঞেস করলে, 'লিলি মেমসাব?'

'আভি বাহার গই সাব।'

হাতে স্কেচ খাতা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। এখানে এলেই তার মনে ইতিহাসের নানা কথা মনে পড়ে যায়। সেসব ভাবতে ভালই লাগে। পাটলিপুত্র নিয়ে সে পড়েছে, হাতের কাছে যা পেয়েছে। তার অবাক লাগে খ্রীঃপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার থেকেই পাটলিপুত্রের গৌরব অধ্যায়ের শুরু। সেই থেকে মানে, অজাতশত্রু থেকে আলেকজান্দার পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে উন্নতি হয়েছিল। মগধের রাজা অজাতশত্রুর পাটলি গ্রামে

প্রতিষ্ঠিত নগর ; আর্য ভারতের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নগরী বলা চলে। অজাতশত্রু যুদ্ধজয় ও বিবাহসূত্রে, কোশল ও লিচ্ছবি রাজাদের কন্যার পাণিগ্রহণের সুবাদে, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে দিল। পাটলিগ্রামে দুর্গ বানালেন শক্ত রকমের, নগর গড়লেন কাঠের গুঁড়ি দিয়ে, উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা করলেন। এটাই পাটলিপুত্রের জন্মলগ্ন।

এ নগর প্রথম দিকে নানা নামে পরিচিত : কুসুমপুর, পুষ্পপুর, পাটলিপুত্র। এটি প্রথম মগধের রাজধানী ছিল, পরে মৌর্য আমলে সারা ভারতের রাজধানী। দেশী বিদেশী বহু পণ্ডিত এই সুশোভিত নগরী প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ, রাস্তাঘাট, উচ্চ মানের নাগরিক চৌষট্টি কলাবিদ্যায় সুশিক্ষিতা বারবণিতা, নটনটি দেখে, গণিকাদের মধ্যে উচ্চমানের কাব্যসৃষ্টির নমুনা লক্ষ্য করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন তাঁদের লেখা-পুঁথিতে।

সুনীলের আশ্চর্য লাগে, এখন প্রাচীন সভ্যতার কোন ধারাই আর চোখে পড়ে না। শুধু আধুনিককালে পাটলিপুত্র, নালন্দা, পাটনার উপকণ্ঠে বুলন্দীবাগ, কুমরাহার ইত্যাদি জায়গায় ধ্বংসাবশেষের থেকে পাওয়া সেই প্রাচীন সৃজনশক্তির কিছু নমুনাই শুধু মিলেছে। আর কিছু কাহিনী গ্রীক, চীনা, দেশী কিছু পুঁথির পাতায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, পাথরের প্রাসাদগুলি দেখে বলেছে, এসব মানুষের তৈরি নয়, দানবের তৈরি। ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'হুণ' ও অন্যান্য দস্যুদল এই নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়, লুটপাট করে। আবার পালযুগে ধর্মপাল, পাটলিপুত্রের লুপ্ত গৌরব সামান্য পুনরুদ্ধার করেন। আধুনিক পাটনার ওপর ছোট সহর গড়ে ওঠে শের শাহের আমলে। কিন্তু সেই প্রাচীন কীর্তি আত্মকলহে, বিদেশী আক্রমণে আর গঙ্গার জলের তলায়, মাটির তলায়। জগৎপ্রসিদ্ধ নগরী লুপ্ত হয়েছে, নমুনা শুধু আধুনিক চেষ্টায় যা পাওয়া যাচ্ছে, সেইসব দেবীমূর্তি, নর্তকীমূর্তি, সহচরী সখিদের মূর্তি, অপরূপ সব ভাস্কর্য ভগ্ন প্রাসাদের টুকরো যেগুলি সংগ্রহ করা আছে পাটনা মিউজিয়মে, সুনীলের সেসব একবার দেখলেই সাধ মেটে না, বারেবারে দেখার ইচ্ছা ও সাধ্যমত স্কেচ করার ইচ্ছা থেকেই যায়। আধুনিক পাটনা সহরে এতসব সভ্যতার মিলনক্ষেত্র, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ধারায় মিলন মহিমা সে খুঁজে পায় না। সুপ্রাচীন জাতির বিলুপ্তির এমন উদাহরণ কোথায় আছে বিহারে ছাড়া কে জানে!

ভেতরে সুনীল তন্ময় হয়ে যায় সাজানো মূর্তিগুলির সামনে। পরিচারিকার দেহ-সৌষ্ঠব, নকশা, ঘরোয়া দৃশ্য, নর-নারীর মিথুনভঙ্গি, সেকালের শিল্পীমনের জীবন-চেতনার সাক্ষী সব অমূল্য নমুনা।

সুনীলের হাত চলতে থাকে। কতক্ষণ কেটে গেল খেয়াল নেই, দারোয়ান এসে বললে, 'বাবুজী, বন্‌ধ হো যায়গা গেট!'

'ঠিক হ্যায়!' বলে সুনীল স্কেচের খাতা মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে এসে সাইকেল ঠেলে চারিদিক দেখতে দেখতে মেন গেট পেরিয়ে বাড়ীর পথ ধরে। যেতে যেতে মনে প্রশ্ন এলো, আজ নারীমূর্তির দেহসৌষ্ঠব, মিথুনভঙ্গির ব্যঞ্জনা তাকে যেন বেশী করে আকর্ষণ করলো।

॥ ১৪ ॥

ফণী বসুর বাড়ীর সামনের রাস্তা প্রায় নিঝুম হয়ে গেছে। শরৎকালের হাওয়ায় শীতের আমেজ লেগেছে। বাড়ীর সামনে শিউলিগাছের তলায় ঝরা ফুল, হাওয়ায় ভাসা মৃদু গন্ধ, শারদীয়া উৎসবের আগমনী পর্ব মনে করিয়ে দেয়। যদিও এবারের পূজা আশ্বিন পেরিয়ে হেমন্তের দোরগোড়ায়। কলকাতার আবহাওয়ায় দুর্গাপূজার বিজয়া না পেরোলে শরতের ছুটি নেই। বাঙালী মন বিদায় দিতে নারাজ। আনন্দময়ীর ব্রাহ্ম মনও এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর কর্মপ্রণালী অত্যন্ত নিয়মবদ্ধ।

এবারে সুনীল আসছে না সেইজন্যে মনে কিছু খচখচানি রয়েছে, ঘর-বাড়ী ঝাড়া-পোছা, সকলের পুজোয় কেনাকাটা সেরে ফেলেছেন। কর্তার একটা আইন মানতেই হয় কেনাকাটায়। গত পয়েলা মার্চ ১৯২৮ সালের বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের পর থেকে। কেনার সময় বাছাই করতে হয় দেশী-বিদেশী, নয়তো সুযোগ পেলে দোকান-দাররা ছাড়ে না।

কর্তা খদ্দর ছাড়া ব্যবহার করেন না, এবারে নিজেরও খদ্দরের শাড়ী কিনেছেন অভয়আশ্রমে সুলেখার জন্যে গরদের শাড়ী। মণ্টুর দিশী মিলের জিন হাফ প্যাণ্টের, টুইল ছিট, সার্টের জন্যে, ডারবি জুতো, মোজা গেঞ্জী। দর্জি এসে মাপও নিয়ে গেছে, আজে কালে দেবে।

রাত্রে খেতে বসেছেন ফণীবাবু, মণ্টু ও সুলেখা। আনন্দময়ী সামনে পিঁড়েতে বসে তদারকি করছেন। রাত্রে রুটি কিম্বা পরটা লুচি খাওয়ার রীতি কলকাতায় বেশীর ভাগ বাড়ীতে বিশেষ করে একটু ঠাণ্ডা পড়লেই। কর্তার সঙ্গে সাংসারিক কথা বলা এই সময়ই প্রশস্ত। আনন্দময়ী ফণীবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'পাটনার অনেকদিন চিঠি আসেনি, সুনেটা চিঠি লেখার ধার ধারে না, শচীন ঠাকুরপোর চিঠি পাওনি তুমি?'

চমকে উঠে ফণীবাবু বললেন, 'ওহো ভুলে গিয়েছিলুম আনন্দ, শচীন একটা লম্বা

চিঠি দিয়েছে, ভালই আছে সব। শচীনের আগের থেকেই কতকি ভাবার অভ্যাস আর গেল না! পাগল একটা!'

আনন্দময়ী ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, 'দেখ তো, আমি ভেবে মরি, ওঁর খেয়াল থাকে না।' খাওয়ার পর সকলে উঠে পড়লো। আনন্দময়ী বললেন, 'সুলেখা, বাবার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে আসবি আমার ঘরে, আমি খাওয়া সেরে আসছি।'

লাইব্রেরীঘরে সুলেখাকে দেখে ফণীবাবু বললেন, 'ওই ড্রয়ারের সামনেই আছে চিঠিটা, নিয়ে যা।' সুলেখা ড্রয়ারের চিঠিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা চাপা অভিমান। সুনীলের দু'লাইন একটু চিঠি দিতেও এত কুঁড়েমি! শচীন-কাকুর চিঠিটা বিছানায় ফেলে রেখে, খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে বসে রইল। আনন্দময়ী ঘরে ঢুকতে ওঠবার জন্যে গা-নাড়া দিতেই আনন্দময়ী বললেন, 'চিঠিটা তুই পড়, আমি একটু শুই।' পা মুছে আনন্দময়ী খাটে উঠলেন, জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সুলেখা খাম থেকে চিঠি বার করে পড়তে শুরু করলো। 'প্রিয় ফণীদা, আশা করি সকলে ভাল আছ। আমাদের এখানের খবর মোটামুটি ভালই। তোমাকে একটু বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আমার কাগজপত্তরগুলি সম্বন্ধে এটর্নী অফিস থেকে এখনও কোন খবর পাই নাই। আমার উইলটির বয়ান ঠিক আছে কিনা জানাইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সুনীলের বিদেশে খরচা বাবদ কি কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, কি ভাবে টাকা পাঠাইতে হইবে ইত্যাদি বিষয় সঠিক জানা দরকার মনে করিতেছি। জানি তুমি এ সম্বন্ধে খুব উৎসাহী নও, তবু এটি আমার একান্ত ইচ্ছা জানিও। তুমি জানো যে সুনীলকে স্বনির্ভর করিতে হইলে, তাহাকে আমাদের আওতা হইতে কিছুদিন একদম দূরে রাখা প্রয়োজন মনে করি। একদম নিজস্ব ভরসার উপর নির্ভরশীল না করিলে সংসার সম্বন্ধে, দুনিয়া সম্বন্ধে তাহার চেতনা হইবে না। ভবিষ্যৎ জীবনে পরনির্ভরতা সমূহ ক্ষতিসাধন করিবে আমার বিশ্বাস। আমি জানি ইহাতে বৌঠান মানসিক কষ্ট পাইবেন, কিন্তু সুনীলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় এ কষ্ট আমাদের ভোগ করিতেই হইবে। বাল্য হইতে সুনীলের গুণাগুণ লক্ষ্য করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাকে আত্মনির্ভর করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট বয়স। পরে আর পরিবর্তন অসম্ভব হইবে। সুনীল সর্বতোভাবে আজীবন বৌঠানেরই থাকিবে আমার বাসনা তুমি তো জানো। সাময়িকভাবে আমার এই ইচ্ছাকে ক্ষমা করিতে বলিও। ঠাকুরের কৃপায় সুনীল ভাল আশ্রয় পাইয়াছে। মিস্ লিলি আমাকে কথা দিয়েছেন, তাঁরই কাছে তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্যারীর উপকণ্ঠে তাঁহার কটেজে থাকিয়া অঙ্কন-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিবে। কোন কিছু বেচাল দেখিলে আমায় খবর দিবেন। মিস্ লিলি আমার বহুদিনের সৎ ক্যাথলিক মহিলা হিসাবে পরিচিতা, সুনীলের মাতৃতুল্য

স্নেহশীল', বহুদিন পাটনায় বাস করিতেছেন এখন দেশে ফিরিবেন ; সুনীল তাঁহার সহিত যাইবে কাজেই আমাদের ভাবনার অনেক লাঘব হইবে। এই সুযোগ দুর্লভ। একটা সুখবর দিতেছি। সুনীলের এবারে কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর কিছু মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি, বয়ঃসন্ধিকালের ছটফটানি ছাড়িয়া গভীরভাবে লেখাপড়ায় মন দিয়াছে। স্কুল হইতে ফিরিয়া সামান্য বিশ্রাম করিয়াই পড়িতে বসে রাত্রি বারটা পর্যন্ত শুধু খাওয়ার সময় বাদ। আবার ভোরবেলা হইতে পড়িতে বসে। রামুর তাহার উপর শ্যেনদৃষ্টি আছে, নয়তো সব করণীয় কর্ম ভুলিয়া বসিত। সুনীলকে লইয়া এই এক ভাবনা, যখন যেটায় পাইয়া বসিবে অন্য সব ভুলিয়া যাইবে। এখন লেখাপড়া ধরিয়াছে, আঁকা ধরিলে আঁকা, সাইকেল লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলে কোনটাতেই সময়ের হিসাব থাকে না। পকেটে পয়সা আছে কি নেই, জামা পাজামা ময়লা কি ছেঁড়া কোন লক্ষ্য থাকে না। একটা উদাহরণ দিতেছি। একদিন বৈকালে কোচিং ক্লাশে খাওয়ার জন্য বাড়ী ফিরিতে পারে নাই, ক্ষুধা পাওয়ায় ক্যান্টিনে ঢুকিয়া চা খাবার খাইয়া পকেটে হাত দিয়া দেখে কিছুই নাই। দোকান মালিক সুনীলকে চিন্তিতভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলে, আপনার ক্লাশের ঘণ্টা পড়িল আপনার শরীর কি খারাপ লাগিতেছে ? ক্লাশে যাইবেন না ? সুনীল লজ্জিতভাবে তাহাকে বলিয়াছিল, বড় বিপদ হইয়াছে আমি পয়সা আনিতে ভুলিয়াছি, তোমাকে পয়সা দিব কি করিয়া তাহাই ভাবিতেছি। সে বলিয়াছিল, আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি ক্লাশে যান আর দুইটা টাকা লইয়া রাখুন আমি উকিলবাবুর সহিত বুঝিব। খবরটি দিবার লোভ সামলাইতে পারে নাই, হাসিতে হাসিতে সকল কথা আমাকে পরের দিনই জানাইয়া ছিল। রাস্তায় যদি কোন ভিখারীর উপর দয়া হয় পকেট হইতে হাতের মুঠিতে যাহা উঠিবে দিয়া দিবে। ও নিজে কখনও টাকা চাহে না, প্রয়োজনের কথা বলেও না। উহার স্বভাব বুঝিয়া সবসময় রামুর নিকট কিছু টাকা রাখিয়া দি। পারীতে খরচের টাকার ব্যাপারে তাই আমি একটি পাকা ব্যবস্থা চাই যাহাতে নিয়মমত টাকা পায়। বিদেশে উপোস করিবে কাহারও নিকট টাকা চাহিতে পারিবে না। এটর্নী অফিসে শঙ্করদাকে বুঝাইয়া বলিও, টাকাকড়ির ঠিকমত ব্যবস্থা করিতে। ফণীদা তোমাকে সব কথা জানাইলাম। আমার দুশ্চিন্তা দূর করিবে, তোমার উপর আমি চিরদিনই নির্ভরশীল। আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ ছোটদের দিও, বৌঠানকে নমস্কার দিও, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। ইতি তোমাদের শচীন।'

পত্রপাঠ শেষ হতেই গলা ধরে এলো সুলেখার। সে ম্লান স্বরে বললে, 'মা, আমি যাই, বড় ঘুম পেয়েচে।' ঘুম নয় চোখে জল জমেছে, গড়িয়ে যাবে মায়ের সামনে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো মাথা ঘুরিয়ে। আনন্দময়ী আঁচল তুলে মুখ ঢাকলেন।

সুলেখা যাবার আগে আলো নিভিয়ে এ ঘর থেকে নিজের ঘরে চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। কত কথাই না মনের মধ্যে ভিড় করে এলো। ছোট থেকে তার চেয়ে কে বা জানবে সুনীলকে? প্যান্ট আলগা হয়ে ঝুলে গেলে বলে দিতে হতো দড়িটা বাঁধ সুনেদা। ভয়ে ভাবনায় বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে সুলেখার। বিদেশে বিভুঁয়ে ভাষা অজানা, কি দরকার বোঝাতেও পারবে না। শচীনকাকু কি যে ভেবে বসে আছেন। চিরকাল উনিও একটি পাগল। সুলেখার কান্না পেলো, মুখটা বালিশে চেপে ধরলো। মা মরা ছেলে, পুঁতুপুঁতু করে মানুষ করা মায়ের আদরের বড় বেটা। মামণির হাতে খাবে, কিসের পর কি খেতে হয় জানে না, মাছের কাঁটা বেছে দিতে হতো। ভাবনায় ভেঙে পড়া সুলেখা মুখ গুঁজে পড়ে রইলো।

॥ ১৫ ॥

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখে শেষ হলো। পরীক্ষার কদিন ছাত্রের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন সকলেরই উৎকণ্ঠার কমতি নেই। পাটনার মেট্রিকুলেশন, রেষারেষিতে কলকাতার চেয়ে উচ্চমানের করার চেষ্টা থাকে। বেশীর ভাগ প্রবাসী বাঙালী শিক্ষকদের এটা গর্বের বস্তু। প্রতিদিন পরীক্ষার বিষয় সুনীল মোহিতবাবুকে জানায়, প্রশ্নের উত্তর কি রকম ভাবে দিয়েছে। তিনি খুশী হন তার নিয়মমাফিক উত্তর শুনে।

পরীক্ষার শেষ দিনে আদালত থেকে ফিরে শচীনবাবু সোজা গেলেন সুনীলের ঘরে। মোহিতবাবু ও সুনীল আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে আলোচনা বন্ধ করে তাঁর দিকে তাকালো। শচীনবাবু ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হলো পরীক্ষা?'

'মন্দ নয়।' উত্তর দিল সুনীল।

শচীনবাবু মোহিতবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন মনে হচ্ছে মাস্টারমশাই?'

'ও যা বলছে, সেইমত যদি লিখে থাকে, আমার ধারণায় ফার্স্ট ডিভিসন হওয়া উচিত, মন্দের দিকে সেকেণ্ড ডিভিসন নিশ্চয়।'

'বাঃ বেশ, আপনার অভিজ্ঞতায় ভুল হয় না শুনেছি; সুনীল, মাস্টারমশাইকে চা-মিষ্টি খাইয়েছ?'

মোহিতবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'হয়ে গেছে, আপনাকে ভাবতে হবে না। আমারও একটা বড় ভাবনার শেষ হলো, এখন চলি।'

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে মোহিতবাবুর পায়ের ধুলো নিলে, তিনি মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'সুনীল বাবাজী এখন আর কোন কাজ নয়, দেরেক্ বিশ্রাম দিন কতক্।'

শচীনবাবু বললেন, 'আস্থন মাস্টারমশাই, আমার ঘরে একটু বসে যাবেন।' তাঁরা দুজনে বেরিয়ে গেলেন। স্থনীল হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

স্থনীলের বেশ খানিকটা ঘুম হয়ে গেল। পায়ের ওপরে চাপ পড়তে চোখ খুলে রামুকে দেখে বললে, 'কি, পা টিপতে শুরু করলে? তোমাকে বলেছি না রামুদা, আমার পা তুমি টিপবে না?'

'অনেক ঘুমিয়েচ, ওঠো। খাবার দিচ্চে, রাত্রি ন'টা বাজে, খাওয়া সেরে আবার সারারাত ঘুমিও।'

স্থনীল উঠে বাথরুম থেকে ফিরে খাবার ঘরে গেল। শচীনবাবু এসে বসেছেন, স্থনীল তাঁর পাশে বসলো। থালায় রুটি দেবার পর শচীনবাবু পাতের চারিধারে জল ছিটিয়ে গণ্ডূষ করে স্থনীলকে বললেন, 'আরম্ভ করো।' শচীনবাবু খেতে খেতে বললেন, 'মিস্ লিলি বলেছিলেন, পারী যাওয়ার আগে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা স্থাপত্য সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা ভাল। তুমি কি রামুকে নিয়ে কিছু বেড়িয়ে আসতে পারবে? পরীক্ষার পর বেড়ানো দেখা দুই হয়ে যাবে। তোমার শরীর মনের পক্ষেও উপকারী হবে।'

স্থনীল বললে, 'রামুদা গেলে আপনার অস্থবিধা হবে দেখাশোনার।'

'কিন্তু একা তোমারও অস্থবিধা হবে। তাই ভাবছিলুম।' শচীনবাবু বললেন তার দিকে চেয়ে।

স্থনীল বললে, 'বাবা, একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি, আমার বন্ধু কলকাতার স্থপ্রকাশকে আমার সঙ্গে যাওয়ায় রাজী করালে হয়। খরচ অবশ্য আমরা দেবো। এতে রামুদার চেয়ে দেখার স্থবিধাও হবে, খরচও একই হবে। আপত্তি আছে আপনার?'

'আপত্তি থাকবে কেন? এ তো ভালই, যে ছেলেটি এবারে পূজোয় কদিন থেকে গেল?'

'হ্যাঁ, ও আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র, গত বছর ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে এখন স্কটিশে পড়ছে, ওকে চিঠি লিখে দেখবো?'

'ঠিক আছে। ওকে লিখে দাও গরমের ছুটি হলে ও যেন পাটনায় এসে যায়। এখানে সব ব্যবস্থা হবে, ওকে কিছু ভাবতে হবে না টাকাকড়ির ব্যাপারে।'

খাওয়া সেরে দুজনেই উঠে গেল। দেশ ভ্রমণের সম্ভাবনায় স্থনীল সান্ত্বনা ও আনন্দ পাচ্ছে। কলকাতা না যাওয়ার একটা ভাল্ অছিলা জুটে গেল। স্থলেখার সামনে দাঁড়াতে হবে না, মামণিকে একটা চিঠি দিলেই হবে।

ঘরে এসে চিঠি লেখার জন্যে টেবিলে বসলো। সুপ্রকাশের চিঠিতে লিখলো,— প্রিয় সুপ্রকাশ, আমার পরীক্ষা শেষ হলো। আশা করি পাশ করে যাবো। তোমার তো এখন ফার্স্ট ইয়ার, নো ফিয়ার। তোমার কাছে একটা প্রস্তাব আনবো ভ্রমণের মানে দেশ ভ্রমণের। প্রস্তাবটা আসলে মিস্ লিলি ও বাবার। আমার সঙ্গী হিসেবে রামুদাকে স্থির করেছিলেন আমি বাতিল করে তোমার মতামত না নিয়েই তোমার নাম প্রস্তাব করেছি বাবার কাছে, এই প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত। তিনি বললেন দুজনের ব্যয়ভার তাঁর। গরমের ছুটিতে এখানে সুপ্রকাশকে আসতে লিখে দাও, অবশ্য তার মা ঠাকুরাণীর যদি মত থাকে। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রইলুম। মাসিমাকে আমার প্রণাম দিও ও পত্র দেখিও। তোমার পত্রের পথ চেয়ে রইলুম। ইতি তোমারি সুনীল।

এই চিঠির পর সুনীল মামণিকে লিখলো—শ্রীচরণেষু মামণি, আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে, ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে। আশা করি সুলেখার পরীক্ষা অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ওর পরীক্ষা ভালই হবে, ভাবনার কিছু নেই। আমি তোমার কাছে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলুম। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে কিছু ভ্রমণ করতে হবে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে কিছু জানার জন্যে। পারী যাওয়ার পূর্বে কিছু জেনে যাওয়া দরকার মনে করছেন লিলি আন্টি। ভারতে নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা এসব দেখতে প্রায় দু'মাস সময় লেগে যাবে। বাবার ইচ্ছা সুপ্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে আমি এই ভ্রমণ সময়-মত শেষ করি। কলকাতা থেকে সুপ্রকাশ এলেই আমরা বেরিয়ে যাবো, কাজেই এখন কলকাতা যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আশা করি ক্ষমা করবেন। জেঠুবাবু, আপনি, সুলেখা ও মন্টু আশাকরি ভাল আছেন। এখানে সব ভাল। আপনারা আমার প্রণাম জানবেন, ছোটদের আমার ভালবাসা ও স্নেহ জানাবেন। ইতি আপনাদের সুনীল।

চিঠি দুটো শেষ করে খামে ভরে ঠিকানা লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সুনীল শুয়ে পড়লো। রামু এসে মশারি ফেলে দিয়ে গেল। মামণির কথা মনে পড়তে মনটা ভারী হয়ে উঠলো। দমে গেল সুনীল, ভ্রমণের উৎসাহ মিলিয়ে গেল, মামণির দুঃখে ভরা বিদায় মুহূর্তের ছবি স্পষ্ট ভেসে উঠলো। এক বছরের অপেক্ষায় থাকা মাতৃ-হৃদয় খুবই আঘাত পাবে এই চিঠিতে। তার সঙ্গে প্রজাপতির মত ঝলমলে চঞ্চল মূর্তি মনে পড়তে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো সুনীল। সুলেখাকে কত না গুরু-গম্ভীর উপদেশ দিয়ে এসেছে ভুলে যাওয়ার জন্যে। অথচ নিজে যে-কোন নারীমূর্তির চিত্র বা ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়ালে তুলনামূলক জীবন্ত মানসচিত্র এড়াতে পাচ্ছে কই? এর নাম কি ভোলার চেষ্টা? সুলেখার আকর্ষণ প্রতিসংহার করা যাচ্ছে না। আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি বিষাদাচ্ছন্ন করে তোলে মনকে। অথচ এর কি কোন যুক্তি আছে? অসম, বৈসাদৃশ্য,

তাদের মিলন চিরাচরিত সাংসারিক প্রচলনে বেমানান। মামণির গভীর দুঃখেরও কারণ হবে। একদিকে আমার প্রতি স্নেহ, অন্যদিকে সুলেখার প্রতি কর্তব্যবোধ তাকে জটিল সমস্যায় ফেলবে। কৈশোরের এই চিত্ত-চাঞ্চল্য হয়তো সাময়িক, একে দমন না করলে সকলের অশান্তি। সুনীল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বালিশে মুখ গুঁজলো।

॥ ১৬ ॥

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শচীনবাবু অফিসঘরে হাতে একটি চিঠিতে চোখ রেখে চিন্তায় ডুবে আছেন। আজ সকালে চিঠিটা কলকাতা থেকে এসেছে। আনন্দময়ীর চিঠি। তাঁর উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে, সুনীলের প্যারী যাওয়ার প্রস্তাবে। তাঁর মতে, যদি পাঠাতেই হয় বিকল্পে সুনীলের বিবাহ দিয়ে পাঠানো যুক্তিযুক্ত, যদিও সুনীলের বয়স এখন বিবাহযোগ্য নয়। শচীনবাবু মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা সমবেদনার সঙ্গে যাচাই করছেন। দেশে বিবাহ করে গেলেই বিদেশে সে নির্মল চরিত্র থাকবে, একথা তাঁর মেনে নেওয়া শক্ত হচ্ছে। এ সমস্যার কথা তিনি ভেবে দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস, সুনীলের স্বভাবপ্রকৃতি, দেশে কিম্বা বিদেশে যদি কোন কারণে পাল্টায়, সেটা রোধ করা সম্ভব নয়। অদৃষ্টবাদী শচীনবাবু ঠাকুরের ভরসায় নিশ্চিন্ত চিরদিন।

সুনীল এসে বললে, 'বাবা, সুপ্রকাশ কাল এসে পৌঁছবে লিখেছে। আমরা কবে নাগাদ রওনা হবো?'

শচীনবাবু একটু ভেবে বললেন, 'আজ শনিবার, তোমরা সোমবার রওনা হতে পারো, আজই রামুকে পাঠিয়ে দাও স্টেশনে, দুটো সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কিনতে।'

সুনীল বললে, 'না বাবা, আমরা ইণ্টার ক্লাশে যাবো। প্রথমে আগ্রা দেখে মধ্যভারত, সেখানে খেজুরাও দেখে ওইখানে টাইমটেবল দেখে কোন্ কোন্ জায়গায় কোন্ রাস্তায় যাওয়ার সুবিধে দেখে নিয়ে প্রোগ্রাম করে নেব, আপনি কি বলেন?'

'আমার বলার কিছু নেই, শুধু কটা কথা, প্রথমেই স্টেশন ছাড়বে না, জায়গা দেখে নিয়ে ছাড়া সুবিধের, নয় তো স্টেশনে থাকার জায়গা পাবে চার্জ দিলে। যেখানে সেখানে থাবে না, স্টেশনে মালপত্তর জমা দিতে পারো। টাইমটেবিলে সব লেখা আছে ভাল করে পড়ে নেবে। সাবধানে বেড়াবে শরীরের দিকে নজর রেখে। খাম পোস্ট-কার্ড নিয়ে যাবে রোজ একটা চিঠি দেবে, কোন্ তারিখে কোথায় থাকবে জানালে ভাল। তোমার দ্বারা হবে না, সুপ্রকাশকে বলে দেবো।' তিনি হাসলেন, তারপর বললেন, 'আনন্দ বৌঠানের চিঠি পড়তে চাও তো পড়তে পারো।'

সুনীল ব্যগ্রভাবে হাত বাড়ালো। পড়তে লাগলো চিঠি নিয়ে—মাঙ্গবরেষু ঠাকুরপো! আশাকরি সব কুশলে আছেন, আমাদের সব কুশল। আপনি শীঘ্র মধ্যেই

সুনীলকে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষার জন্যে প্যারিস পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন, ইহা কর্তার নিকট শুনিয়া অবধি খুবই চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সুনীল আমার আপন সন্তানদের অপেক্ষা প্রিয়, তাহা আপনার অজানা নহে। তাহার মঙ্গল অমঙ্গলের কথায় সদাসর্বদাই মনের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। তাহাকে সুলেখাকে যমজ ভাই-বোনের মত নিজ দুগ্ধে পালন করিয়াছি। তাহাদের বয়সও প্রায় সমান। কর্তার মুখে আপনার প্রস্তাব ও সুলেখার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া আমাদের সম্পর্ক আরো নিকট করিবার কথা বলিয়াছেন। একথায় আমি খুশী হই নাই। সুনীল এখনই আমার যতটা নিকট তাহা হইতে নিকটতম, আমার ধারণার বাহিরে। সে আমারই সন্তান আছে, চিরদিন থাকিবে। সকল দিক চিন্তা করিয়া, সুনীলের সহিত সুলেখার বিবাহ দিতে আমার মন সায় দেয় না। আমার একান্ত অনুরোধ, সুনীলকে বিদেশে পাঠাইবার পূর্ব তাহার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করুন। একটি উত্তম সম্বন্ধ জানাইতেছি আমার অতি পরিচিত। কন্যাকে বালিকা বয়স হইতে দেখিতেছি। দেখিতে সুলেখা হইতে সুন্দর, রঙ ফর্সা। আমাদের পাশের বাড়ী, পিতামাতা দুই ভাই আমাদের খুব চেনা। মেয়েটি বীণাপাণি পর্দা স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, বয়স কম, সুনীলের সহিত মানানসই হইবে। পিতার নাম অমিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতায় আদি বাড়ী আপনাদের পুরানো বাড়ীর সহিত কাজকর্ম হইয়াছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার পয়সাওয়ালা নহে, অবশ্য সাধ্যমত যৌতুক ইত্যাদি দিবেন। আমি জানি বরপণ-যৌতুক গ্রহণে আপনি মোটেই আগ্রহী নহেন। কন্যাটি সুলক্ষণা, জানাশোনা, সেইকারণে আমাদের খুবই পছন্দ। বিবাহ ব্যাপারে আপনি একবার আসিয়া কথাবার্তা করিলে বাকি সব দায়িত্ব আমি লইব, আপনাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। তিন মাসের মধ্যেই বিবাহ হইতে পারে, সুনীলের বিদেশ যাত্রার কোন ব্যাঘাত হইবে না। আপনারা সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবেন। ইতি আনন্দ বৌঠান।

আনন্দময়ীর পত্র পড়ে সুনীল ক্ষুব্ধ মর্মাহত। মামণির ওপর প্রচণ্ড রাগে অভিমানে সে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলো। তার প্রতি অবিশ্বাস, তার চরিত্রের প্রতি অনাস্থা এই বিবাহ প্রস্তাবে প্রকাশ পেয়েছে, অপমানজনক মনে হচ্ছে। সুনীল কোনদিন উঁচু গলায় বাবার সাক্ষাতে কথা বলে না, আজ সে কম্পিত কর্কশ রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো, 'লিখে দাও মামণিকে, আমি এখন বিয়ে করবো না, বিদেশে যাই বা না যাই।'

সুনীলের মুখে ক্রোধ আর উত্তেজনায়, বেদনাক্লিষ্ট এমন একটা পরিবর্তন এনেছে যে, শচীনবাবু ভয় পেয়ে উঠে তার কম্পিত দেহ জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'সুনীল, তুমি শান্ত হও। কোন চিন্তা নেই, তোমার অমতে কিছুই হবে না। মন খারাপ

করো না, গুরুজনেরা এ রকম সাধারণতঃ ভেবেই থাকেন। চলো, শোবে চলো, আজ আমার কাছে শোবে নয়তো আমার ঘুম হবে না। চলো বাবা!' যেতে যেতে বললেন, 'তোমার রাগ আছে জানতুম না বাবা, রাগ অমন করে চাপতে যেও না, ক্ষতি হবে শরীরের।'

শচীনবাবু সুনীলকে পাশে নিয়ে শুলেন। শচীনবাবু একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, হঠাৎ হেঁচকির শব্দ তাঁর কানে এলো। পাশ ফিরে দেখেন, বালিশে মুখ গুঁজে কান্না চাপার চেষ্টা করছে সুনীল। তিনি ব্যস্ত হয়ে তার গায়ে হাত রেখে বললেন, 'কি হলো, এ্যাঁ!'

সুনীল রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'বাবা, তুমিও কি মামণির মত আমাকে অবিশ্বাস করো? তোমাদের চোখের আড়াল হলেই আমি চরিত্রহীন হবো? তুমি কি চাও বাবা আমি বিয়ে করে বিদেশে যাই? বল তোমার মত আমাকে লুকিও না।'

শচীনবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'সুনীল, আমি অদৃষ্টবাদী, ঠাকুরের কৃপা আমার ভরসা। তুমি এখানে বিয়ে করে গেলেই যে চরিত্রবান থাকবে আর অবিবাহিত গেলে চরিত্রহীন হবে বা ওখানে বিবাহ করবে এসব কথায় আমার আস্থা নেই। আমি এমন উদাহরণও দেখেছি। এখানে সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করে বিলাতে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বে-আইনী ভাবে, এই নিয়ে কোর্ট কাছারি চলেছে। এ সবই ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব-প্রকৃতি নির্ভর। এ নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না, তুমি যা ভাল বুঝবে সেইমত করবে। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করবেন আমি বিশ্বাস করি।' তার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন, তিনি বুঝেছেন আসলে তাঁর অভিমানী ছেলের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে, তায় আবার মামণির কাছ থেকে। আজ যে মূর্তি তিনি লক্ষ্য করলেন সুনীলের, তা তো কোনদিন দেখেননি শৈশব থেকে; চরিত্রের একটি নতুন অভিজ্ঞতা শচীনবাবুর কাছে। তিনি স্থির করলেন কালই আপত্তি জানিয়ে চিঠি দেবেন। সুনীলের বিবাহ সংক্রান্ত কোন আলোচনা না হওয়াই ভাল। ঠাকুরের ইচ্ছায় যা হবার হবে। চিঠিটা ফণীদাকে দেবেন ঠিক করলেন।

॥ ১৭ ॥

লাইব্রেরীঘরে ফণীবাবু; শচীনবাবুর চিঠি নিয়ে পাশে বসা আনন্দময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, 'শচীনের চিঠি দেখেচ? তোমার বড় বেটা খেপে গ্যাচে তোমার ওপর!' হাসলেন ফণীবাবু।

'কই দেখি দাও।' আনন্দময়ী চিঠি নিয়ে পড়া শুরু করলেন—প্রিয় ফণীদা, বৌঠানের পত্র পাইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ সম্যক উপলব্ধি করিলাম এবং ইহার

যৌক্তিকতা, যাহা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক তাহাও মানিতে হইল। তাঁহার প্রস্তাব আমার নিকট গ্রহণযোগ্য না হইবার কোন কারণ নাই ; কিন্তু সুনীলের রাগ অভিমান আর ঘোর আপত্তি দেখিয়া বৌঠানের নির্বাচিত নির্দিষ্ট কন্যার সহিত সুনীলের বিবাহ সম্ভব হইতেছে না। বৌঠানের পত্রের উত্তর তাঁহাকে দিতে পারিলাম না লজ্জার কারণে, আমাকে যেন ক্ষমা করেন। সুনীল ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য অদ্য রওনা হইয়াছে, সঙ্গে তাহার বাল্যবন্ধু সুপ্রকাশও আছে। আগ্রা হইয়া মধ্যভারত দেখিয়া, অজন্তা ইলোরা দেখিয়া, দক্ষিণ ভারত যতটা সম্ভব দেখিয়া, ভুবনেশ্বর কোনার্ক হইয়া কলিকাতা হইয়া পাটনা ফিরিবে। ফণীদা, আমি সুনীলের বাড়ীর বাইরে জীবনযাত্রা কেমন হয় দেখিবার আগ্রহে তাহাকে দেশ ভ্রমণে উৎসাহিত করিয়াছি। মামণি ও বাবার আওতার মধ্যে মানুষ, একটু বাইরের লোকের সহিত পরিচয় ঘটুক। তুমি বৌঠান সুলেখা মণ্টু আশা করি কুশলে আছ, সকলে আমার ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিও। ইতি শচীন।

চিঠি পড়া শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আনন্দময়ী একটু রাগতভাবে বলে উঠলেন, 'পাগল আর কাকে বলে!'

ফণীবাবু হেসে বললেন, 'শচীন পাগল নয়, দারুণ অদৃষ্টবাদী। তার সঙ্গে আধ্যাত্ম চিন্তা এখন বেড়েছে।'

'ঠাকুরপো তো এরকম ছিল না কম বয়সে?'

আনন্দময়ীর প্রশ্নের উত্তরে ফণীবাবু বললেন, 'ও চিরকালই একটু সাত্বিক স্বভাবের। বৌমা মারা যাওয়ার পর ওর একটা বড় পরিবর্তন অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস। বৌমার মৃত্যুর পাঁচ ছ'মাস আগে পাটনায় এক জ্যোতিষী ওর ঠিকুজী দেখে নাকি বলে দিয়েছিল বৌমার মৃত্যু সম্ভাবনা, যার তারিখটা প্রায় মিলে যাওয়ায় ওর মনে ধারণা হয়ে গেছে দৈব ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার নয়। এই জ্যোতিষীকে দিয়ে সুনীলেরও ঠিকুজী করিয়ে নিয়েচে।'

হেসে আনন্দময়ী বললেন, 'আশ্চর্য! তোমার মত নাস্তিকের আবাল্য বন্ধু হয়ে, ঠাকুরপো বিপরীত পথের যাত্রী হয়ে গ্যালো? তুমি বাধা দিলে না, যত পণ্ডিতি আমার ওপর?'

ফণীবাবু বললেন, 'দেখ আনন্দ, তোমাকে কোন কাজে বাধা দিইচি? মতামত জানিয়েচি এই পর্যন্ত। শচীনকেও আমার মত প্রয়োজনে জানিয়ে দিয়েচি, মানা না মানার স্বাধীনতা সকলের থাকা উচিত।'

'যাই বলো, সুনীলের সম্বন্ধে ঠাকুরপোর নির্বিকার মনোভাব আমার খুব খারাপ লাগচে। এই দেখো না, এত কম বয়সে সুনীলকে মন্দির ভাস্কর্য দেখতে পাঠানো কি উচিত হয়েচে?

তুমি তো দেখেচ, আমরা গিয়েচি অনেক বয়সে, এ সব দেখা স্নুনীলের পক্ষে ভাল এখন ?' জোরে হেসে উঠলেন ফণীবাবু। রেগে আনন্দময়ী বললেন, 'এতো হাসির কি আচে ?'

'স্নুনীল দু-তিন মাসের পর পারী যাচ্ছে আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে। তুমি কি মনে করো আনন্দ, সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানীরা শিক্ষা দিতে যাবেন ? শচীন এ কথা জানে, আর্ট স্কুলে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তার জানা, তাই আস্তে আস্তে সইয়ে নিচ্ছে। স্নুনীলের বিবাহ দিয়ে পাঠালেই তার চরিত্র নির্মল থাকবে, এ কথাও শচীন বিশ্বাস করে না, বুঝেচো ? তুমি ওকে অত বোকা ভাবচ কেন ?'

বাবার হাসির শব্দে স্নুলেখা এসে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দময়ী ক্ষুণ্ণ মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্নুলেখা বাবার চেয়ারের পাশে এসে বললে, 'কি হয়েছে বাবা, এত হাসচো ?'

তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ফণীবাবু বললেন, 'এই চিঠিটা পড়ো। তোমার মা স্নুনীলের ভবিষ্যত চিন্তায় খুবই চিন্তিত, সন্তানের প্রতি কর্তব্যে নিষ্ক্রিয়তার অপবাদে শচীনকে দায়ী করতে চান।' স্নুলেখা আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা পড়তে লাগলো, পড়া শেষে চিঠি ফেরৎ দিয়ে কোন কথা না বলে চলে গেল। ফণীবাবু বইয়ের মধ্যে মগ্ন ছিলেন।

॥ ১৮ ॥

সকাল দশটা নাগাদ ফণীবাবুর গেটে ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াল। বৈঠকখানায় বসা ফণীবাবু ও আনন্দময়ী জানালা দিয়ে দেখলেন, ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবী পরা, বড় বড় চুলওয়ালা কে যেন নামলো গাড়ী থেকে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে। কোচুয়ান চালে উঠে একটা বড় বেডিং টানাটানি করছে; স্নুনীল বিশু—বিশু বলে ডাকলো বাড়ীর দিকে চেয়ে। তারপর হাত ওঠালো বেডিং নামানোর জন্যে। 'আরে চেনা চেনা কে ছেলেটা !' বলে ফণীবাবু ও আনন্দময়ী বারান্দায় বেরিয়ে বিশুকে ডাক দিলেন। স্নুনীল গাড়োয়ানকে পয়সা মিটিয়ে চাইলো বারান্দার দিকে।

'ও মা, এ যে স্নুনীল গো !' হাসিমুখে আনন্দময়ী বলে উঠলেন। বিশু ছুটে গেল গেটের দিকে। তার মাথায় একটা চাটি মেরে স্নুনীল এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। সে দেখলে জেঠুবাবু ও মামণি দু'জনেই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছেন। স্নুনীল তাঁদের দুজনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালো। কান্নার স্বরে আনন্দময়ী বলে উঠলেন, 'এ কি চেহারা হয়েচে স্নুনে, আমরা তোকে চিনতে পারিনি। শরীর ভাল তো ?'

'খুব ভাল, মার। ভারত ঘুরে এলুম দেড় মাস ধরে, দুদিন বিশ্রাম করলেই ঠিক হয়ে যাবে।' স্নুনীল বললে।

ফণীবাবু হেসে বললেন, 'খুব ভাল করেচো মাস্টার, বিদেশ যাওয়ার আগে নিজের দেশকে জেনে যাওয়া দরকার। আনন্দ, সুনীলের সব ব্যবস্থা করো তোমার ঘরে, আমি লাইব্রেরীতে যাচ্ছি। সময়মত মাস্টারের কাছে দেশ ভ্রমণের গল্প শুনবো, কেমন?' সুনীল মাথা নাড়লো।

সুলেখা, মণ্টু কারুরই দেখা নেই, ব্যাপার কি! ভাবলো সুনীল; চারিদিকে চেয়ে বললে, 'ওরা সব কোথায়?'

'সব আছে, চিন্তা নেই। আগে তুমি ওই চিরকুট পাজামা-পাঞ্জাবী ছেড়ে কলঘর থেকে চান সেরে এসো বাবা, আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে তোকে দেখে, তুই কলঘরে যা।' সুনীল হেসে কলঘরের সামনে দাঁড়ালো, কামিনী পাজামা পাঞ্জাবী টোয়ালে দিয়ে বললে, 'সাবান, দাঁতমাজন সব কলঘরে আছে।' সুনীল ঢুকে গেল কলঘরে। কতদিন সে যে ভাল করে চান করেনি মনে পড়ছে না। হাতে পায়ে যেন মাটি জমে আছে, একদিনে পরিষ্কার হবে না, তবু ঘণ্টাখানেক ধরে কলঘরে সর্বকর্ম শেষ করে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সাবান দেওয়া ঝাঁক্ড়া চুলগুলো ঝাড়তে লাগলো। আনন্দময়ী এসে বললেন, 'চ সুনে, খাবার ঘরে চ।'

খাবার ঘরে ছোট টেবিলে খাবার, টি-পট সব সাজানো। 'বোস, আগে ত একটু চা খাবি?' আনন্দময়ী চা করে কাপ হাতে তুলে দিলেন। সুনীল চায়ে চুমুক দিয়ে চাইল মামণির দিকে। মামণির স্নেহাতুর দৃষ্টি, কিন্তু গম্ভীর মুখ থমথমে। সুনীল প্রশ্ন করলো, 'ওরা সব কোথায় গ্যাছে মামণি?'

আনন্দময়ী বললেন, 'সুলেখা বেথুন কলেজের এক দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে গ্যাচে, সঙ্গে মণ্টুকে নিয়ে গ্যাচে। তুই জানিস কি সুলেখা কুড়ি টাকা জলপানি পাবে ম্যাট্রিকের। কলেজের খবর নিতে গেল ভর্তির ব্যাপারে, এখুনি এসে পড়বে। তোর খবর কি?'

'আমি পাশ করেছি।'

'এতক্ষণ বলিসনি পাজি!'

'আমি তো সবে কাল জানলুম। আমি দেড়মাসের বেশী পাটনা ছাড়া। গতকাল বাবার চিঠিতে খবর পেলুম আমি নাকি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে গেছি। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে মামণি।'

'বেড়ালের ভাগ্যে কেন হবে! তুমি তো ছেলে খারাপ ছিলে না, বাপের আদরে… তুই খা, আমি ওঁকে খবরটা দিয়ে আসি।' ব্যস্তভাবে আনন্দময়ী চলে গেলেন খুশী মনে।

মণ্টু ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'সুনেদা—সুনেদা, তুমি কতক্ষণ এসেচো! দিদি—দিদি, সুনেদা এসেচে, এঘরে আয়।'

তাড়াতাড়ি সুলেখা ঘরে ঢুকে সুনীলের দিকে চোখ পড়তেই আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো, 'একি, অসুখ হয়েছিল নাকি?'

মণ্টু বললে, 'দেখ দিদি, সুনেদা আমার চেয়ে কালো রোগা হয়ে গ্যাচে। কি হয়েছিল সুনেদা? চিঠি দাওনি কেন?'

সুনীল সুলেখার দিকে চেয়ে বললে, 'তোমার দিদিও রোগা হয়েছে কেন?'

সুলেখা সুনীলের দিকে চেয়েই ছিল। আনন্দময়ী ঘরে এসে বললেন, 'উনি খুব খুশী, বললেন মিষ্টি খাওয়াতে হবে তো মাস্টারকে!' মণ্টু মায়ের গা ঘেঁষে বললে, 'কি মা, কিসের মিষ্টি?' আনন্দময়ী বললেন, 'তোদের সুনেদা ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে।' মণ্টু হাততালি দিয়ে উঠলো। আনন্দময়ী বললেন, 'আমি রান্নার দিকে যাই; আজ সকাল সকাল খেয়ে বিশ্রাম কর সুনে, তোকে বড ক্লান্ত লাগচে।' বলেই চলে গেলেন।

সুলেখা বিষণ্ণ বেদনায় বললে, 'তুমি শরীরের দিকে মোটেই কোন নজর রাখচো না মনে হচ্ছে!'

'না-না, শরীর আমার ঠিক আছে। গত এক বছরে আমার কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি। তুমি কি বলছো!' সুলেখা আত্মসংবরণ করার জন্যে আঁচল তুলে মুখের ওপর রাখলো। মণ্টু বললে, 'সুনেদা, সত্যি তোমার চেয়ারা কেমন যেন হয়ে গ্যাচে, তুমি মানচো না।'

'না রে, অনেক ঘোরাঘুরি করেছি তাই দুদিন বিশ্রাম করলেই ঠিক হয়ে যাবে।' মণ্টু বেরিয়ে গেল। সুনীল অপরাধীর মত সুলেখার দিকে চাইলো। সুলেখা বললে, 'আমি জানি, কাকুর চিঠি পড়ে অনেক কথা জেনেচি, অনেক গোঁয়ার তুমি, পরীক্ষার আছিলায় শরীরের ওপর অনেক অত্যাচার করেচ যাতে শরীর ভেঙেচে! পশ্চিমে ব্যাড়ালে রঙ কালো হতে পারে, এত স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কথা নয়। যেন বহুদিনের রুগী! কি মঙ্গল হবে কার?' গলা ভেঙে গেল। আনন্দময়ীকে আসতে দেখে সে চলে গেল নিজের ঘরে।

বারান্দায় আনন্দময়ী কামিনীকে ডাক দিলেন। কামিনী আসতে বললেন, 'দাদাবাবুর বিছানাপত্তর কিছু আজ খোলার দরকার নেই, কাল সকাল থেকে খুলে আগে সব ছাতে ফেলে দিবি। জামা কাপড় চাদর সব সারাদিন রোদে ফেলে রাখবি। তারপর কাচার জন্তে ধোবাকে ডাকবি। সব ধোবারবাড়ী দিতে হবে। এ কদিন আমার ঘরে দাদাবাবু শোবে, বুঝেচিস্?'

মামণির চিন্তিত ভারাক্রান্ত ভঙ্গিমা দেখে, মনের জমে ওঠা রাগ অভিমান গলতে শুরু করেছে সুনীলের। সে ধীরে ধীরে সুলেখার ঘরের দিকে গেল। সেখানে সুলেখাকে দেখে বললে, 'সুলেখা, তুমি আমাকে স্বাস্থ্যের জন্যে বকুনি দিলে; কিন্তু মনের ওপর নিজের দখলদারী সব সময় চলে না, বোধ হয় সতর্ক থাকলেও। মনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তোমাকে না বলে পাচ্ছি না, মামণিকে কিন্তু জানিও না। ব্যাপারটা হলো মামণির সেই চিঠি। চিঠি পড়ে এত আঘাত পেলুম, যে বোঝানো যায় না। মনে হলো মামণির সঙ্গে আর কোনদিন দেখা করবো না, এ বাড়ীতে কোনদিন আসবো না। কিন্তু এটা যে কি যন্ত্রণাদায়ক তুমি হয়তো বুঝবে সুলেখা, আর কেউ বুঝুক না বুঝুক। বিদেশে, মামণি আমার চরিত্র নিয়ে শঙ্কিতা হয়ে বিবাহ প্রস্তাব আমার খুব অপমান বোধ হয়েছিল। এর জন্যে দিনের পর দিন আমি যে কি মনঃকষ্ট ভোগ করেছি কি বলবো! আমায় কুরে কুরে খেয়েছে। অত আনন্দের অপূর্ব শিল্পকলা দেখেও আনন্দ পাইনি, শান্তি তৃপ্তি কিছুই ছিল না দেশ ভ্রমণে। সুপ্রকাশের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেল, আমার কি যে হলো। ভুবনেশ্বর থেকে হাওড়ায় নেমে পাটনার গাড়ী ধরবো ঠিক ছিল। হাওড়ায় যখন সুপ্রকাশ বললে, পাটনার টিকিট কেটে রাখি সুনীল! আমি তখন কেমন যেন হয়ে গেলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে সুপ্রকাশ ঘাবড়ে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে বললে, কি রে, শরীর খারাপ লাগছে? তবে আজ আমার বাড়ীতে বিশ্রাম করে কাল যাবি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, কি যে বলেছিলুম মনে নেই, শুধু চোখে ভেসে উঠলো এই বাড়ী, মামণি, তোমার করুণ মুখ, প্রতীক্ষা মার্কা আঁকা সেই ছবি, জেঠুবাবু, মণ্টুর মুখ, বুকের ভেতর কে যেন মুচড়ে দিল সজোরে, নিজেকে মনে হলো অকৃতজ্ঞ। বললুম চলো সুপ্রকাশ বাইরে, বেরোবার সময় বললুম, আমি জেঠুর বাড়ী যাবো, সুপ্রকাশ তুমি বাড়ী যাও, দেখা করবো পরে। অবাক হয়ে চাইল সুপ্রকাশ একটু হেসে, কারণ তাকে প্রতিজ্ঞার কথা আগে জানিয়েছিলুম। তারপর সোজা এখানে।'

সুলেখা তার মুখের দিকে চেয়েছিল অপলক দৃষ্টিতে, সে বলে উঠলো, 'কি নিষ্ঠুর করেছিলে মনটাকে! আমি কল্পনায়ও আনতে পারি না, তুমি একবছর পরেও একবার আসবে না!'

'কি যে করি সুলেখা। আমি ওই যে বললাম তখন, মনের ওপর দখলদারী মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি, সময় সময় সুপ্রকাশও চটে যায় ঝগড়া করে।'

সুলেখা হাল্কা ভাবে বললে, 'ও নিয়ে ভেবো না, ওটা তোমার চিরকেলে, বলার সঙ্গে করার, করার সঙ্গে ভাবার মিল নেই।' হাসলো সুলেখা।

আনন্দময়ী এসে বললেন, 'ভাত হয়ে গ্যাচে সুনে, তুই খেয়ে নে। চল খাওয়ার ঘরে। সুলেখা, তুইও বসে যা, সুনীল একা একা খাবে।'

দু'জনে আসনে বসার পর ঠাকুর ভাতের থালা নামিয়ে দিল। আনন্দময়ী সামনে জলচৌকিতে বসলেন। সুনীল খাওয়া শুরু করতেই তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আনন্দময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'সব জায়গায় ভাত পেতিস ?'

'না, কোথাও রুটিও খেয়েছি।'

'মাছ-মাংস ?'

'সব জায়গায় পাইনি, বেশীর ভাগ দিন নিরামিষ, তবে দুধ দই মিলতো।'

'খাওয়ার অনিয়মেই শরীর এত খারাপ হয়েছে !' আনন্দময়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, সুলেখাকে বললেন, 'সুনীলের বিছানা ঠিক করে একটা কাচা চাদর পেতে দিস, বালিশের ওয়াড় বদলে দিস। সুনীল, হাত ধুয়ে গিয়ে শুয়ে পড়িস, তুই বেশ ক্লান্ত, আর কথা নয়।'

আনন্দময়ী চলে গেলেন। সুলেখা ও সুনীল দুজনেই উঠলো।

॥ ১৯ ॥

সন্ধ্যার সময় উপাসনা শেষ করে আনন্দময়ী সুনীলের খবর নিতে গিয়ে দেখলেন, সুনীল তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে ; তিনি ফিরে রান্নাঘরে ঠাকুরকে চায়ের জল গরম করতে বলে ডাকলেন, 'সুলেখা, এদিকে আয়।' তাঁর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শুনে সুলেখা তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালো সামনে। তিনি বললেন, 'সুনে দুপুর থেকে এখনও ঘুমোচ্চে, তুই চা-টা করে কিছু বিস্কুট নিয়ে আয়, আমি ঘরে যাচ্চি।' আনন্দময়ী গিয়ে সুনীলের মাথার কাছে বসে, তার মুখের দিকে চেয়ে কপালে হাত বোলাতে লাগলেন। সুনীল একটু নড়েচড়ে আবার নেতিয়ে পড়লো।

সুলেখা চায়ের ট্রে, বিস্কুট এনে খাটের পাশে ছোট টেবিলে নামিয়ে মায়ের দিকে চাইল। আনন্দময়ী সুনীলের কাঁধে হাত দিয়ে নাড়িয়ে ডাকলেন 'সুনে, ও সুনে, চা খেয়ে নে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাবা !' সুনীল হুঁ-হাঁ করে চোখ খুললো, আনন্দময়ী ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'চা খাও, রাত হয়ে গেল।'

'এ্যাঁ,' বলে সুনীল উঠে বসলো চোখ রগড়াতে রগড়াতে। সুলেখা চায়ের কাপ আর বিস্কুটের ডিস এগিয়ে ধরলো। লজ্জিত গলায় সুনীল বললে, 'খুব ঘুমিয়েছি তো !'

আনন্দময়ী বললেন, 'ভালই তো, এখানে তোমার কাজই বা কি !' সুনীল বিস্কুট তুলে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিলো।

আনন্দময়ী উঠে আবার বসলেন। তাঁর মনে ভাবনা, ছেলেটার শরীর খুব খারাপ

হয়েছে নইলে এরকম তো কখনও ঘুমোত না! এ ছেলে যাবে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে! আনন্দময়ীর বুক কেঁপে উঠলো, যত রাগ গিয়ে পড়ে শচীন ঠাকুরপোর ওপর। কি যে মানুষ বাবা, ছেলেটা যে আত্মভোলা পাগলাটে, সেটা চোখে পড়ে না? তিনি তো ওর মুখ দেখলেই সব বুঝতে পারেন। এবারে যখন এলো বাড়ীতে, যেন রাগে গরগর করচে, মুখের কথায় বোঝার উপায় নেই। চাপা সব, বাড়ী ঢুকে তার দিকে ভাল করে চাইলই না। অন্যবারের মত প্রথমেই জড়িয়ে ধরে মামণি মামণি বলে। এবারে মুখ হাঁড়ি, অন্যদিকে চেয়ে কথাবার্তা। কর্তা বুঝেচেন, লাইব্রেরীতে গিয়ে বললেন, 'তোমার চিঠির পাল্‌টা চলছে, সাবধান!' আমি একবার রান্নাঘরে যাই দেখে আসি।'

সুলেখা দুখানা বিস্কুট আর দু' পেয়ালা চা দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়ে বললে, 'তুমি শুয়ে পড়ো, এখন ওঠবার দরকার নেই, আমি আসচি।' সুনীল আবার শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে সুলেখা ঘরে এসে দেখলো সুনীল আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সে চলে গেল নিঃশব্দে। আনন্দময়ীর কাছে গিয়ে বললে, 'মা, আজ তোমার উপাসনা হয়েছে?'

'সেরে নিয়েচি, ঠিক মন কি বসচে? বিশু মিষ্টি নিয়ে এলে তুই কামিনীকে খাওয়ার জায়গা করতে বলবি, আমি কর্তার ঘরে যাচ্ছি সুনীলের খবর দিতে, এতো অস্বাভাবিক ঘুমোচ্চে কেন!'

লাইব্রেরীতে আনন্দময়ী একটা চেয়ারে বসতেই, ফণীবাবু চোখ না তুলে বললেন, 'কি ব্যাপার, আজ অসময়ে খাওয়ার তাগাদা?'

'না না, খাওয়ার তাগাদা নয়, একটা কথা, সুনীল সেই এ্যাগারোটার থেকে ঘুমোচ্চে, একবার সন্ধ্যের সময় চা খাইয়েছি জাগিয়ে, কিন্তু আবার অসাড়ে ঘুমোচ্চে!'

'খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করেচে তো? শরীর খারাপের কথা বলেছিল কিছু?'

আনন্দময়ী বললেন, 'না, কপালে হাত দিয়েও দেখেচি জ্বরটর মনে হলো না।'

হেসে ফণীবাবু বললেন, 'চিন্তা করো না, খুব ঘোরাঘুরি করেচে তাই; এরা সব একরকমের 'ফর্টিনাইন', ছবি, মন্দির দেশ দেখতে দেখতে হয়তো খেয়ালই থাকেনি খাওয়ার শোয়ার। দেড়মাস ধরে চাঁই ঘুরঘুর, খাওয়ার ঘুমোনর তোয়াক্কা করেনি, এখানে তোমার কোলটি পেয়ে নিশ্চিন্ত; ঘুমোতে দাও; নয় কাল সকালে একবার ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নিও।'

'আমার বড় ভয় করচে গো, ও আবার পরশু পাটনা ফিরবে বলছিল, তুমি ঠাকুরপোকে বুঝিয়ে একটা চিঠি রাত্রেই লিখে রাখো, বিশ্রামের জন্যে এখানে কিছুদিন থেকে যাক্।' আনন্দময়ী রুদ্ধ কণ্ঠে শেষ করলেন।

ফণীবাবু বললেন, 'ভেবো না, এখুনি চিঠি লিখে রাখচি।' তিনি চিঠি লিখতে বসলেন; সুনীলের বিদেশ যাওয়া আর আনন্দময়ীর সেদিনের কথা ভেবে ফণীবাবু চিন্তিত হলেন।

সুলেখা বসেছিল চেয়ারে, বিছানার পাশে সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে। এমন নিঃসাড়ে এতক্ষণ কেউ ঘুমোয়! পাশ ফিরে নড়াচড়াও তো করে লোক! আনন্দময়ী ঘরে এসে সুনীলকে দেখলেন, তাঁর বিষন্ন মুখের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা কি বললে মা?'

সুলেখার মুখে অস্বস্তি চোখ ছলছলে লক্ষ্য করে, হাসি টেনে এনে মুখে আনন্দময়ী বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই, খুব ক্লান্ত বলে এরকম ঘুমোচ্চে।' সুনীলের কপালে হাত দিলেন তিনি। সুলেখা জিজ্ঞেস করলে, 'আমি কি সকলের ভাত দিতে বলবো?'

আনন্দময়ী সুনীলের মাথার কাছে বসে বললেন, 'বাবুর, তোর, মণ্টুর দিতে বল খাবার ঘরে, সুনীলের এখানেই ছোট টেবিলে দিতে বল, আমি সুনীলকে জাগানোর চেষ্টা করচি।' সুনীলের মাথায় কপালে হাত বোলাতে বোলাতে ডাকলেন, 'সুনে, ও সুনে, ওঠ্ বাবা।'

সুনীল চোখ খুলে বলে উঠলো, 'ভোর হয়ে গেছে মামণি?'

হেসে বললেন আনন্দময়ী, 'ভোর কি রে? এখনও রাতের খাওয়া হয়নি।'

'ও' বলে সুনীল পাশ ফিরে শুলো।

'আর ঘুম নয়। খেয়েদেয়ে তবে। সুলেখা, সুনীলের খাবার পাঠিয়ে দে তাড়াতাড়ি, নয়তো আবার ঘুমোবে।'

ঘরে এসে ঢুকলেন ফণীবাবু, বললেন, 'মাস্টার কেমন আছ, কই দেখি হাতটা।'

তাঁর গলা শুনে চটপট উঠে বসলো সুনীল, ফণীবাবু তার নাড়ী দেখে বললেন, 'ঠিক আছে। আজ আর দেশ ভ্রমণের গল্প শোনা হলো না, কাল হবে।' পিঠে একটা চাপড় মেরে ফণীবাবু বেরিয়ে গেলেন।

কামিনী লুচি-তরকারির দুটো থালা টেবিলে রেখে ক্ষীর রাবড়ী সন্দেশ আনতে গেল। আনন্দময়ী বললেন, 'নিজে খাবি, না খাইয়ে দেবো?'

'না না, নিজেই চেয়ারে বসে খাচ্ছি।' একটু থেমে আনন্দময়ীর দিকে চেয়ে হেসে বললে, 'আমার বেলায় তোমার শোবার ঘর অশুদ্ধ হয় না মামণি?'

একটা চড় মেরে আনন্দময়ী বললেন, 'ফাজিল কোথাকার!' কামিনী রাবড়ী আর ক্ষীরের বাটি রাখতেই সুনীল চেঁচিয়ে উঠলো, 'করেছ কি মামণি, দুটো প্রিন্সকে একসঙ্গে খাবো? কমিয়ে দিতে বলো অর্ধেক, খেতে পারবো না।'

আনন্দময়ী বললেন, 'কামিনী, কমিয়ে আন্। মণ্টুকে, বাবুকে, সুলেখাকে দিয়েচিস ?'

'সকলকে দেওয়া হয়েছে, এর থেকে তোমার হয়ে যাবে।' কামিনী বললে।

'আমার চাই না, তুই আর বিশু খেয়ে নে।'

'আমাদের লাগবে না, বিশু দস্তুরি আদায় করেছে দুটো ভাঁড়, ওতেই হবে।'

কামিনী হেসে বললে, 'দাদাবাবুর খাওয়া হয়ে গেলে আপনার দিতে বলবো ?'

'বলো।' কামিনী চলে গেল। সুনীল খাওয়া শেষ করে একটা আরামের আওয়াজ করে বললে, 'আঃ, আরাম করে কতদিন পর খেলুম ডবল ! মামণি, এক বোতল বায়রন সোড়া আর কালামুন রাখতে বলে দিও টেবিলে, প্রয়োজন হলে খেতে হবে।'

'থাকবে, তুই হাত ধুয়ে আয়, আমি খেতে চললুম।' আনন্দময়ী ও সুনীল দুজনেই বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে বাড়ীর দরজা সব ঠিকমত বন্ধ কি না দেখে, লাইব্রেরী ঘুরে ফণীবাবু শুয়েছেন না পড়ছেন দেখে আনন্দময়ী নিজের ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন সুনীল উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে শুয়ে আছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে বেড্‌লাইট জ্বেলে বিছানায় শুয়ে সুনীলের পিঠে হাত রাখলেন। সুনীল কান্নার বেগ আর চাপতে পারলো না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। 'কি হলো কি হলো ?' বলে আনন্দময়ী জোর করে তাকে চিৎ করলেন।

সুনীল কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'মামণি, তুমি আমায় বিশ্বাস করো না কেন ? তোমাদের চোখের আড়াল হলে আমি চরিত্রহীন হবো—একথা তুমি কেন ভাবো ? বিদেশে যাওয়ার আগে এই কম বয়সে বিয়ের পাত্রী ঠিক করেছিলে কেন ? (সুনীল উঠে বসে জলভরা চোখে সোজা চাইল উঠে বসা আনন্দময়ীর দিকে) কেন তুমি আমায় এমন অপমান করলে, কি দেখেছ আমার চরিত্রে, যাতে তোমার এত অবিশ্বাস ?…কথা বলছো না কেন ? কতদিন কত রাত্রি আমি যন্ত্রণায় অপমানে ছটফট করেছি এই চিঠির কথা ভেবে তা কি তুমি কল্পনা করতে পারো ?'

সুনীল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। আনন্দময়ী তার কম্পিত দেহ জড়িয়ে ধরে সজল চক্ষে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আমায় ক্ষমা কর্ সুনে, আমায় ক্ষমা কর্। আমার ভুল হয়েছিল, আমার ভুল আমি বুজেচি !'

সুনীল তাড়াতাড়ি তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে, আর্তস্বরে বললে, 'ক্ষমা চেয়ো না মা, ক্ষমা চেয়ো না। তোমার বলাতেই আমার শাস্তি, ক্ষমা চেয়ে আমায় অপরাধী করো না মামণি। বিশ্বাস করো, তোমার অমতে আমি কিছুই করবো না যেখানেই থাকি। তোমাকে ভুলে যাওয়া আর নিজেকে ভুলে যাওয়া একই কথা আমার কাছে। আমার

ওপর ভরসা রাখো মামণি, যেমন বাবা রাখেন। গত দু'মাস আমি যে কি মন যন্ত্রণায় পুড়েছি, তোমায় বোঝাতে পারবো না।'

সুনীলকে কোলের মধ্যে ছোট ছেলের মত টেনে নিয়ে, মাথাটা বুকে চেপে ধরে কান্না ভাঙা গলায় বললেন, 'তোকে কিচুই বোজাতে হবে না, আমি তোর মুখ দেখেই সব বুজেচি। পরীক্ষার পর একবার এলি না আমার বুকে আঘাত দিলি। কত কষ্টে কত অভিমানে নিজেকে পুড়িয়েচিস তা তোর সারা অঙ্গে চোখে মুখে আমি জ্বলন্ত দেখতে পেয়েচি, আমি যে মা। ভুলে যা বাবা, ঘুমো।' তার কপালে চুম্বন করলেন। সুনীলের চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এলো, ঘন নীল শান্তিতে সে তলিয়ে গেল।

॥ ২০ ॥

কলকাতায় প্রভাতের এ্যালাম, করপোরেশানের ময়লা তোলা লোহার চাকাওয়ালা টিন প্লেটের সশব্দ শকটী; আরবি টাট্টু ঘোড়া নিয়মিত বুরুশ ঘসা, বোঁচা ল্যাজ উর্ধ্বমুখী, ঘাড়েরও চুল ছাঁটা, দেখতে ছোট হলেও অশ্বশক্তি ভালই। ঝাঁট শেষ হলে, ময়লা তোলা হলে, গঙ্গার জলের পাইপ হাতে ওড়িয়া পানিদার ছর্—ছর্—ছর্ শব্দে রাস্তা ফুটপাত ধোয়া শুরু করবে। এ সবই নিয়ম মাফিক করতে হয় জমাদারদের তত্ত্বাবধানে। ময়লা বোঝাই গাড়ীগুলোকে বিডন স্ট্রীট সোজা সার্কুলার রোডের পূর্বদিকে দাঁড় করানো রেল ওয়াগনে বোঝাই দিতে হবেই, নচেৎ মুশকিল আছে, ঘুসঘাসে রেহাই নেই। আধা সাহেব ড্রাইভার! সার্কুলার রোডের পূর্বদিক ঘেঁসে ধাপা লাইন। আইনতঃ হাইকোর্টের নাগালের বাইরে চব্বিশ পরগণা এলাকায়। ধাপার রেল দিনে দুবার যাতায়াত করে, জায়গায় জায়গায় মাল তুলে, মানে সহরের আবর্জনা তুলে, শ্যামবাজার থেকে ধাপার মাঠ। কাজেই ঘড়ি ধরে সহরের সব আবর্জনা, পূর্বদিকে লাইন ধরে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছনো চাই। তৎকালীন কলকাতাবাসীরা তাই সার্কুলার রোডের পশ্চিম ফুটপাত পর্যন্ত কলকাতা বলতো, পূর্বদিক পাণ্ডববর্জিত। যেহেতু হাইকোর্ট এলাকার বাইরে। জেলা চব্বিশ পরগণার ঠিকানা।

ভোরে ঘুম ভাঙার বিশেষ সমস্যা নেই, একটি শকটীর আগমনেই সুনীল উঠে বসলো বিছানায়। মামণি আগেই উঠে গেছেন অভ্যাসমত উপাসনা সারতে। সুনীলের বিছানায় শুয়ে চা খাওয়ার অভ্যাস চলে গেছে গত দেড় মাসে। সে উঠে গেল কলঘরে, প্রাতঃকৃত্য শেষ করবে। আজ তার শরীর মন যেন হাওয়ায় ভাসছে। যখন কলঘর থেকে বেরোল, দেখলে মামণি অপেক্ষা করছেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বারান্দায়। 'তুই চা না খেয়ে কলঘরে গেলি, আমার দেরী হলো বুজি?' ক্ষুন্ন মনে বললেন আনন্দময়ী।

'না মামণি, আমার চা খেয়ে ওঠার অভ্যাস চলে গ্যাছে।'

'চল্ ঘরে বসে চা খা।' আনন্দময়ী ট্রে হাতে এগোলেন, সুনীল ঘরে এসে বসলো, ছোট টেবিলে ট্রে রেখে চা করার মন দিলেন আনন্দময়ী। সুনীল বললে, 'তুমি ছাড়ো আমি করে নিতে পারবো।'

'কি যে পারবি না পারবি আমার জানা আছে, তুই বিস্কুট খা আমি চা করে দিচ্চি।' মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলো সুনীল তাঁর স্নেহসিক্ত মুখের দিকে 'কি হলো? বিস্কুট নে, অমন করে চেয়ে আচিস কেন?' আনন্দময়ী চায়ের কাপ আগিয়ে দিয়ে বললেন।

সুনীল বিস্কুট, চায়ের কাপ দু'হাতে নিয়ে মনে মনে বললে, 'মা, তোমার স্নেহপ্লাবী ওই আনন যদি আঁকতে পারতুম ধন্য হয়ে যেতুম।' বিগত দিনের অনুশোচনায় চোখে জল এসে গেল।

সুনীলের মুখ দেখে, কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে আনন্দময়ী বললেন, 'পাগল ছেলে!' তারপর বাইরে একবার ঘুরে এলেন, আর এককাপ চা করে দিয়ে বললেন, 'সুনে, নাপিতকে ডাকতে বলি? তোর চুল বেশী বড় হয়ে গ্যাচে।'

'বলো না মা, জিজ্ঞেস করার কি আছে?' হাসলো সুনীল। আনন্দময়ী বেরিয়ে গেলেন।

সুলেখা ও মণ্টু এসে ঘরে ঢুকলো। সুলেখা ঠাট্টার সুরে বললে, 'মা-বেটায় ভোর থেকে উঠে খাওয়া গল্প চলচে খুব!' সুনীল হেসে বললে, 'হিংসুটে।' মণ্টু বললে, 'সুনেদা, তোমার দৌলতে ক্ষীর রাবড়ি জেকব মিলছে অথচ দিদির হিংসে!'

সুলেখা সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'মায়ের কোলে একরাত কাটিয়েই মুখের চেহারা অনেক পাল্টে নিয়েচো, অবাক!'

সুনীল বললে হেসে, 'তোমরা বারোমাস মায়ের কোলে আছো, তবু আমায় ঈর্ষা? চলে তো যাচ্ছি, এরপর যত খুশী দু'জনে আদর খেও।'

সুলেখার মুখ ভারী হয়ে উঠলো, মণ্টু সুনীলের একটা হাত ধরে জিজ্ঞেস করলে, 'কতদিন থাকবে সুনেদা বিদেশে?'

ওপরের দিকে চেয়ে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সুনীল বললে, 'কে জানে!' বিষাদাচ্ছন্ন মুহূর্ত জমা হলো ঘরে। বিশু এসে বললে, 'দাদাবাবু, নাপিত এসেছে।' সুনীল দু'জনের দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেল। সুলেখা চেয়ারে বসে পড়লো, মণ্টু চলে গেল।

বাইরের বারান্দায় হাতে আয়না নিয়ে সুনীল ব্যতিব্যস্ত, কলকাতার নাপিতকে কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছে না তার চুল সমানভাবে ছোট করা হবে, কলকাতার চালু ফ্যাসানমত থাকযুক্ত হবে না। কাজেই হাতে আয়না নিয়ে পাহারা দিয়ে চুল ছাটাচ্ছে।

খুব ছোট করে চুল ছাটিয়ে নিল স্থনীল, আবার কোথায় কবে কাটা হবে কে জানে। দাড়ি-গোঁফ হাত-পায়ের নখ কেটে সে যেন হাল্কা হয়ে কলঘরের দিকে এগোলো। হাতে তোয়ালে গামছা পাজামা সার্ট নিয়ে আনন্দময়ীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্থনীল বললে, 'তুমি কেন মামণি, কামিনী বিস্তু কোথায় গেল ?'

'তোর পিঠ ঘাড় একটু ঘসে দেবো, যা ময়লা বসিয়ে রেখেছিস সারা গায়ে! চল কলঘরে ওখানে টুল দিয়েচি, বোস।' স্থনীল হতাশ ভঙ্গিতে চারিদিকে চাইলো, তার বেশ জানা আছে ছাড়ান নেই, সে কোনদিন সাবালক হবে না মামণির কাছে। বালতিতে গরম-ঠাণ্ডা মেশানো জল দু-চার মগ গায়ে নিতেই, আনন্দময়ী সাবান লাগিয়ে নিয়ে গামছা ঘষতে শুরু করলেন। সারা শরীর ঘসা শেষ করে বললেন, 'পায়ের দিকটা তুই নিজে ঘসে আর একবার সাবান দিয়ে চান করে নিবি, আমি রান্নাঘরের দিকে যাচ্চি।'

স্থনীল মনে মনে ভাবলে মামণির সবদিকে নজর, সারা সংসারের ঝামেলা নিয়েও আমার ঘাড়ে পিঠে ময়লা তাঁর দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। মামণি ছাড়া কারুরই দিন চলে না হয় তো।

আজ যেন নবজন্ম পেয়ে স্থনীল আনন্দময়ীর পাশে জলখাবারের থালার সামনে বসলো। স্থলেখা এসে জলচৌকিতে সন্দেশের-চেঙাড়ি নিয়ে বসে। তার দিকে স্থনীল চাইলো : কি যেন বদল হয়েছে, তার চোখে মুখে অবয়বে দেহাংশের গঠনসৌষ্ঠব আকর্ষী হয়ে উঠেছে। এক বছরের মধ্যে যেন বিকশিত কুঁড়ি। মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় আগেই সাবালকত্ব পেয়ে যায়। এবারে মনে হচ্ছে প্রজাপতির চঞ্চলতা নেই, মৌন গম্ভীর করে তুলেছে। তার কিছু না বলার ব্যঞ্জনা স্থনীলের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, সে তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আনন্দময়ী বললেন, 'নে, আরম্ভ কর!'

'তুমি আগে আরম্ভ করবে তো ?' হেসে বললে স্থনীল।

'ফাজিল কোথাকার!' আনন্দময়ী খাওয়া শুরু করলেন, পরে স্থনীলও। খেতে খেতে স্থনীল বললে, 'মামণি, আমি কাল সকালে একবার স্থপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

আনন্দময়ী চোখ পাকিয়ে বললন, 'না, একদিন-দুদিন তুমি বাড়ীর বাইরে যেতে পাবে না, যদি যেতেই হয় কাল বিকেলে যেও।'

'সে কি মামণি, কাল আমার পাটনা ফেরার কথা।' অবাক হয়ে বললে স্থনীল। আনন্দময়ী হেসে বললেন, 'সে কথা ভুলে যাও।' ব্যস্ত হয়ে স্থনীল বললে, 'বাবাকে যে আগেই জানিয়ে দিয়েছি মামণি।'

'তোমার বাবা কাল কি পরশু জেঠুর চিঠি পেয়ে যাবেন তাঁর উত্তর এলে তবেই তোমার পাটনা যাওয়া।' সুনীলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'আঃ মামণি, সোনামণি কি ভালই না লাগছে, আঃ…।

॥ ২১ ॥

চার দিন কেটে গেল। সুনীলের শরীরের অনেক উন্নতি চোখে পড়ার মত। আনন্দময়ীর স্বাস্থ্যবিধি আর অনন্য স্নেহদৃষ্টিতে নতুন মায়াজালে সে আচ্ছন্ন। তার খামখেয়ালীপনা যাদুমন্ত্রে লুপ্ত, রাগ অভিমান কোনদিন হয়েছিল সে কথা মনেই পড়ে না। সুলেখার ছাড়া ছাড়া ব্যবহারও তার মনে কোন রেখাপাত করতে পাচ্ছে না। বাড়ীর বাইরে বেরোবার কোন আগ্রহই নেই, মামণির ধারে কাছে থাকলেই নিশ্চিন্ত। এমন কি হেদোর ধারে বেড়াবারও তাগিদ নেই, শুধু গতকাল সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। মামণির এটাও নজর এড়ায়নি যে, সুলেখার সঙ্গে আগেকার মত গল্পগুজব খেলাধুলা, খুনসুটি এবারে নেই। কাল তো জিজ্ঞেস করেই বসলেন, 'হ্যা রে সুলেখা, সুনের সঙ্গে তোর ঝগড়াঝাটি হয়েছে নাকি? কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব?' এ কথায় দুজনেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সুলেখা বলেছিল, 'ঝগড়া হবে কেন? কি যে বল মা!'

সুনীল দেখলো মামণি দুজনের দিকে ভালভাবে চাইলেন। তারপর হেসে বললেন, 'দুজনেই পাশ-টাশ করে এখন ভারীক্কি হয়ে গেছিস, আর ছেলেমানুষী নেই, না?' আনন্দময়ী চলে গেলেন।

সুলেখা ম্লান হাসি হেসেছিল সুনীলের দিকে চেয়ে। যেন অপরিচিতা মহিলা। সে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার শরীর এখন কেমন লাগছে, ঠিক হয়েছে না?' ছোট্ট উত্তর দিয়েছিল সুনীল, 'খুব ঠিক।' ভাবলো, হঠাৎ ও তো এবারে একবারও 'সুনেদা' বলে ডাকেনি। তোমার চা-টা নিয়ে আসি বলে বেরিয়ে গেছলো।

আশ্চর্য লাগে সুনীলের মামণির নিরীক্ষার কথা ভেবে। সারা বাড়ীর সকলের ওপর মায় লোকজন ঠাকুর চাকর সকলের প্রতি। কারুরই সুবিধা-অসুবিধা তাঁর নজর এড়ায় না। বাইরে কোন কিছুতে তাঁর আগ্রহ নেই এই সংসারটি ওঁর জগৎ। এমন কদাচিৎ দেখা যায়, নিখাদ স্নেহ-প্রবণ মাতৃসত্তা। এ সংসারের কেন্দ্রবিন্দু। সুনীলের একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায় মনে, আত্মভোলা বইয়ের পোকা জেঠুবাবুর প্রত্যাশা কতটা পূরণ সম্ভবপর হয়? জেঠুবাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই ডাক এলো লাইব্রেরী থেকে। সুলেখা এসে বললে, 'চলো, বাবা ডাকচেন।' মুখে বিষণ্ণ হাসি।

অনিচ্ছায় সুনীলের হাসি আসে না। সোজা বললে, 'যাচ্ছি।' লাইব্রেরী ঘরে

গিয়ে দেখলে, মামণি হেলান দিয়ে চেয়ারে শুয়ে, জেঠুবাবু ডিভানে আধশোয়া একটি চিঠি হাতে। সুনীলকে দেখে বললেন, 'তোমার বাবার চিঠি এসেচে পড়ে দিচ্ছি শোন, 'প্রিয় ফণীদা, তোমার পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ অদ্য সুনীলের পাটনায় পৌছাইবার চিঠি পাইয়াছিলাম, না আসায় চিন্তিত হইয়া পড়ি। তোমার পত্র দ্বিপ্রহরে পাইয়া খুবই সুখী হইলাম। সুনীল তোমাদের কাছে গিয়াছে জানিয়া আরো নিশ্চিন্ত হইলাম। হাওড়ায় নামিবে ওড়িষ্যা হইতে অথচ তোমাদের সহিত দেখা করিবে না ইহা কি প্রকার, চিন্তায় আসে নাই। বৌঠানের কথা ভাবিয়া মর্মাহত হইয়া ছিলাম! তুমি লিখিয়াছ, দেশ ভ্রমণের ফলে অনিয়মের ফলে সুনীলের শরীর খারাপ মনে হইতেছে, ক্লান্ত দেখাইতেছে, কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া পাটনা ফিরিলে বৌঠান খুবই সুখী হইবেন। ইহাতে আমার আপত্তি থাকিতেই পারে না। ২রা জুলাই সুনীল ও মিস্ লিলির জাহাজের টিকিট কাটা হইয়াছে; আমার পরিচিত মিশনের অভিজ্ঞ সাধু মহারাজ ও মিস্ লিলি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কর্ম সমাধা করিয়া রাখিয়াছেন। পাটনা হইতে এলাহাবাদ হইয়া বোম্বাই মেলে একটি কুপে রিজার্ভ করা সহজ হইবে, এইজন্য পাটনা হইতে বোম্বাই যাওয়া সুবিধার হইবে। শুধু তোমাদের সহিত বিদেশ যাত্রার সময় দেখা হইবে না সুনীলের ইহাই দুঃখের। যাহা হউক সকল দিক দেখিয়া ও অভিজ্ঞ দুইজনের পরামর্শমত রাজী হইলাম, তোমাদের অমত থাকিলে জানাইও। আর একটি অনুরোধ, তোমাদের কাছে যতদিন সম্ভব থাকিয়া সুনীল আমার কাছে কয়েকদিন থাকুক ইহাই মনের ইচ্ছা। বোম্বাই একদিন আগে পৌছান দরকার, কিছু জামা পোষাক কিনিতে হইবে। এই সব ভাবিয়া সুনীলকে সুবধামত পাটনা পাঠাইলেই চলিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিও। কনিষ্ঠদের আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাইও। ইতি তোমাদের শচীন।

চিঠি পড়া শেষের সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা থমথমে হয়ে উঠলো, আনন্দময়ী ফণীবাবু সুলেখা সুনীল কারুরই মুখে কোন কথা নেই, শেষে ফণীবাবু হিসাব করে বললেন, 'আরো দিন সাত থাকো, তারপর পাটনা রওনা দিও।'

সুনীল নতমুখে বললে, 'আচ্ছা জেঠুবাবু।' বলেই কোনদিকে না চেয়ে ধীর পদে বেরিয়ে গেল।

॥ ২২ ॥

ফণীবাবুর বাড়ীর নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় ব্যতিক্রম হয়েছে। সুনীলের বিদায় পর্ব আর ফণীবাবুর স্বদেশ চিন্তা, দুটোই আনন্দময়ীর স্নেহপ্রবণ চরিত্রে আবিলতা সৃষ্টির পক্ষে

যথেষ্ট। শান্তিপ্রিয়, আত্মতুষ্ট এই পুরোনো পারিবারিক জীবনযাত্রার মধ্যে সামান্ত হেরফের সামলে নেওয়ার অভ্যাস নেই; বিষাদাচ্ছন্ন করে তোলে সকলকে। সুনীল মামণিকে এড়িয়ে জেঠুবাবুর কাছে বসে বেশী। গতকাল ইউরোপের কোথায় কোন প্রসিদ্ধ শিল্পকলা, কারা বা কে করেছিল, সেই সব বলতে বলতে একটা কথা বলেছিলেন, 'মাস্টার' ভালই হচ্ছে তুমি ভারতে থাকবে না ১৯৩০ সালে।' সুনীল কেন জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়েছে পার্কসার্কাস সম্মেলনে ডিসেম্বরে। এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না পেলে আমাদের সারা দেশ জুড়ে পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে নামতে হবে। জহরলাল, সুভাষ এবারেই পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। মতিলালজী আর গান্ধীজী কোন রকমে ঠেকিয়েচেন।'

সুনীল অবাক হয়ে তাকিয়েছিল জেঠুবাবুর দিকে। সে এতদিনেও জানতো না যে জেঠুবাবু কংগ্রেস নিয়ে উৎসাহী। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি আন্দোলনে যোগ দেবেন নাকি?'

'দরকার হলে দিতেই হবে। তুমি কি শোননি, একুশের আন্দোলনে আমি জেল খেটে এসেছি?' ফণীবাবু বললেন।

সুনীল জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু বাড়ী সংসার?'

'তোমার মামণিই যথেষ্ট, আমি কি কিছু করি নাকি?' হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমার বাবাও চম্পারণ হাঙ্গামায় নীল চাষীদের জন্যে কোর্টে খুব লড়াই করেন। সরকার জেল দেবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি আইনের ফাঁকে। তখন তোমার মা বেঁচে। যাক ওসব কথা। এখন তোমাকে কটা কথা বলে রাখি—বিদেশে যাচ্ছ, দেশের সম্মান যেন কোন কারণে ক্ষুণ্ণ করো না; তোমার কর্মে ভারতীয়দের প্রতি বিদেশীদের অবজ্ঞা বা ঘৃণা না জন্মায়। বড় আর্টিস্ট হবে কি ছোট আর্টিস্ট হবে, সেটা বড় কথা নয়, সেটা দৈব নির্ভর, তোমার নিজের নির্ভর রাখবে অনুশীলনে, কর্মে ও শিক্ষায়, এই কথা কটি মনে রেখো।'

সেদিনের কথাগুলি সুনীলের মনে গাঁথা হয়ে গেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে। ইজিচেয়ারে শুয়ে সকাল থেকে এই সব কথা আরো নানা কথা ভেবেই চলেছে। বিদেশ যাওয়ার উৎসাহ এক এক সময়ে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রয়োজন, মামণির প্রয়োজন, কোন প্রয়োজনই সে মেটাতে পারবে না। অবাক হচ্ছে মামণির আত্মশক্তি ও সাহসের কথা ভেবে। আজ রাত্রে পাটনা রওনা হবে মনে পড়ায় দমে গেল। সুলেখা ঠাট্টার সুরে বললে, 'ভাগ্যটা করেছিলে বটে! কোন ভোর থেকে বড় বেটার জন্যে খাস্তা কচুরী, নিমকী, গজা বানানো হয়ে গেল, নিয়ে আসচেন।'

'ঈর্ষায় আত্মহত্যা করে বসো না।' হেসে বললে স্নীল।

'বয়ে গ্যাচে!' কলা দেখিয়ে চায়ের পটে চামচ নাড়লো স্লেখা। স্নীল তার দিকে হাসি মুখে চেয়ে রইল। হাতে খাবারের বড় থালা নিয়ে সঙ্গে কামিনী জল আর ছোট একটা রেকাবীতে সন্দেশ নিয়ে ঢুকলো। আনন্দময়ী দু'জনের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি রে, চুপচাপ বসে আচিস যে?'

'আর কি করি মামণি, এইমাত্র স্লেখা হিংসে করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করলো।'

'মিথ্যে কথা বলো না বলচি,' রাগের স্বরে বললে স্লেখা।

'এইমাত্র বলনি, বড় বেটার জন্যে ভোর থেকে মা খাটচেন খাস্তা কচুরী ইত্যাদি ইত্যাদি!'

আনন্দময়ী বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'খাটা আর কি, আজ তো চলে যাবি, কবে যে আবার আসবি তার ঠিক নেই। আস্তে আস্তে খেয়ে নে গরম গরম।' তার গলা ভেঙে গেল। তিনি সামনের চেয়ারে বসলেন। স্নীলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, স্লেখার মুখও ভারী হয়ে উঠলো। স্নীল বললে, 'এতগুলো সব খেতে পারবো না।'

'যা পারবি রেকাবিতে তুলে খা।' স্নীল খেতে শুরু করলে। আনন্দময়ী তার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর যা কিছু ময়লা ছিল ধোবার বাড়ী থেকে আনিয়ে তোর ঘরে রেখে দিয়েচে বিশু; হোওঅলও কামিনী কেচে রেখেচে।'

'আমাকেও তো কেচে দিয়েছ মামণি ক'দিন!'

'যা, ফাজিল কোথাকার!' একটু ম্লান হেসে আনন্দময়ী বললেন। স্লেখার দিকে চেয়ে বললেন, 'দুপুরে স্নীলের জিনিসগুলো গুচিয়ে দিস মা, আমি ওর ট্রেনের খাবার ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকবো।' আবার তাঁর গলা ভেঙে গেল। স্লেখা স্নীল কারুরই কাছে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য চাপা রইলো না। যা পারে তার চেয়ে বেশী খেলো স্নীল মামণিকে খুশী করার জন্যে। চায়ের পটে হাত দিয়ে আনন্দময়ী বললেন, 'একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে?'

স্নীল হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'ঠিক আছে।' কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিলে, তারপর বললে, 'আমি একবার স্প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে আসি মামণি?'

'যা, দেরী করিস না।'

॥ ২৩ ॥

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। আনন্দময়ী বিশ্রাম করছেন, স্নীল ফণীবাবুর সঙ্গে গল্প করছে। কাজের লোকরাও বিশ্রাম নিচ্ছে। এ সময়ে রাস্তাও নিঃশব্দ থাকে। সাড়ে তিনটে

বাজলেই থালা-বাসন বিক্রয়াভিলাষী কাঁসারীর কাংস্যধ্বনির আগে, কোন শব্দ সম্ভাবনা থাকে না পাড়ায়। কাঁসীর শব্দই, বৈকালী সঙ্কেত প্রতিবেশীদের। সুলেখা এলো সুনীলের ঘরে গোছানোর জন্যে। কদিন সে যেন আবিষ্ট হয়ে আছে। সুনীলের নীরবতা তাকে বিচলিত করে তুলেছে। আগের বারের বিদায় স্মৃতি, সুনীলের ভুলে যাওয়ার উপদেশ, নিরর্থক মনে হচ্ছে। বলে দিতে ইচ্ছে করছে, আমি তোমার কোন কথা মানি না, মানবো না। নিজেকে বিবর্জিত করে, নানা অনুকল্প তোমার থাকতে পারে, তুমি ভুলতে পারো। আমার সীমিত নারীজীবনে সম্ভব নয়। টুকরো টুকরো ঘটনার জালে বোনা, তোমার আমার দীর্ঘ যোগসূত্র ছিঁড়বো বললেই কি ছেঁড়া যায়? সুলেখা সুনীলের সুটকেশটা খুললো, সেখানে স্কেচ খাতা, স্কেচ করা কাগজ, তার নীচে আড়ালে অযত্নে মানিব্যাগ সব আগোছালো পড়ে। কি করে গোছাবে ভেবেই পাচ্ছে না। দেখতে দেখতে একটা স্কেচের ওপর নজর পড়লো। ইস্, ঐ ছবিও আঁকা হয়েচে! তার চোখ নাক কান গরম হয়ে উঠলো, ছবিটা রেখে দিতে গিয়েও রাখতে পারলে না, কি নিখুঁত ভঙ্গিমার মৈথুনচিত্র, কি জীবন্ত অঙ্গসৌষ্ঠব! তন্ময় হয়ে কতক্ষণ ছিল জানে না, হঠাৎ পেছনে নিঃশ্বাসের শব্দে ফিরে দেখে সুনীল। সঙ্কোচহীন কণ্ঠে সে বলে উঠলো, 'ওটা কোনার্ক মন্দিরে আছে, পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তাই না?' সুলেখার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

সুনীল দেখলো, সূর্যাস্তের রঙ ফুটে উঠেছে সুলেখার মুখে; অনুপম সুষমায় ভরা তার মুখশ্রী। এ-মুখ তো সে ইতিপূর্বে কোনদিন দেখেনি? আত্মবিস্মৃত হয়ে সে দুহাতে সুলেখার মুখ তুলে ধরে তার কম্পিত ওষ্ঠাধরে চুম্বন এঁকে দিল। পরক্ষণেই সংবিত ফিরে পেয়ে বলে উঠলো, 'আমায় ক্ষমা করো, ক্ষমা করো সুলেখা!'

সুলেখা সুনীলের দিকে স্বপ্নাতুর চোখে চেয়ে, হঠাৎ দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে মৃদু-স্বরে বললে, 'ক্ষমা কেন? কেন চাইচো ক্ষমা? কি এমন অন্যায় করেচে।' বলে বাধা কাটিয়ে মাথাটা টেনে নিয়ে, গভীরভাবে চুম্বন করলো সুনীলকে। সিঁড়িতে শব্দ হতে তারা সরে দাঁড়ালো। তৃপ্তির আনন্দে তাদের মুখ দুটো জল্ জল্ করছে। প্রণয়ের প্রথম চুম্বন। তাতে এত সুখানুভূতি, তাদের কল্পনাতীত। গত এক বছরের জমে ওঠা মানসিক অতুষ্টিতে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে শান্তি প্রলেপ। ন্যায়, অন্যায় নীতিকথা, সবই লোপ পায় অনিরুদ্ধ আকর্ষণে। বিশু এসে বললে, 'বেডিং বেঁধে রাখি, কি ভাবে হবে দাদাবাবু?'

সুনীল তাকে দেখাতে লাগলো কোনটার পর কি রাখবে বাঁধার সময়। আনন্দময়ীর গলা পাওয়া গেল, 'চা নিয়ে যা সুলেখা।'

সুলেখা নীচে গিয়ে চায়ের ট্রে নিয়ে উঠে এলো, বাঁধা শেষে বিশু নেমে গেল। সুলেখা চা করায় মন দিলে, সুনীল মাথা নীচু করে বসে রইলো। কেউ কারুর দিকে চাইতে পারছে না। চা তৈরি করে দেয়ালের দিকে চেয়ে সুলেখা নিম্নস্বরে বললে, 'চা খাও।' সুনীল হাত বাড়িয়ে কাপ নিলে। দু'জনে চা নিয়ে বসলো বটে সামনা-সামনি চেয়ারে, কিন্তু দু'জনেই নতনেত্র, কথায় মন ভরা, কিন্তু মুখ ফুটছে না। শুধু চকিত চাউনি চালাচালি, দু'জনের মুখই লালচে স্বেদাক্ত। কম বয়সের গুণে কি দোষে, হবে হয়তো। চা শেষ করে, সুনীলকে আর এককাপ চা ঢেলে দিয়ে সুলেখা বললে, 'সুটকেশটা কিভাবে গোচাবো?'

'যেভাবে তোমার খুশী, শুধু মানিব্যাগটা ওপরে রেখো।' বলে সুনীল হেলান দিয়ে চোখ বুজলো।

সুলেখার কাজ শেষ হতে, চাবির রিংটা সুনীলের হাতে দিয়ে বললে, 'সময় হয়ে এলো, চান সেরে তোমায় রেডি হতে হবে।' সুনীল এতক্ষণে সুলেখার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে উঠে দাঁড়ালো। সুলেখা এগিয়ে তার দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, অনুনয় ভরাকণ্ঠে বললে, 'আমায় ভুলে যেও না সুনীল, আমি তোমায় ভুলতে পারবো না। বলে রাখচি, দরকার হলে আজীবন প্রতীক্ষায় থাকবো।'

সুনীল নীরবে চেয়ে রইলো তার দিকে, চোখ জলে ভরে এলো। সুলেখা চট করে আঁচল তুলে সুনীলের ও নিজের চোখ মুছে নিলো, বললে, 'শক্ত হও, মাকে সামলাও, নীচে চলো।'

বাড়ীতে আজ বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশ। সুনীলের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সম্ভাবনা সকলের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। নির্বিরোধী মিষ্টি স্বভাবের সুনীল সকলেরই প্রিয়পাত্র। আনন্দময়ী আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাচ্ছেন। সুলেখা বারেবারে মায়ের মুখের দিকে চাইছে এমনকি ফণীবাবুরও লক্ষ্য করছেন আনন্দময়ীকে। খাওয়া সেরে সুনীল দোতলায় পোষাক পাল্টাতে গেল। আনন্দময়ী আসন পেতে উপাসনায় বসলেন। সকলেরই আসন্ন বিদায় মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। অনুরাগ রঞ্জিত সুলেখার চোখ বারে-বারে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সকলের দৃষ্টিকে এড়িয়ে সে সামলে নিচ্ছে। সুনীলের মনোমত সেজেও নিয়েছে শাড়ী পাল্টে, আজকের মিলনের আনন্দ সে জিইয়ে রেখেছে মুখে তৃপ্তির হাসিতে। ভাবনা তার মাকে নিয়ে, বাৎসল্য আবেগে পরিপূর্ণ আনন্দময়ীর মনটিকে সুলেখা শৈশব থেকে চেনে, তার চেষ্টা সুনীলের বিদায় পর্ব কি করে সুসহ করা যায়।

বিদায়ের সময় ফণীবাবুকে প্রণাম করে সুনীল আস্তে আস্তে এগোল আনন্দময়ীর দিকে। তাঁর পায়ে হাত দিতে তিনি দু'হাত তুলে স্নেহালিঙ্গনে চেপে ধরলেন, কপালে

মাথায় চুম্বন করলেন, টপটপ চোখের জল লাগল কপালে মাথায়, পড়লো মাটিতে। ভাঙা গলায় বললেন, 'সাবধানে থেকো, তোমার মঙ্গল হোক।' আর কিছু গলা দিয়ে বেরোল না, মুখে আঁচল চাপা দিলেন।

মণ্টু এসে প্রণাম করলো। সুলেখা এসে প্রণাম করলে, বাধা দেওয়া সম্ভব হলো না। সুলেখার হাসি হাসি মুখ দেখে তাকেও ম্লান হাসি হাসতে হলো। সকলের দিকে চেয়ে গেটের দিকে এগোলো, গাড়ীতে উঠে হাত বাড়িয়ে বিদায় জানালে গাড়ী চলতে শুরু করলো। সে চোখ বুজলো, এবার সুনীল বিষণ্ণ, বিদায়বেদনা কাতর নিশ্চয়ই, কিন্তু গতবারের মত অসহনীয় নয়।

॥ ২৪ ॥

পাটনার বাড়ীতে পৌঁছে বাড়ী ঢোকার সময়ই বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখে শচীনবাবু বললেন, 'শরীর ভাল তো? কেমন বেড়ানো হলো, সুপ্রকাশ ভাল আছে?'

সুনীল হেসে বললে, 'সব ভাল, অনেক দেখেছি, ঘোরাঘুরিতে আমার শরীর একটু ক্লান্ত হয়েছিল, সুপ্রকাশ ঠিক ছিল।'

কলকাতার খবর, ফণীদা, বৌঠান, সুলেখা, মণ্টু সকলে?' 'ভালই আছেন।'

'তুমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছ জেনে তোমার মাস্টার-মশাই, আন্টি সকলেই খুশী। এখন মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনে পড়লেই হতো। আঁকা, লেখাপড়া দুই চলতো।

সুনীল বললে তাড়াতাড়ি, 'পারী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলাশিক্ষার কেন্দ্র।'

'ঠিকই, কিন্তু তুমি একা সবদিক সামলে বিদেশে থাকতে পারবে কি না, সেই ভাবনা আর কি?' শচীনবাবুর কপালে কুঞ্চন দেখা দিল।

'খুব পারবো বাবা, প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতে পারে, তবে না পারার কি আছে?' সুনীল বললে বাবার দিকে ভালভাবে চেয়ে। তার চোখে পড়লো বাবা যেন এই দু'মাসে রোগা শুকনো হয়ে গেছেন। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, 'বাবা, তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছিল?'

শচীনবাবু উদাসভাবে বললেন, 'ডাক্তারবাবু তেল ঘি বন্ধ করে খাওয়াদাওয়ার ধরকাট করে দিয়েছেন, রক্তে কি যেন বেড়েছে সেটা কমাতে হবে, এমনি শরীর ভালই আছে।' সুনীল ম্লান গম্ভীর হয়ে গেল; শচীনবাবু তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ও নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। এখন ভেতরে যাও, রামু ভেতরে গ্যাচে তোমার মালপত্তর নিয়ে। যাও, বিশ্রাম করো ট্রেনজার্নি করেছ।'

সুনীল বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের কথা। তার বিদেশ যাত্রা নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তার কারণে শরীর ভাঙলো না তো? রামুদার কাছে শুনলো কিছুই প্রায় খাচ্ছেন না, শুকনো রুটি মাছের ঝোল ভাত সামান্য দুধ ফল মামণির পাঠানো খাবার থেকে মাত্র একটা সন্দেশ খেয়েছেন। এত খাওয়ার বাঁধাধরা কি কারণে হতে পারে সুনীল ভেবে পাচ্ছে না। রাত্রের খাওয়া সেরে সে বাবার শোবার ঘরে গেল। দেখলে বাবা শুয়ে আছেন। সে কাছে গিয়ে বললে, 'বাবা, শরীর কি খারাপ লাগছে?'

'না, এমনি শুয়ে আছি, বসো।' সুনীল বাবার কাছ ঘেঁসে বসলো। শচীনবাবু বললেন, 'তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবো।'

'সুনীল বললে, 'বাবা, আমি পারী যাবো না, টিকিট ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করুন। আপনার শরীর ঠিক নেই; আমি চলে যাবো এ হয় না।'

শচীনবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছো? রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগ অনেকেরই ধরকাট করলে ঠিক হয়ে যায়, এ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না।' তার গায়ে হাত রেখে শচীনবাবু বললেন, 'একটা ব্যাপারে তোমার মতামত চাই, মন দিয়ে শোন। আমি স্থির করেছি, তুমি পারী যাওয়ার পর আমি পাটনায় আর থাকবো না, কলকাতা চলে যাবো, আলিপুর কোর্টে বেরোব। কলকাতার বাড়ির পুরো দোতলা খালি পাবো, ভাড়াটিয়ারা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে, শঙ্করদার এটর্নি অফিসে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সুনীল বললে, 'আমি তো অনেক আগেই বলেছিলাম বাবা একা একা এখানে না থেকে কলকাতা চলো।'

'দেখ সুনীল, একটা সমস্যা হচ্ছে আমার এই কাজের লোকজন যখন জানবে আমি চলে যাবো তখন। তাদের চাকুরী যাবে, বাসস্থান যাবে, এইটে আমাকে ভাবিয়েছে। ছোট থেকে কতদিন তারা আমার কাছে, এদের একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে শান্তি পাব না।'

সুনীল বললে, 'বাবা, আমরা তাদের থাকার সমস্যা মেটাতে পারি।' শচীনবাবু উঠে বসে বললেন, 'কি ভাবে?'

'তারা যে যেখানে আছে সেইখানেই থাকুক। এত জমি আর পাশের ব্যারাকবাড়ী আমাদের কি কাজে লাগবে, ওই দিকটা ওদের দিয়ে দিন। আপনার মনেও শান্তি পাবেন, এতদিন সব আছে।'

'এতে তোমার আর্থিক ক্ষতি হবে ভবিষ্যতে সে কথা ভেবে বলছো?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'আমি তাহলে দলিল করে এদের দিয়ে দিতে পারি ?'

'নিশ্চয়, যে দিন মনে করবেন।'

'তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে, ঠাকুর তোমার মঙ্গল করবেন।' শচীনবাবু একটা নিঃশ্বাস নিলেন পরে বললেন, 'তোমার পারীতে শিক্ষার ব্যবস্থা, থাকা খাওয়া সব ব্যবস্থা মিস্ লিলি করে রেখেছেন।'

'আমি পারী যাব না বাবা, আমার ইচ্ছে করছে না।'

'না, সে হয় না স্নীল, আমি চাই তুমি উচ্চশিক্ষিত হয়ে দেশে ফেরো ; এখনও এখানে বিদেশী ডিগরীর মূল্য অনেক বেশী, সম্মানও বেশী ; তুমি কাল মিস্ লিলির সঙ্গে দেখা করে কি কি প্রয়োজন সব ভাল করে জেনে নেবে। দোমনা হয়ো না, আমার জন্যে চিন্তা নেই। আমি রামুকে নিয়ে কলকাতায় থাকবো, তোমার চিন্তা করার কারণ নেই, ওখানে আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই তো রয়েছেন। তোমারই বরং প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধা হবে। যাও রাত হলো শুতে যাও, আমিও শুয়ে পড়বো, রামুকে মশারী ফেলে দিতে বলো।' স্নীল ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

পারী সহরের সীমানা ছাড়িয়ে বড় বড় পুষ্পিত গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তার পাশে হ্যামলিট, মানে ক্ষুদ্র গ্রাম। পারী থেকে দশ মাইল হবে, সহরের কোন চিহ্ন মেলে না। মিস্ লিলির কটেজ, বেড়া গাছে ঘেরা ছোট্ট বাগানের এক কোণে কাটা গাছের গুঁড়ির আসনে বসে সুনীল। দীর্ঘদিনের সমুদ্র যাত্রায় জাহাজের দোলা এখনও তার শরীরে জড়িয়ে রয়েছে। সামান্য ট্রেন আর বাস যাত্রা তার মনেই নেই। এক মাসের মত সমুদ্র আর আকাশ। মনটা সীসের মত ভারী হয়ে আছে।

লিলি আন্টির তত্ত্বাবধানে ভারত থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাপথে মনোযোগ দেওয়ার কোন সুযোগ দেননি আন্টি। সে যেন নাবালক ছেলে; চারিদিক দেখো, সময়মত খাও দাও, ঘুমোও। এই বয়সে কি কর্মক্ষমতা আর আত্মনির্ভরতা; ফরাসী জাহাজে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আন্টি যেন দেশের মাটিতে দাঁড়ালো। চলায় বলায় ভাষায় যেন মানুষ বদলে গেল। সুনীল বিস্ময়ে হতবাক্। জাহাজ যাত্রায় তার মনে খালি, বিদায় বেলায় বাবার মুখ ভেসে উঠেছে আর মাঝে মাঝে সুলেখার মুখ আর কথা, আমায় ভুলে যেও না সুনীল, দরকার হলে আমি সারাজীবন প্রতীক্ষায় থাকবো। সুলেখার অনুনয়, কান্নায় ভরা কণ্ঠস্বর সে যেন শুনতে পাচ্ছিল জলের শব্দে। এ্যাপরণ জড়ানো আন্টি হাতে কফির কাপ নিয়ে এসে বললেন, ফরাসী ভাষায় সাবধানে আস্তে, বোঝানোর জন্যে, 'কি এত ভাবছ সন্ সকাল থেকে? নাও, কফি খাও।' তার দিকে চেয়ে একটু হেসে, গেলেন কটেজের দিকে।

পাটনা থেকে চিঠি লিখে টাকা পাঠিয়ে ধীরে ধীরে ভাইকে দিয়ে কটেজটি, বাগান মায় কিচেন গার্ডেনের ব্যবস্থা করিয়েছেন। কড়ার আছে, তাঁর মৃত্যুর পর সেই ভাই-ই পাবে কটেজটি। দু'খানি বড় ঘর সঙ্গে বাথরুম, একটি খাবার বসার যুক্ত ঘর, দুদিকে বারান্দা, পেছনে ভাঁড়ার ঘর, রান্নার জায়গা; উঠান পাঁচিল ঘেরা, তার মধ্যে কাপড় কাচার, ইস্তিরি করার ব্যবস্থা। কটেজের নীচে মাটির তলায় ছোট কুঠরিঘর, দেশী প্রথা মাফিক মদের গুদাম বা বিপদে আশ্রয়, যে-কোন কাজে লাগতে পারে। মাথার ওপর লাল টালি চার চালা, বরফ জমতে না পারে সেই মত কায়দায় ঢালু। চারিদিকে ফুল

গাছের কেয়ারি করা বাগান। মাঝে পেছন দিকে কিচেন গার্ডেনের ব্যবস্থা, একপাশে পশু মুরগী রাখার জাল ঘেরা জায়গা। সুনীল এঁদের হ্যামলিটের সর্বত্র সৌন্দর্য মনোজ্ঞতা দেখে মুগ্ধ। এঁরা কেউই বড়লোক নয়, অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিবার। চাষ আবাদই প্রধান উপজীব্য।

সুনীল চারিদিকে চেয়ে মনটা হালকা করার চেষ্টা করলো। শৃঙ্খলাপ্রীতি যেন জন্মগত। ভারতীয় বিশৃঙ্খলা ভেবে সে দুঃখিত হয়ে পড়ে। সৌন্দর্যবোধের অভাব, পীড়াদায়ক ব্যক্তি জীবনেও, এখানে সমবায়িক সৌন্দর্যপ্রীতি জগতে তুলনাহীন। গতকাল রাত্রে আন্টি অনেক গল্প করলেন, তাঁদের পূর্বপুরুষদের কথা। এই হ্যামলিটে যাঁরা বাস করছেন সকলেই তাঁর জ্ঞাতি। ফরাসী বিপ্লবের সময় তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এই তল্লাটে অনেক খালি জমি দখল করে বসতি স্থাপন করেন, ধারে পাশে অনেকগুলি হ্যামলিট তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বসবাস। তাঁর জমিটি তাঁর বাবার জমির অংশ। পাশাপাশি তিন ভাইও বাস করেন। তাঁরা পেশায় পেন্টার, আর্টিস্ট। বাবার মৃত্যুর পর আপোষে ভাগাভাগি হয়েছিল। আমরা সকলেই প্রথমে বাবার কাছে অঙ্কনবিদ্যা শিখি, পরে আকাডেমিতে। বিপ্লবের মন্ত্র, 'লির্বাত্রে, এগালিতে, ফ্রেতারনিতে,' ফরাসী জাতিকে মুক্ত মানসিকতা ও সমাজজীবনে সামবায়িক মন-বিকাশের অনেক সাহায্য করেছে সুনীলের মনে হলো, যা ভারতের মাটিতে দুর্লভ।

গতকাল সারাদিন পাশাপাশি নারী-পুরুষ কতজন এসে এসে তাকে সরল হাসিমুখে আতিথেয়তা জানিয়ে গেল, যেন কত আপনার লোক। এঁদের কাছে মানুষ প্রধান, কি বা কে, কোথাকার, সে প্রশ্ন অবান্তর। ভেঙে পড়া সুনীলের মন এই দেখে সাহস পাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই এই নির্বাসিত জীবনের অবসান হয়ে যাবে ভরসা হচ্ছে। গেট ঠেলে একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে, তার সামনে এসে হাত মুখ নেড়ে, 'মঁশিয়ে মঁশিয়ে,' কত কি যে বলে গেল, সুনীল তার বিন্দুবিসর্গ না বুঝে শুধু তাদের ছোট ছোট হাত দুটো ধরে নাড়া দিয়ে হাসতে লাগলো, তারা তাতেই খুশী হাসির জোয়ার জাগিয়ে কলকলিয়ে বেরিয়ে গেল। সুনীল মনে মনে ছবি আঁকছে এসবের। তাদের সকলের পিঠে স্কুলের ব্যাগ, রাস্তায় যেতে যেতে হাত নেড়ে বিদায় জানানোর কি ঘটা। এত মিষ্টি লাগলো সুনীলের, সেই দিকে চেয়ে রইলো।

মিস্ লিলি এসে বললেন, 'সোনীল, লান্চ খেতে চলো, তোমার কি খিদে পাচ্ছে না এখানে ?'

'কেন ? খিদে তো ভালই হচ্ছে আন্টি !'

কটিজের দিকে যেতে যেতে মিস্ লিলি বললেন, 'এখানে জল-বেশী খেও না, দরকার

হলে দুধ খাবে। কারণ তুমি তো লিকার খাও না, দুধেই জলের কাজ করবে। খাওয়ার বা পেটের কোন অসুবিধা হলে আমায় জানিও, প্রথম প্রথম একটু এদিক ওদিক হতে পারে।'

খাবার ঘরে টেবিলে সব সাজানো। দুজনের দুটি বড় প্লেট, প্রত্যেক প্লেটের দুপাশে ছুরি, কাটা, চামচ, নিয়মমত রাখা; ন্যাপকিন পাট করা গ্লাসের ওপর, জলের বোতল দুটো সিটের মাঝামাঝি, খাবারের বোল ভরা, সবই টেবিলে রাখা, দুধের বোতল, ফলের সাজানো প্লেট। আরো কত টুকিটাকি আন্টির ওয়াইন গ্লাস বোতল। সব এত সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা দেখে সুনীলের লজ্জা করলো। একা হাতে আন্টি রান্না থেকে শুরু করে সব কাজ করেছেন। সে বললে, 'আন্টি, তুমি আমায় আগে বলনি কেন? কাল আমি ক্লান্ত ছিলাম, আজ তো তোমায় সাহায্য করতে পারতাম, আমার ভাল লাগছে না!'

'দুষ্টু ছেলে! এ সব আমারই করার কথা। মনে রেখো, ভারতের মত লোকসংখ্যা, পশ্চিমের কোথাও নেই, এখানে সংসারের কাজ নিজেকেই করে নিতে হয়।'

সুনীল আন্টির কাছে শেখা টেবিল ম্যানার্স মানে, প্রথামত বড় চামচ নিয়ে খাবার তোলার চেষ্টা করায় মিস্ লিলি বললেন, 'কয়েকদিন আমাকে সাহায্য করতে দাও।' বলে খাদ্য পরিবেশন শুরু করলেন। সুনীল তাঁকে লক্ষ্য করে ন্যাপকিন পায়ে বিছিয়ে, ডানহাতে ছুরি বাঁহাতে কাঁটা তুলে, তাঁর দিকে চাইলো। তিনি বললেন, 'খাও সন্! তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি চিন্তিত হয়ে পড়েছ!'

লজ্জিতভাবে সুনীল বললে, 'না, না কোন সমস্যা নেই।' আসলে খুশীমত হাত-পা এলিয়ে খাওয়ায় অভ্যস্ত সুনীল একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। খাওয়ার শেষে ফল দুধ খেয়ে গরম জল রাখা বাটিতে হাত-মুখ ধুয়ে ন্যাপকিনে মুছে নিল। তিনি বললেন, 'প্রথম প্রথম তোমার খেতে অসুবিধা হবে হয়তো আমাদের খাদ্য, আমি বুঝতে পারছি সন্, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে। তুমি লিকার খাও না, চা কফি খেও ঠাণ্ডার দেশে জলের বদলে, শরীর ভাল থাকবে। যা দরকার প্রয়োজন মত চেয়ে নেবে, লজ্জা করো না, এটা তোমারই বাড়ী মনে করবে সন্।'

তাঁর স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর সুনীলকে সহজ করে দিল। সে উৎসাহের সুরে বললে, 'আন্টি, আপনি যে আমায় তুলনামূলক প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা বোঝাবেন বলেছিলেন?'

'নিশ্চয়। ওখানে আরাম করে বসে গল্প করবো।' খাবার টেবিল থেকে উঠে গিয়ে ঘরের অন্যধারে সোফার ওপর বসলো সুনীল। মিস্ লিলি ডিস প্লেট ইত্যাদি সব নিয়ে উঠোনের দিকে চলে গেলেন, সুনীলের আন্টিকে সাহায্য করার সদিচ্ছার কথা মনেই এলো না। যখন বেশ কিছু সময় বাদ মিস্ লিলি ফিরে এসে বসলেন তখন মনে পড়লো

সুনীলের, কিন্তু সে সময়ে কিছু বলার চেয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হলো। একটু বিশ্রামের পর মিস্ লিলি বললেন, 'সোনীল শোন, শিল্পকলার গোড়ার কথা।'

'আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসি আণ্টি।' সে নিজের ঘরে গিয়ে নোটবই পেন্সিল নিয়ে এসে বসলো।

মিস্ লিলি শুরু করলেন, 'তেরোশো খ্রীস্টাব্দের পূর্বে প্রাচ্য পাশ্চাত্যর শিল্পরীতির পার্থক্য ছিলই না বলা চলে। তারপর থেকে দুটি ধারার যোগসূত্র ক্রমে ছিন্ন হয়ে যায়, তার মূল কারণ, ইউরোপে রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রভাবে, সাহিত্যে কলায় সমাজ-জীবনে, নব চিন্তার আবির্ভাব, মধ্যযুগের মানসিকতায় অপার্থিব আদিভৌতিক চিন্তার যে প্রাধান্য ছিল, তার পরিবর্তন ঘটালো। রেনেসাঁসের এক ঐতিহাসিক কারণ ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীরা কনস্ট্যানটিনোপল দখল করে, যার ফলে ওখানকার গ্রীক পণ্ডিতরা পুঁথিপত্তর, গ্রীসীয় জ্ঞানবিদ্যা নিয়ে পালিযে আসে ইতালীতে। ইতিপূর্বে জার্মানীতে মুদ্রণ যন্ত্র হয়ে গেছে, ইতালীওরা মুরদের কাছে কাগজ তৈয়ারী শিখে নিয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পকলায় দৃশ্যজগতের বাস্তব রূপকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিত্রে প্রতিফলিত করার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। প্রাচ্যের রীতিতে প্রকাশ করাই মুখ্য, গঠনের খুঁটিনাটি গৌণ। পাশ্চাত্যে মডেল বা আদর্শ ব্যবহার অপরিহার্য হয়েছে। প্রাচ্য চিত্রকলায় ধ্যানলব্ধ রূপেরই প্রকাশ বিধেয়। প্রাচ্য রীতিতে, পারিপার্শ্বিক ও পরিপ্রেক্ষিত বা শরীর স্থান-বিদ্যার (এনাটমি) ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় না। প্রাচ্য রীতি প্রধানতঃ ব্যঞ্জক ও ছন্দময়। এছাড়া ছায়া-তপের (লাইট এণ্ড সেড্) প্রয়োগ সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে পাশ্চাত্য রীতিতে বিশেষভাবে দেখা যায়। প্রাচ্য চিত্রকলায় ছায়া-তপ ব্যবহার সামান্য, রেখাই ছবির প্রাণ।'

একটু দম নিয়ে আবার বললেন মিস্ লিলি 'তবে এটাও মনে রাখবে সোনীল, ইউরোপীয় শিল্পের প্রসারের ফলে ভারতে নিজস্ব রীতির অবনতি ঘটে। ইদানীং-কালে ভারতীয় নিজস্ব রীতি নবরূপে দেখা দিয়েছে, আর পাশ্চাত্য কলাকৌশলও আয়ত্ত করছে শিল্পীরা। সারা ভারতে বিশেষ করে শান্তিনিকেতন কলাভবনে নব ধারায় চর্চা হচ্ছে। মধ্যযুগে ইউরোপে ক্যাম্বিস কাপড়ে তৈলমিশ্রিত রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হতো, যাকে বলে অয়েল পেন্টিং, বর্তমানে এই তৈলচিত্রাঙ্কন পৃথিবী বিস্তৃত। রেনেসাঁসের আগে সাহিত্যকলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাধান্য ছিল গীর্জার পুরোহিতগোষ্ঠীর, যেমন ভারতে ব্রাহ্মণদের। রেনেসাঁসের ফলে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মাইকেল এঞ্জালো, রাফায়েল, দা ভিঞ্চি, ইতালীয় রেনেসাঁস যুগের স্রষ্টা। তোমাকে এঁদের কাজ দেখতে হলে ইতালী যেতে হবে। ফ্রান্সে চিত্র, ভাস্কর্য কলা উন্নীত ও গৌরবান্বিত

হয়েছে প্রথম নাপলেয়র রাজত্বকালে ; সেই সময়ে উদ্যমের সূত্রপাত, সীমাবদ্ধ ক্লাসিক ভাবধারা থেকে সরে গিয়ে রোমান্টিক শিল্পকলার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হলো। আজ এই পর্যন্ত থাক সোনীল। তোমার বোঝবার কোন অসুবিধা হয়নি তো ?'

চমৎকার লাগল আন্টি, আমি সব নোট করে নিয়েছি।' সুনীল বললে।

'তুমি কফি খেয়ে বেড়িয়ে এসো হ্যামলিটের ভেতর।'

'ধন্যবাদ আন্টি !'

॥ ২ ॥

সারা দুপুর হ্যামলেটের পাশের সবুজ ভুট্টার ক্ষেতে পায়ে চলা রাস্তার একটু তফাতে উঁচু টিলার ওপর ইজেল রেখে, চাষী পুরুষ-নারীর যাতায়াত লক্ষ্য করে স্কেচ করেছে সুনীল তার মনোমত ভঙ্গিমা। ক'দিন ঘরে বসে থাকা আর বই পড়ায় হাঁপিয়ে উঠেছিল বাবা-মামণিকে চিঠি দেওয়ার পর থেকে। কলকাতা, পাটনার কথা, সুলেখার মুখ, তাকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল, লান্চের পরেই বেরিয়েছে যা হোক এঁকে বেড়াবে। একজন বুড়ির নীচু হয়ে গাছখোঁড়া, রাখাল ছেলেদের গরু চরানো, চাষীর কোদাল চালানো সব ভঙ্গি নানা জায়গায় স্কেচ করার চেষ্টার মধ্যে কতটা ঠিক হয়েছে জানে না। আসল লাভ যেটা হয়েছে, সেটা হলো মনের মেঘলা কাটানো। বিদেশে সম্পূর্ণ অজানা পরিবেশে প্রিয়জনদের অভাব বেদনার উপশম হলো। ইজেল মুড়ে কাগজ পেন্সিল স্কেচগুলো সামলে নিয়ে সে কটিজের দিকে ফিরলো।

সারা মাঠে সূর্যাস্তের লাল ছটা ; ঘন সবুজ চাষের ক্ষেতে সোনার ফসল ফলানো। ফেরার সময় বারেবারে সুনীল ঘুরে না দেখে পারলো না। এ ছবি সে কবে আঁকতে পারবে ? আদৌ কোনদিন পারবে কিনা এই প্রশ্ন ভরা মন নিয়ে সে কটিজে ঢুকলো নিজের ঘরে। টেবিলে সব রেখে, কোণে রাখা বেশিনে মগের জলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে, মুখে জল নিয়ে পাশে ঝোলা তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখ হাত মুছলো ভাল করে। বাইরের পোষাক ছেড়ে ঘরের পোষাক পরে নিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো। অন্ধকারে ভেসে উঠলো সোনার ক্ষেত।

'হাই সোনীল নটি বয় ! সারাদিন কোথায় ছিলে ?' মিস্ লিলি হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে, সুনীল তড়াক্ করে উঠে বসলো।

চায়ের ট্রে নামাতে গিয়ে মিস্ লিলি দেখলেন সারা টেবিল জোড়া স্কেচ, কাগজ ইত্যাদি, হেসে বললেন, 'এই ব্যাপার তো আগে বলোনি কেন, চা দিয়ে আসতাম মাই সন্ !'

সুনীল বললে আদরের সুরে, 'সুইট আন্টি, আমায় অপরাধী করো না, দরকার হলে আমি নিজেই এসে যেতাম।'

'সোনীল, দেখ চা গরম আছে কিনা নয় ঠাণ্ডা খাও, চা দুবার গরম করা ঠিক নয়! আমি তোমার স্কেচগুলো দেখি যদি আপত্তি না থাকে।'

'আমি খুব খুশী হবো, ধন্যবাদ আন্টি।' মিস্ লিলি গম্ভীরভাবে একমনে দেখতে লাগলেন চেয়ারে বসে। সুনীল চা শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ স্কেচ দেখে মিস্ লিলি বললেন, 'তোমার চেষ্টা খুব ভাল, কিন্তু ঘসামাজা লাগবে দিনের পর দিন, দেখবে ছবি ঠিক জীবন্ত হচ্ছে। মনে রেখো সোনীল একটা কথা, আমার বাবা বলতেন, সততা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণতা। শিল্পের ক্ষেত্রে, একদিনেই হয়ে ওঠা শিল্পী, একদিনেরই হয়ে থাকে। সহজে হঠাৎ লোকের চোখ ধাঁধানোর চেয়ে ভাল কিছু সৃষ্টির জন্যে সততার সঙ্গে দীর্ঘ অনুশীলন ভাল। সাধারণের মনোরঞ্জনই বড় কথা নয় আর্টের।'

'আপনার বাবার এই অমূল্য কথাগুলি আজীবন মনে রাখবো আন্টি!' বললে সুনীল।

মিস্ লিলি আরো বললেন, 'আসলে শেষ ধাপে প্রকৃতির সঙ্গে সৎ শিল্পীর মিলন অনিবার্য, এর জন্যে হয়তো দরকার অনেক সংগ্রাম, ধস্তাধস্তির, প্রকৃতিকে আপন বশে আনতে। এর ফলে খারাপ, অতি খারাপ সৃষ্টিও উৎরে যাবে। আর এ কথাও জানবে, শিল্পীর ভাগ্য জুয়াখেলার চেষ্টার মতই থেকে যায় সবসময়ে। স্বাভাবিক অনুভূতির বিকাশ, শিল্পীর পুঁজি বাড়াতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।' মিস্ লিলি থামলেন, সুনীল তাঁর দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মিস্ লিলি বললেন, 'সোনীল, আজ রাতের খাওয়ার পর তোমাকে কিছু ইউরোপীয় ধারার কথা শোনাবো, সংগ্রহশালায় ছবি দেখার সময় তোমার কাজে লাগবে। সুযোগ পেলেই পারীর শিল্প সংগ্রহশালা, পুরাতন গির্জার মধ্যে, রাস্তায় ঘাটে, যেখানে যাবে চোখ খুলে দেখবে। শিল্পী হতে হলে চোখ তৈরী করা অতি আবশ্যকীয় সাধনা। পারী শিল্প নগরী, এমন আন্তর্জাতিক শিল্প-সম্পদ কোথাও নেই। চলো খাওয়া শেষ করি। আমি এগোচ্ছি, আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, তুমি ড্রেসিং গাউনটা পরে নিও, আমি খাবার ঘরের স্টোব্‌টায় কয়লা দিয়ে ঘর গরম করে রাখছি, তুমি এসো।' তিনি চলে গেলেন।

রাত্রের খাওয়া শেষে খাওয়ার ডিস ইত্যাদি ধুয়ে দিয়েছে। এখন সে রোজই আন্টিকে সাহায্য করার জন্যে খাওয়াশেষে যতদূর সম্ভব সাহায্য করবে স্থির করেছে। আন্টির আপত্তি, তিনি বলেন 'সোনীল, তুমি আমায় টাকা দিচ্ছ অতিথি হিসেবে।'

সুনীল মানে না, ডিস প্লেট কাঁটা চামচ ইত্যাদি ধুয়ে এসে বসলো কফির মগ হাতে নিয়ে আরাম চেয়ারে। সব কাজকর্ম গুছিয়ে হাত ঘসতে ঘসতে মিস্ লিলি এসে বসলেন আরাম চেয়ারে হাতে কফি মগ নিয়ে। পায়ের দিকে একটা র‍্যাগ্ ঢাকা দিলেন। সুনীল পকেট থেকে নোটবই ও পেনসিল বার করে চাইল তাঁর দিকে।

মিস্ লিলি চেয়ারে পাশের থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে এই বইটা কিনতে বলতাম, কিন্তু ফরাসী ভাষায় বই এখন তোমার পক্ষে বোঝা শক্ত হবে, মোটামুটি আমি বলে দিচ্ছি পরে ভাল করে পড়ে নিও। ইউরোপে রেনেসাঁসের পরবর্তী যুগ, হাই রেনেসাঁস সপ্তদশ শতাব্দী। এনাটমি, মানে শরীর স্থান জ্ঞান, ত্রিমাত্রিক আকার গঠন, মানব-সুলভ পৌরাণিক চিত্র অঙ্কন এই যুগের প্রধান লক্ষণ ছিল। দা ভিঞ্চি (১৪৫২—১৫১৯ খ্রী:), মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫—১৫৬৪ খ্রী:), আর র‍্যাফেইল (১৪৮৩ —১৫২০ খ্রী:) এঁদের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে ভেনিসের, জোর্জোনে ও তিতসিয়ানোকে সেই যুগের প্রধান প্রধান শিল্পী। হাই রেনেসাঁসের আগেই ইউরোপের অপর প্রান্তে চিত্র-অঙ্কনের একটি যুগান্তরকারী অঙ্কন মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতেই ফ্ল্যাণ্ডার্সে, ফান-এইক ভ্রাতৃদ্বয়, জল ও গঁদের পরিবর্তে তেলের সঙ্গে রঙ ব্যবহারের প্রচলন করেন প্রথম। গেন্টের গির্জায় এর নিদর্শন মেলে। ছোট ভাই ইয়ানের বৈশিষ্ট্য ছিল দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চরিত্র ও ঘটনা। বলতে গেলে ঘরোয়া ও প্রতিকৃতি শিল্পের জনক ইতালিয় ধারা থেকে স্বতন্ত্র, বাস্তবধর্মী অঙ্কন শৈলী। এই সময়ে জার্মেনীতে সুস্পষ্ট রেখার মাধ্যমে চিত্র প্রচলিত। রেখাপ্রিয়তার জন্য কাঠ খোদাই এবং ধাতুর উপর সূক্ষ্ম খোদাই কাজে শিল্পীদের নাম হয়েছিল। এর পরের যুগে একজাতীয় অতি-ভাবপ্রবণতায় মেতে, গতিময় অঙ্কন নীতি, যাকে বলা হয় 'ম্যানারিজম' চালু হলো। মাংসপেশীর সংকলন, প্রতিকৃতিতে মুখভাবের অস্থিরতা, সমুদ্রের ঢেউয়ের চাঞ্চল্য, আকাশে ঝড় বিদ্যুৎ ইত্যাদির অতিরঞ্জন। 'ম্যানারিজমের' পর আর এক গোষ্ঠী 'বারক' পরে এই দুই ধারায় মিলেমিশে সংযত হলো। সৃষ্টিধর্মী শিল্পের স্বভাবই হচ্ছে গতিশীল, পরিবর্তনশীল। ইউরোপীয় ক্ষেত্রে এই সময়ে প্রধান শিল্পীদের নাম হচ্ছে, ইতালীতে পাওলো-ভেরোনেস, স্পেনের ভেলাসকেথ, ফ্ল্যাণ্ডার্সের, রুবেন্‌জ। আলো-ছায়ার ঘনত্ব আর রঙের বৈচিত্র্য এঁদের বৈশিষ্ট্য। সপ্তদশ শতকে এই ধারার ধারক, হল্যাণ্ডের রেমব্রান্ট, স্পেনের মূরীল্যো, ইংল্যাণ্ডের হোগার্থ। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে দুরকম ধারা চালু ছিল ; এক ধারা রাজারাজড়াদের বিলাসিতা ও আড়ম্বর প্রধান চিত্রকলা, ফ্রাঁসোয়াবুশে, আঁতোয়ান ওয়াতো, ঝাঁ বাপ্তিস্ত পাতের। আর একটি ধারা প্রচলিত ছিল নাম করা শিল্পীরা হচ্ছেন, ঝাঁ বাপস্তি শার্দ্যাঁ ও ঝাঁ বাস্তিস্ত গ্যোজ। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের

শিল্পকলায় নির্মম নিয়মমাফিক ধারা, ক্লাসিসিজ্‌ম নামে পরিচিত। ধরাবাঁধা পদ্ধতি মেনে চলা হতো; রোমান অনুকরণে ফরাসী লোকদের চিত্রায়ণের মাধ্যমে। এ ধারার নেতৃত্ব ছিল, ঝাক লুই দাভিল-এর হাতে। বুর্ব রাজগোষ্ঠীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দাভিল নির্বাসিত হন। কিন্তু দাভিলের শিষ্য, ঝ ওগুস্ত দামেনিক আঁ্যাগেস, ক্লাসিকেল রীতি বজায় রেখে রেখার শুদ্ধতায় কাজ করে যান। এই ধারার সঙ্গে রোম্যান্টিসিজমের ধারাও চালু হয় সেই সময়ে। এর প্রবর্তন করেন; তোয়াদোর ঝেরিকো এবং ফার্দিনার্দ ভিক্তর অ্যঝেন। ভাববাদী উচ্ছ্বাস আর রূঢ় বাস্তববাদ, মানুষ ও জীব-জন্তুর রূপের মধ্যে। এঁদের চিত্র রেখা সর্বস্ব না হয়ে রঙের উজ্জলতা প্রধান। স্পেনে এই ধারার প্রতিনিধি ছিলেন, গোইয়া। ইংল্যাণ্ডের ছিলেন, জন কন্‌স্টেবল, টমাস গেন্‌স্‌বারো উলিয়ম টার্নার। প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক দৃশ্যের চিত্রাবলীর চর্চাও আবার শুরু হয়। ফ্রান্সের গ্রাম্য প্রাকৃতিক সারল্যধর্মী চিত্র, কোরো, বা মিলো, এঁদের চিত্রে ফুটেছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ধারা প্রসারলাভ করে। এছাড়া সামাজিক অন্যায় ও শোষণ, অবিচারের, বিদ্রুপাত্মক চিত্র রচনাও এই সময় হয়েছিল। এখন এই পর্যন্ত থাক সোনীল! তোমার এখন দুটো কাজ করতে হবে, একটা শিল্প সংগ্রহশালা দেখে বেড়ানো, আর আমি তোমাকে অনেক ছবি এনে দেবো, সেগুলো ধৈর্য মনোযোগ দিয়ে নকল করা, এতে তোমার সাধনার রাস্তা খুলে যাবে, জন্তু-জানোয়ারের ছবি নকল করলে এনাটমির জ্ঞান বাড়বে।'

মিস্ লিলি থামলেন, সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বললে, 'আণ্টি, 'আমাদের দেশে গুরুকে সম্মান জানাতে পায়ের ধুলো নেওয়ার রীতি, আমি যদি আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম জানাই, আপনি কি কিছু মনে করবেন?'

হাসতে হাসতে মিস্ লিলি বললেন, 'ও গড! কি পাগল ছেলে, আমি কোথাও দেখিনি!' সুনীল নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালো, মিস্ লিলি উঠে দাঁড়িয়ে তার মাথা দু'হাতে ধরে দু'গালে দুটি স্নেহচুম্বন দিয়ে বললেন, 'আমার দুষ্টু ছেলে!' দু'জনেই যেন পরম তৃপ্তি পেল। মিস্ লিলি বললেন, 'সোনীল, কাল ব্রেকফাস্ট সেরে, লান্‌চের প্যাকেট নিয়ে, তোমার জন্যে নির্দিষ্ট 'আতলিয়েতে' লাকদেমী দ্য লা গ্রাঁদ শমিয়েরে তোমায় নিয়ে যাবো, আমার দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো, দেখো শিক্ষক হিসাবে তিনি তোমায় খুবই সাহায্য করবেন। ওখানে তোমার ক্লাসের কাজ শেষ হলে কালই তোমায় স্তেন নদীর ধার দিয়ে পারীর প্রাচীনতম কয়েক শতব্দীর পুরানো জগৎ বিখ্যাত শিল্প-সংগ্রহশালা 'লুভ্‌র্' দেখিয়ে দেবো। তোমার রাস্তাও চেনা হয়ে যাবে। এখন যাও রাত হয়েছে।' সুনীল ঘরে গেল।

॥ ৩ ॥

গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বপ্নের মধ্যে ছিল সুনীল। গ্রাঁদ শেমিয়েরে প্রথম ক্লাস করা, শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিতি; স্বদেশী বা বিদেশী কোন ভেদাভেদ এঁদের অজ্ঞাত। ভারতীয় ব্রাহ্মণ বলে আন্টির পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় এক একজন এত সম্ভ্রম দেখালেন, যাতে সুনীলের লজ্জা হতে লাগলো। মিস্ লিলির দাদা খুব খুশী ভারতীয় ছাত্র পেয়ে, বললেন, 'অজন্তা, ইলোরা, বুদ্ধ, নটরাজের দেশের মানুষ, তোমাদের আবার আর্টের ভাবনা? দিয়ার সোনীল, যখনই কোন সমস্যায় পড়বে, আমায় জানাবে, কোন দ্বিধা করো না। তোমার লিলি আন্টির কাছে, অনেক বছর আগে থেকে তোমার বাবা, মা, তোমাদের বাড়ী সম্বন্ধে অনেক কথা আমার জানা হয়ে আছে। তুমি আমায়ও তোমার লিলি আন্টির মতই মনে করবে সন্।'

এঁর কথা সব বোঝা সম্ভব ছিল না, সময় বুঝে আন্টি হিন্দিতে বুঝিয়ে দেন। ক্লাশে শিক্ষকদের কি আন্তরিক ব্যবহার। প্রথম দু'তিনজন নগ্ন-নারী মডেল দেখে সুনীল প্রায় মাথা তুলতে পারেনি, কাজ করবে কি? হাতে-পায়ে কম্পন, নাক-কান গরম! ওদের ঘিরে বহু ছাত্র কাগজে খাতায় এঁকে চলেছে ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে তাই রক্ষে, সে সময়ে সুনীলের মুখ চোখ তারা নজর করলে হাস্যকর হতো। শিক্ষকের কিন্তু দৃষ্টি এড়ায়নি; তিনি ধীরে ধীরে পেছনে এসে হাতের সাদা কাগজ লক্ষ্য করে বললেন নিম্নস্বরে, 'লজ্জা পেও না ছোকরা! এটা এমন কিছু ব্যাপার নয় আর্টিস্ট-এর সামনে, মনে মনে 'এঞ্জেলের' সামনে ভেবে নাও কিম্বা অন্য যা তোমার খুশী, শুরু করো, চালাও যতটা পারো, অভ্যাসে সব সরল হয়ে আসবে।'

তাঁর কথামত সুনীল পেন্সিল চালানো শুরু করলো মাঝে মাঝে আড়চোখে চেয়ে নিয়ে। শিক্ষক-মহাশয় একবার দেখেও গেলেন উঁকি মেরে। ক্লাশের সময় শেষ হবার পর সবাই উঠে পড়লো, দরজার গোড়ায় মিস্ লিলি আর মডেল কথা বলছেন। সুনীল কাছে গিয়ে দাঁড়াতে মডেল তার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সরলভাবে হেসে চলে গেল। মিস্ লিলি বললেন, 'চলো সোনীল, কফিখানায় বসে আমরা লান্চ খেয়ে পারীর গঙ্গা দেখতে বেরোব, তারপর লুভ্‌র্।'

পারী সহর স্বপ্নের সহর। 'স্যেনের' তীর দিয়ে হাঁটা, মাঝে মাঝে প্রাচীন প্রাসাদের সঙ্গে আধুনিক বাড়ীঘর, বাগান বাগিচা, গোলাপ ফুলের সমারোহ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ঝকঝকে চকচকে চারিদিক, দেশে যেন ধুলোবালি নেই। পারীর গঙ্গার ধারে সুনীলের মনে পড়েছে কলকাতা, পাটনার গঙ্গা, ভারতীয় ব্রাহ্মণের দেশ। এখানে ওই যে চলেছে, কাল লম্বা আফ্রিকার তথাকথিত আদিম মানুষ তাকেও, হাজার হাজার বছরের সভ্যতার

গৌরবে দাম্ভিক ভারতীয়দের চেয়ে ঢের বেশী সভ্য মনে হচ্ছে সুনীলের। রাস্তায় সিগারেট খাচ্ছে কিন্তু শেষ করে নিভিয়ে পকেটে ভরছে। সিগারেট সবাই খায় কিন্তু একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দেখা যাবে না। রাস্তা নোংরা না হয় সকলের কত যত্ন সাবধানতা। আর ভারতীয় বামুনবাড়ীতে ঘরের কোণে ময়লা জমা। এখানে গির্জার পাশ দিয়ে গেলে মনে হয় খানিকক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি আর ভারতীয় মন্দিরের ধারে কাছে গেলে মনে হয় কত শীঘ্র পালাতে পারি। ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণের কথা ভেবে হাসি পায় সুনীলের।

'একটু বিশ্রাম করবে সন্ বৃদ্ধার খাতিরে?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়! আমি দুঃখিত আন্টি, এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলাম।' নদীর পাড়ে জায়গা বেছে দুজনে বসে পড়েছিল। সুনীলের মনে হয়েছে, কেন এ দেশ সকল কলা-বিদ্যায় এত উৎসাহী। পারীর সৌন্দর্য-প্রীতি ফরাসীদের কলা প্রেমিক করেছে। সার্বজনীন আস্তি না থাকলে এমনটি কি হতো? রাস্তার দু'ধারে পুষ্পিত বৃক্ষের সারি, ধারে ধারে লম্বা পার্কের মধ্যে ফুলের মেলা, ছোট বড় ভাস্কর্যের প্রাচুর্য, সারবন্দী বাড়ী সযত্নে রক্ষিত। দুনিয়ায় ফ্রান্সের চেয়ে ধনী দেশ অনেক আছে কিন্তু কলাদেবীর কৃপাদৃষ্টি বঞ্চিত।

বিশ্রামের পর লুভ্‌র্ শুধু ঘুরে দেখতেই সন্ধ্যে হয়ে এলো, সুনীল বললে, 'বাড়ী ফিরবে না আন্টি?'

মিস্ লিলি বললেন, 'চলো আজ, পরে এসো, বারেবারে তোমায় এসে দেখতে হবে।' রাস্তায় এসে সুনীল ট্যাক্সি খোঁজ করছিল, একটা পেয়ে গেল, মিস্ লিলি আপত্তি জানিয়ে বললেন হিন্দিতে, 'অনেক টাকা লাগবে, কি দরকার? আমি এত টাকা সঙ্গে আনিনি সোনীল।'

'ঠিক আছে উঠে পড়ুন, আমি দেবো আন্টি, আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিস্ লিলি উঠে বসলেন, পাশে সুনীল। গাড়ী চলার সময় হিন্দিতেই বললেন মিস্ লিলি, 'তোমার হাত খরচের সামান্য টাকা থেকে বড় খরচ করলে সারা মাস চালাবে কি করে?'

সুনীল হেসে বললে, 'বাবা জাহাজ ঘাটে বিপদ আপদের জন্যে দুশো পাউণ্ড আলাদা দিয়েছেন রাখতে।'

'দুষ্টু ছেলে, কাছে রেখেছ কেন এত টাকা? কালই ব্যাঙ্কে জমা দাও, দরকারমত তুলবে; হ্যামলেটেই ব্যাঙ্ক আছে, সুদও দেবে তারা।'

কটেজে পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে গেল। রাত্রের তৈরী রাখা খাবার খেয়ে কফি

খেয়ে শুয়ে পড়লো ; ঘুম অবশ্য আসছিল না স্নীলের। ছবি, ছবি, ছবি, যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছিল।

॥ ৪ ॥

ডিনারের শেষে কাজকর্ম সেরে এসে বসেছেন মিস্ লিলি আরাম কোচে, সামনে আগুনের লালচে আলো এসে পড়েছে গায়ে মুখে ; হাতের বইটা মন দিয়ে পড়ছেন। সুনীল নিজের ঘরে ইজেলের সামনে আজকে ক্লাশে দেওয়া অনুশীলনে ব্যস্ত। কাজটা শেষ করে আন্টির কাছে যেতে হবে ইতিহাস শুনতে। কাজশেষে সে যখন পৌঁছলো আন্টির কাছে, দেখলে তন্ময় হয়ে তিনি পড়ছেন। তাঁর মুখে আগুনের আভা পড়ায়, সুষমায় ভরে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডল, লাল চুল, কাঁধ গলা ; মামণির কথা মনে পড়ে যেন বুকে একটা কাঁপন অনুভব করলো, চেয়ে রইলো নীরবে। মিস লিলির খেয়াল হতে চেয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার সন্ ? তুমি চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়ে আছ যে, কি সমস্যা ?'

'কিছু না আন্টি, আগুনে তোমার মুখটি আঁকার মত হয়েছে।'

'দুষ্টু ছেলে, আঁকার অনেক মডেল পাবে, এখন বসো কাগজ পেন্সিল নিয়ে।'

সুনীল বসলো, তিনি বইয়ের ভেতর থেকে একটা লেখা কাগজ বার করে শুরু করলেন, 'শোন সোনীল, তোমার কথায় মনে পড়লো, একজন ফরাসী শিল্পী ছিলেন মজার লোক, নাম এদগার দেগা, ঘোর বাস্তববাদী। ব্যালে দেখতে গিয়ে সামনে না বসে স্ক্রীনের পেছনদিকে লুকিয়ে মহড়ার ছবি আঁকতেন। মহড়ার সময় যে সব ভুলত্রুটি থাকতো, সেইগুলি প্রকাশ করে দিতেন তাঁর ছবিতে। কোথাও ধোবানীর কাপড়-কাচা, দেহ-ভঙ্গি, মুখের ভাব ফোটাতেন। কোন মোটা লোক স্নানের শেষে নগ্ন, বেঢপ শরীর শুকানোর ভঙ্গি। সৌন্দর্যের দিকে কোন নজর ছিল না, ঘোর রিয়ালিষ্ট। তুমি বুড়িকে মডেল করতে চাইছো সেই মতলবে নাকি ?'

সুনীল লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'না না আন্টি ! আমি তোমার মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আমার মামণিকে মনে পড়েছিল। তাই...'

'ও সোনীল, আমি মজা করার লোভে গল্পটা বলেছি, তুলনামূলক নয়। কিছু মনে করো না মাই সন্ ! তুমি দুঃখ পেও না, এখন শোন। প্লাস্টিক আর্ট মানে আধুনিক চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য—ধারণা, উদ্দেশ্য, কল্পনা প্রভৃতির অনধীন, স্বাধীন স্বতন্ত্র। এই ধারার নাড়ী বাঁধা, শক্ত বিষয়বস্তুতে, চোখে আঘাত করে, অদ্ভুতদর্শন অস্বাভাবিকতা যাকে ইংরাজীতে বলা যায়—Independent of ideas tied to stiffer material may strike oddly, কিন্তু সহজবোধ্য। রোমান্টিক ধারা শেষ হয়ে আসে উনিশ

শতকের শেষের দিকে। এই শতকের শেষ থেকে শুধু চিত্রকলার ক্ষেত্রে কেন, মানব-চিন্তার সকল ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কারে, দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক, ভাব-বিপ্লব ঘটেছে।

'এই সময়ে ফ্রান্সের কিছু শিল্পী, ন্যাচারলিজম বা স্বভাববাদ নামে একটি ধারা চালু করেন। দরিদ্র মানুষের জীবন আলেখ্য ফোটানোর চেষ্টা চলে। অতিমাত্রায় কল্পনা-প্রবণ চিত্রের বদলে কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত সাধারণ জীবন রূপায়ণে চেষ্টা করেন শিল্পী মিলো, শিল্পী কুর্বে। বিদ্রূপাত্মক চিত্রে দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করেন, আনোরে দোমিয়ে।

'এরপর আসবো একটি শক্তিশালী আন্দোলনের কথায়। রোমান্টিক ধারা উনিশ শতাব্দীর শেষদিকে মিশে যায়, ইম্প্রেশনিস্ট আন্দোলনে। এই আন্দোলনের সূত্রপাত, শিল্পী মোনে-র চিত্র প্রদর্শনীর পর। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ, পয়েন্টিলিজম। এই ধারার প্রতিনিধি, শিল্পী ঝর্ঝ স্যোর', এঁদের বলার কথা,—প্রকৃতি, বস্তু, সত্য, স্থান, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে নানা পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাস তাই শিল্পীরা আপন আপন প্রমূর্ত দৃশ্য বা বস্তুকে সত্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু করলো, যা ধারণা বা জানা, সে দৃশ্য বা বস্তু ভেবে নয়। এঁরা দেখালেন, সব জিনিসের রঙ আলোর প্রতিফলন নির্ভর। একটি শিক্ষাপ্রাপ্ত চোখ, একই ঘাসের রঙ কখনই দু'বার একই রকম দেখে না। এসব চিন্তা করে তাঁরা আলোর ক্রিয়াকলাপ নিয়ে গবেষণায় মেতে ওঠেন।

'প্রখর সূর্যরশ্মি বা মেঘাচ্ছন্ন সূর্যালোকের ফলে জটিল রঙের সৃষ্টি তাঁদের ভাবিয়ে তুলেছিল। আপন আপন স্বতন্ত্র দৃষ্টিনির্ভর চিত্র তাঁরা দেখালেন, দর্শকের দৃষ্টির তোয়াক্কা না করে বললেন, নিজের উপলব্ধি ও সত্যদর্শন চিত্রে মূর্ত করা হয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধ মতের শিল্পীরা বললেন, এটাও সত্য নয়, প্রাকৃতিক নয়, এগুলো হচ্ছে একরকম 'নক্শা' বা প্যাটার্ন, ছন্দবদ্ধ রূপের বিশিষ্ট নমুনা যা তোমরা প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছ।

'সেই যুগে পারীতে শিল্পী ক্লোদ মোনে, গোগাঁ (পিসসারোর ছাত্র) আর শিল্পী স্যোরা, নিজের নিজের বিচারপদ্ধতি নিয়ে দিবারাত্র পারীতে তর্ক আর অনুশীলন চালিয়ে গেছেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ডাচ চিত্রকর, ভিন্‌সেণ্ট ফান্ খোখ এঁদের দলে মেশেন—পারীতে ছোট ভাইয়ের কাছে এসে। কিছুদিন পারীতে বাস করে এই খামখেয়ালী প্রতিভাধর সহর ছেড়ে পথে পথে গ্রামে-গঞ্জে ছবি এঁকে বেড়ান, মাঠে ময়দানে সারাদিন রৌদ্রের মধ্যে বিনা টুপি ছাতা নিয়ে। ইজেল ঘাড়ে এই শিল্পীকে গাঁয়ের

লোক পাগল বলতো। ছোট ভাইয়ের মাসিক দেড়শো ফ্রাঁ সাহায্য সম্বল করে নির্লিপ্ত নির্লোভী এই শিল্পী সারা জীবন-ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু এঁকেই গেছেন; তাঁর মৃত্যুর পর ছোট ভাইয়ের জন্যে করে রাখা এই শত শত চিত্র লোকের চোখে পড়ে। শিল্পের জন্যে উৎসর্গীত অনন্য দৃষ্টান্ত এই ডাচ শিল্পী, ইনি মৃত্যুর পূর্বে উত্তর-ইম্প্রেশনিস্ট ধারার বলা চলে। তিনি রঙয়ের প্রকৃতিবাদ না মেনে, নিজে প্রধানতঃ নক্‌শার ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন।

'একটা কথা জানা দরকার সোনীল,—ইংলাণ্ডে এই সময়ে ভাবের ব্যাপারে চিত্রকলায় সাহিত্যের প্রভাব দেখা দেয়। উইলিয়াম-ব্লেক, দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি, হোলম্যান হাণ্ট, বার্নজোন্স, চিত্রে কাব্য বা গল্পের ব্যাখ্যা করেন। সব ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আধুনিককালের কলাবিদ্যায় প্রচুর বৈচিত্র্য। সব জানার চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু নিজের রাস্তা বেছে নিতে হবে। শিল্পী স্যোরা-র কথায় একটু আসা যাক, এই অঙ্কনবিদ্যাকে বিজ্ঞানের স্তরে আনা যায় বিশ্বাস করতেন। ইম্প্রেশনিজমের চূড়ান্ত রূপ পয়েন্টিলিজম মাধ্যমে দেখান। ইনি তুলির টানের বদলে রঙয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর সমাবেশে চিত্র রচনা করতেন। একটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিশ্রিত রঙ যাতে শিল্পীরা দোকানে গেলেই কিনতে পারেন, সেইমত মিশ্রিত রঙ তৈরীর চেষ্টায় লেগেছিলেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্পী ছবি আঁকবে, এই তাঁর বিশ্বাস ছিল।

'এরপর আমরা আসবো শিল্পী পোল সেজান-এর কথায়। ইনি শিল্পী মোনে-র ইম্প্রেশনিজমের সামান্যতম অংশ গ্রহণ করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করেন। আদিম মানে, প্রিমিটিভ শিল্পের কথা লোককে স্মরণ করিয়ে দেন, চিত্রাঙ্কণ বিদ্যায় 'চিত্রানুপাত কৌশল' আবিষ্কারের, (যাকে ইংরাজীতে বলা হয়, Perspective) তা আদিমকালেই চালু হয়েছে, মানবের শৈশব অবস্থায় বলা চলে। এখন সব পরিকল্পনা, নকশা, দাবা-খেলার ছকের মত: আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আসলে—জ্যামিতিক, সরলরেখা, বক্ররেখা বা চৌকো। শিল্পী সেজান এই সরলীকরণ রাস্তায় ফিরিয়ে আনেন অঙ্কন-বিদ্যাকে। তিনি নক্‌শার মতই চিত্র করেন, যে নক্‌শা আনন্দদায়ক শিল্পী গ্যোগা, ফান খোখ, এই একই পদ্ধতি মেনে,—দেখা দৃশ্য ও উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। শিল্পী সেজানকে ইম্প্রেশনিস্ট দলে ফেলা হয়, কিন্তু বাস্তববাদী হিসাবে তাঁর বেশী ঝোঁক, ত্রিমাত্রিক-পদার্থ, যাকে ইংরাজীতে বলে Solidity, ঘনত্ব, ইংরাজী Density এবং জ্যামিতিক আকৃতি, যাকে ইংরাজীতে বলে Geometrical form of objects, দ্রুত পলায়নপর আলোকের আরোপিত প্রভাবের বাইরে; ইংরাজীতে বলে, Fugitive

effects of light। এইসব উত্তর ইম্প্রেশানবাদীদের বলা হয় এক্‌সপ্রেশনিজম, মানে, অভিব্যক্তিবাদ।

'সেজানের চিত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্য বা প্রতিকৃতিতে অন্তঃস্থ হাড়, কঙ্কাল, মজ্জা, মাংস, অনুভব করা যায়। ফন্‌ খোথ এই পথের পথিক; পোল গ্যোগা আদিবাসীদের জীবন-চিত্র অঙ্কনে, আকারের সারল্য ও রঙের ঔজ্জ্বল্য সার্থকভাবে ফুটিয়েছেন। এই শতকের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প আন্দোলন আনেন, শিল্পী ঝর্ঝ ব্রাক, আর পাবলো পিকাসো; আন্দোলনের নাম কিউবিজম। একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলেছেন, বিশুদ্ধ ভাবমূলক প্রকাশিত আকার—দর্শনীয় সঙ্গীত বলা চলে। প্রকৃতির অনুকরণ আবশ্যকীয় নয়।

'তাঁদের মতবাদ হলো—যা দেখছো তা নকল করো না; যা অনুভব করছো তাই আঁকো। ইংরাজীতে বলা হয়, Do not copy what you see but paint what you feel. প্রশ্ন হচ্ছে, যে ছবিতে দর্শক মনে মনে মূর্তি গঠনের উৎসাহ পাবে, কিন্তু নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে যে ছবি দর্শকের দৃষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করেছে শেষ পর্যন্ত সেটা উচ্ছৃঙ্খল গতিতে নিয়ে যাবে, কিম্ভূতকিমাকার পরিস্থিতিতে, যাকে ইংরাজীতে বলা যেতে পারে to absurdity. এই মতবাদে আদিম গঠন মানুষের, মোট ছয়টি ঘনক্ষেত্র ইংরাজীতে cube. চারটি হাত ও পায়ের জন্যে আর দুটি তার মাথা ও ধড়। প্রত্যেক ঘনক্ষেত্র এক একটি নক্‌শাও বটে। অতএব প্রত্যেক নকশা সুন্দর করার সুযোগ রয়েছে। যদি আগ্রহ হয় শিল্পী দ্বিতীয় স্থানে প্রকৃতির নকলনবীশ হতে পারেন ইচ্ছা করলে।

'এই নূতন ধারায় পিকাসো তাঁর ছবির নাম ও নাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া ব্যাপারে দর্শকদের ধাঁধায় ঠেলে দেন, সমস্যার সমাধান না করে। ঘনক্ষেত্রর সমষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকা মূলবস্তু, দর্শকের চোখে অপ্রয়োজনীয় ভাববিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। যাক এসব আলোচনা সোনীল, পরে নিজে আরো জানার ও ভাবার চেষ্টা করবে।

'এরপর কয়েকটা ছোট আন্দোলন সম্বন্ধে বলে আজ শেষ করবো। ইতালীতে ফিউচারিজম নামে একটি আন্দোলন শুরু করে শিল্পী মারিনেট্রি। গতি দেখাতে একটা হাতকে দশবার দেখিয়ে, খুব চমকপ্রদ বক্তৃতা রচনা, লোককে চমক লাগায় কিছু দিন, ছবির চেয়ে। ছবির মধ্যে গতির অনুভূতি আনাই লক্ষ্য। কতদূর সার্থক বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক রূপ নেয় মুশোলিনির পতাকার নীচে। এরপর বলা চলে শিল্পী মিনিস্কি, প্রথমে লণ্ডনের ছাত্র পরে পারী আসেন। সরলতা এঁর মূলকথা। তাঁর জল-রঙের ছবিতে, তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যে, আধুনিক রীতি অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় বস্তুর নিখুঁত খুঁটিনাটি না বাড়িয়ে, মূল আবশ্যকীয় রচনার ঔজ্জ্বল্য, আলো-ছায়ার রীতি অনুযায়ী বর্ণসমূহের সমন্বয়, সরল রঙের ওয়াশ ও ভারী কলম ও তুলির ব্যবহার দ্বারা করতেন।

'আর একজন শিল্পী এপস্টিন, আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের ছবি এঁকেছেন, যান্ত্রিক মানসিকতা আধুনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাঁর আঁকা 'দি রক ড্রিল' ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে খুব আকর্ষণ করেছিল দর্শকদের। এঁকে নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক বর্তমান, কিন্তু এঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। সোনীল, তোমাদের সময় অনেক মত পথ রীতি নীতি চালু হয়েছে শিল্পক্ষেত্রে। এ সম্বন্ধে সেমিয়ারে দাদার কাছে অনেক খবর পাবে, প্রশ্নের উত্তর পাবে। সংগ্রহশালায় ছবি দেখে সেই নিয়ে আলোচনা করে', তোমার উপকার হবে। এখন বিশ্রাম করোগে, গুড নাইট মাই বয়!'

'ধন্যবাদ আন্টি, সহস্র ধন্যবাদ!' সুনীল ঘরের দিকে গেল।

॥ ৫ ॥

বহুদিনের পাটনার বাস তুলে শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতা ফিরবেন স্থির করেছেন। স্থানীয় লোকরা, বাঙালী ও দেশীয় সমাজে এ নিয়ে সোরগোল পড়েছে; এতদিনের ফলাও ওকালতি ছেড়ে যাওয়া নিয়ে একটা রহস্যজনক আলোচনার খোরাক সৃষ্টি হয়েছে। যারা পরচর্চায় উৎসাহী, তাঁরা মনোমত কারণ বার করে রসিয়ে গল্প জুড়েছেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর শুভাশুভ ভেবে উদ্বিগ্ন। শচীনবাবুর উদার, নিঃস্বার্থ উপকার বা পরিচয় যারা পেয়েছেন তাঁরা আন্তরিক দুঃখিত এ ব্যাপারে। চাকর, লোকজন, গরীব চাষী প্রজা, মক্কেল, পিতৃবিচ্ছেদের মতই দুঃখে কাতর।

কলকাতায় নোটিশের ফলে দোতলার পুরোটা, চারখানা বড় ঘর, তিনতলায় একটি ও চিলে-কোঠায় একটি ছোট ঠাকুরঘর, ভাড়াটিয়া মহাশয় আইন-আদালতের ঝামেলায় না গিয়ে ছেড়ে চলে গেছেন। ভাড়াটিয়া মালিক কারুরই আদালতের ঝুট-ঝামেলা মনঃপূত নয় এখনকার দিনে।

একতলার দুটি ভাড়াটিয়া থেকে যাওয়ার অনুরোধ করায় শচীনবাবু নোটিশ ফেরৎ নিয়েছেন। তাঁর দরকারই বা কি, তাঁর দোতলাই যথেষ্ট। ফণীবাবু রাজমিস্ত্রী লাগিয়েছেন; সুপ্রকাশকে চিঠি দেওয়ায় সে বিকেলে দেখাশুনা করছে। সে জানিয়েছে বাড়ীর কাজ শেষ করে রঙ হওয়ার পর সে খবর দেবে, শচীনবাবু আসার দিন জানালে সে কয়েকদিন আগেই পাটনায় যেতে পারবে সাহায্য করার জন্যে আসার সময়ে।

রাত্রে খেতে বসেছেন শচীনবাবু; সামনে রামু বসে বাবুর খাওয়া তদ্বির করছে। খাওয়ার শেষদিকে রামু প্রশ্ন করলে, 'বাবা, দাদাভাইয়ের খবর অনেকদিন হয়ে গেল কিছু শুনিনি?'

'ওঃ, তোকে বলতে ভুলে গেছি বাবা। গতকাল মিস লিলির একটা চিঠি পেয়েছি।

তিনি লিখেছেন, সুনীল প্রায় দশ বার ঘণ্টা পরিশ্রম করছে, সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে, রাত্রে ফিরে এত ক্লান্ত থাকে যে খাওয়ার পরই শুয়ে পড়ে। এমনি শরীর ভালই আছে, ভাবনার কিছু নেই। ওখানে এখন খুব শীত চলছে একটা ওভারকোট হলে ভাল হয়। আমি আজ টেলিগ্রাম করে দিয়েছি কোট কেনার জন্যে টাকা পরে পাঠিয়ে দেবো। আর সব ভাল, দাদাভাইয়ের লেখাপড়া শেখা ভালই চলছে, তুই ভাবিস না।' কথা শেষ করে উঠে পড়লেন, রামু বাবুর মশারি ফেলার জন্যে শোবার ঘরে গেল।

ভোরে রামু বাগানে ফুলগাছে জল দিচ্ছিল, গেট ঠেলে ঢুকলেন বাবু দেওকীনন্দন সিং। সহরের বড় ব্যবসাদার, স্থানীয় লোক। রামু ওঁকে চেনে, তবে ভাল চোখে দেখে না। রামু 'রাম রাম' করে এগিয়ে গেল, বারান্দায় বাইরের লোকদের বসার বেঞ্চি দেখিয়ে বললে, 'বৈঠিয়ে বাবুজী।' তারপর ভেতরে চলে গেল।

একটু পরে শচীনবাবু বেরিয়ে হাসিমুখে রাম রাম করে বললেন, 'আইয়ে সিংজী অফিস ঘরমে।'

রামু দূর থেকে কটকটিয়ে তাঁদের যাওয়া লক্ষ্য করলো। বাবু তাকে আগেই বলেছেন, বাড়ী বাগান ভাড়া দিয়ে দেবেন, দেওকীনন্দনের সঙ্গে কথা চলছে। রামু উদাস চোখে চেয়ে রইলো বাগানের দিকে: ছোটবেলা থেকে এই ঘর-বাড়ীর ওপর তার নাড়ীর টান; গিন্নীমা মারা যাওয়ার পর এই সংসারে বাবু দাদাভাইকে নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে বেশী এমন ভাবে যে নিজের স্ত্রী-পুত্র গ্রামের সংসারে কদাচিৎ যাওয়া ঘটতো; বিকেলে যাওয়া সকালে আসা এই ছিল। সম্প্রতি স্ত্রী এখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে। ছেলের লেখাপড়ার জন্যে; বাবুর হুকুম, মানতেই হয়েছে। বাবু পাটনা থেকে চলে গেলে ওকেও নিয়ে যাবেন, বড় ছেলে এখন বড় হয়েছে, সংসার সামলে নেবে এই ভরসা। তবু রামু খুবই মনমরা হয়ে গেছে বাগানবাড়ী ভাড়া দেওয়ার কথা শুনে অবধি। দাদা-ভাই বিদেশ যাওয়ার পর থেকে বাবু যেন ছটফট করছেন, শরীরও দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু তো একদিন ছাড়া ছাড়া আসছেন; ডাক্তারবাবুরই যেন বেশী গরজ বাবুকে কলকাতা পাঠানোর। জিজ্ঞেস করলে বলেন, কলকাতায় বড় বড় ডাক্তার পাবেন বাবুর ভাল হবে। কি যে অসুখ রামুর বুদ্ধিতে কুলোয় না। জ্বর-জ্বালা নেই, খাওয়া নিয়মিত, শুধু ধরাকাটে, কি যে অসুখ?

বেলা বেড়ে গেল, বাবুর খাওয়ার সময় হয়ে এলো, কিন্তু দেওকীবাবুর কাজ শেষ হচ্ছে না দেখে চা দেওয়ার অছিলায় অফিসঘরে উঁকি দিল রামু। বাবুর চোখ পড়তে বললেন, 'রামু, সিংজীকে সরবত মিষ্টি দিয়ে যা।' সিংজীর আপত্তি শোনা গেল শচীনবাবু হাত নেড়ে দেওয়ার ইসারা করলেন।

একটু পরে রামু সরবতের গেলাস আর লাড্ডুর রেকাবী নামিয়ে দিল সিংজীর সামনে। তার দিকে চেয়ে হেসে সিংজী সরবতের গেলাস তুলে নিল। শচীনবাবু লেখার থেকে মুখ তুলে বললেন, 'সিংজী, যদি আপনার আপত্তি না থাকে নিজের দলিলে রামু একজন সাক্ষী থাকতে পারে ও স্বাক্ষর করতে পারবে, টিপ-সইও দিয়ে দেবে দরকার হলে; বাকী একজন আমাদের প্রফুল্লবাবু উকিল, বার লাইব্রেরীতে পাবেন, আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। দলিল দুটো হবে একটা আপনার কাছে একটা আমার কাছে থাকবে।'

'ঠিক হ্যায় বাবুজী!' হেসে উত্তর দিল সিংজী।

দলিল লেখা শেষ করে ভাঁজ করে সিংজীর হাতে দিয়ে বললেন, 'প্রফুল্লবাবুকে স্ট্যাম্প, টাইপ সব করে রাখতে বলবেন, আমি বেলা একটা নাগাদ পৌঁছে যাব কাছারিতে। কাল আপনার কাজ শেষ হয়ে যাবে।' খুশী হয়ে কাগজপত্তর নিয়ে একগাল হেসে, রাম রাম জানিয়ে দেওকীনন্দন সিংজী বেরিয়ে গেলেন, শচীনবাবুও উঠে পড়লেন।

পরের দিন যথারীতি নিজ দলিলের সই-সাবুদ, দেনা-পাওনা, রেজিস্ট্রি শেষ করতে প্রায় তিনটে বেজে গেল, শচীনবাবু নিশ্চিন্ত। ক্লান্ত হয়ে রামুকে বললেন গাড়ী ডাকতে। গাড়ী আসতে শচীনবাবু যত্ন করে সাবধানে ওকালতি ব্যাগটি পাশে নিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলেন, রামু সামনে, গাড়ী চললো বাড়ীমুখো।

সন্ধ্যায় চা-বিস্কুট খাওয়ানোর সময় রামু দেখলে বাবুর মুখ খুশী খুশী; সে সাহস করে বললে, 'বাবা, দেওকী ব্যাপারী যদি মাসে তিন'শ টাকা ভাড়া নিয়মিত না দেয়, অথচ একুশ বছর বাড়ী বাগান দখল করে বসে থাকে তো?'

শচীনবাবু হেসে বললেন, 'নালিশ করে উঠিয়ে দেওয়া যাবে, পঁচিশ হাজার সেলামীও দিয়েছে, আইনে বাঁধা আছে, তুই ভাবিস না।' বাবু বলছেন বটে কিন্তু লোকটার ওপর রামুর আস্থা নেই, সহরের লোকরা ওর সম্বন্ধে যা সব বলে! শেষে ফলের গাছগুলো কেটে বিক্রি করে না দেয়। সে মাথা চুলকে বললে, 'আমাদের লোকজনদের ঘরদোর নিয়ে ঝামেলা থাকবে না তে?'

শচীনবাবু তার দিকে চেয়ে বললেন 'আমি কি এত কাঁচা উকিল মনে করছিস বেটা! তোদের কোন ভয় নেই, তোদের প্রত্যেকের নামে নামে ঘরগুলোর দলিল হবে, আর কোয়ার পাড়, পর্যন্ত রাস্তা, বাইরে যাওয়ার পথ সব এজমালি থাকবে তোদের মধ্যে। কালই আমীন আসবে, সিংজীর সামনে মাপজোপ করে খুঁটি গাড়া হবে পাঁচিল দেওয়ার জন্যে; এবাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না, এই মত দলিল হয়েছে।' রামু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

দিন পাঁচের মধ্যে লোকজনদের ঘরগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল। এখন তাদের রাস্তা ঘুরে বড় গেট দিয়ে কাজে আসতে হয়। রামুর কাজ খুব বেড়ে গেছে; সকালে বিকেলে সহরের চেনা লোক, গাঁয়ের মক্কেল, চাষীবাসী, বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। তাদের মুড়কী গুড় লাড্ডু জলখাবার জুগিয়ে চলেছে; সকলেরই ফেরার সময়ে চোখ ছলছলে, উকিলবাবু চিরকালের মত চলে যাবেন, দূর দূর গাঁ থেকে পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ীতে তাদের আসা, বাবুর হুকুম তাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। দু'তিনজন লোক সব সময় সে জন্যে প্রস্তুত রেখেছে রামু।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলে রামু, যারা আসছে, সবাই প্রায় দেশী লোক স্থানীয় বাঙালী বাসিন্দাদের মধ্যে খুব কমই আসছেন। তাঁদের এই ব্যবহার কেন? বাবু তো কারুর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেন না; তাঁদের নিজ দেশীয় একজন এতদিন একসঙ্গে বিদেশে বসবাস, তাঁর চলে যাওয়ার সময় এত নির্লিপ্ত ভাব, স্থানীয় লোকেদের চোখে পড়াই স্বাভাবিক। শচীনবাবুর এদেশীয় লোকের মধ্যে জনপ্রিয়তা তাঁদের ঈর্ষার ইন্ধন জুগিয়েছে কি? এ সম্বন্ধে বাবুর মনে কোন ক্ষোভ দেখেনি রামু। এমন সকলের প্রতি সমভাব সাধুদের মধ্যেও দুর্লভ, রামুর কাছে বাবু সাক্ষাত জীবন্ত দেবতা।

দেখতে দেখতে যাবার দিন এগিয়ে এলো। সুপ্রকাশ এসেছে, লোকজন নিয়ে প্যাকিং নাম ঠিকানা দিয়ে লেবেল আঁটা সব চলছে পুরোদমে, প্রচুর মাল সারা সংসারের এতদিনের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কত কি না থাকে! সংসারের কত স্মৃতি বিজড়িত জিনিস বাসনকোসন, ক্রেটে প্যাক করা ছবির বাণ্ডিল সব শচীনবাবু সঙ্গে নিয়ে যেতে চান তাই ফার্স্ট ক্লাশে না গিয়ে, একটি তৃতীয় শ্রেণীর আধা-বগি ট্রেন কামরা রিজার্ভ করে দিতে বলেছেন। খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল ইত্যাদি আসবাব, মিশনের সাধুরা যা প্রয়োজন নিয়ে গেছেন, বাকি এখন জলের দরে বিক্রয় করতে বলছেন।

সুপ্রকাশ ও রামুর তত্ত্বাবধানে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। বার লাইব্রেরীতে বিদায় সভা ও সংবর্ধনা গতকাল হয়ে গেছে, শচীনবাবুর আপত্তি কেউ মানেননি। যত বিদায় দিন এগিয়ে এসেছে, শচীনবাবু বেশ মনমরা হয়ে পড়েছেন। এতদিনের বসবাস বিহারে। দেশের মায়া ভালবাসা তাঁর নেই, পাটনাই তাঁর অন্তরঙ্গ, এখন যেন আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করছেন। তার ওপর ব্যক্তিগত স্মৃতিজড়িত এই বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার আঘাত তাঁকে একাই গোপনে সহ্য করতে হবে। শচীনবাবুর অন্তর্মুখী চরিত্র জাতি ধর্ম প্রদেশ, দেশ, ছোট বড় চেতনাশূন্য। তাঁর কাছে আত্মীয় কুটুম্ব থেকে নিত্য দিনের গড়ে ওঠা আত্মীয়তা অনেক আকর্ষিক অনেক সুখকর যা পাটনায় পেয়েছেন।

এই শোবার ঘরটি, কত সুখের স্মৃতি, চিরদিনের মত ফেলে কাল তিনি চলে যাবেন আর হয়তো জীবনে আসা হবে না, ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো শচীনবাবুর। পুরোনো দিনের স্মৃতির ভারে ক্লান্ত মাথাটা চেপে ধরলেন বালিশের ওপর।

॥ ৬ ॥

ফণীবাবু বাইরের ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন। এইমাত্র ফিরেছেন ভবানীপুর থেকে, চোখ বুজে ভাবছেন। আনন্দময়ী চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে এসে বললেন, 'কেমন দেখে এলে ঠাকুরপোকে? ঘরদোর গোচানো, থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিকমত হয়েচে তো?'

উত্তর দিলেন ফণীবাবু, 'মোটামুটি গুচিয়ে নিয়েচে, সঙ্গে স্কুলে মাস্টারের বন্ধু সুপ্রকাশ আর রামু, দুজনেই অদ্ভুত করিতকর্মা, তার সঙ্গে একটি পাটনার পুরোনো চাকর আছে। এরি মধ্যে ঘর-বাড়ী চকচকে করে ফেলেচে। বাড়ীটার সুবিধা আচে, একতলার সিঁড়ি থেকে সারা বাড়ী সাদা-কালো মার্বেল বসানো পুরোনো প্যাটানের বড় বড় চারখানা ঘর চওড়া দেয়ালের মধ্যে আলমারী ঘসা কাঁচ লাগানো। দু'ঘরে দুটো পালঙ্ক, বাকি সব এখন ফাঁকা পড়ে আছে তক্তাপোষ ফরাশ করবে বলে, পরে খাবার ঘর, চেয়ার টেবিল প্রয়োজনমত করে নেবে। 'আমি দু'চারটে টেবিল ইজিচেয়ার এখন করে নেব, পরে আস্তে আস্তে সাজানো যাবে, এখন দেয়ালে ছবিগুলো শুধু টাঙিয়ে নিতে হবে। পেরেক রাজমিস্ত্রি দিয়ে সুপ্রকাশ শোবার ঘরে পুঁতিয়ে রেকেছে।'

আনন্দময়ী প্রশ্ন করলেন, 'ঠাকুরপোর শরীর কেমন দেখলে?'

'খুব রোগা হয়ে গ্যাচে খাওয়ার ধরকাট কোরে, ওখানের ডাক্তারবাবুই নাকি তাড়া দিয়ে কলকাতা পাঠিয়েচেন। তাঁর সন্দেহ হার্টের দোষ, কলকাতার ডাক্তাররা ভাল বুঝবেন। শচীনের পুরোনো বাড়ীতে ভাইয়েদের খবর দিয়ে এসেচি; ওর স্বভাব তো জানো কারুর খবর রাখে না, কোন সাহায্য নিতে চায় না, একমাত্র আমাকে ছাড়া।'

চিন্তিতভাবে আনন্দময়ী বললেন, 'রান্নাবান্নায় কি ব্যবস্থা?'

'রামু চালিয়ে নেবে, অন্য কেউ পারবেও না, খুব ধরকাট।' ঘরে এসে ঢুকলো সুলেখা, সে বললে 'বাবা তুমি এসে গ্যাচ, কেমন দেখলে?' তার দিকে চেয়ে ফণীবাবু বললেন, 'মোটামুটি ভালই।' আবদারের সুরে সুলেখা বললে, 'আমায় একদিন কাকুকে দেখতে নিয়ে চলো বাবা, অনেকদিন দেখিনি।'

'সুবিধামত হবে'খন!' বলে চায়ের কাপ নামিয়ে ফণীবাবু উঠে পড়লেন, সঙ্গে আর সবাই।

রাত্রে খাওয়ার সময় সকলের মধ্যে শচীনবাবু নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। তার মাঝে আনন্দময়ী বললেন, 'অনেকদিন হলো সুনের কোন খবর পাইনি, কোন চিঠি আসেনি! কেন যে ঠাকুরপো তাড়াতাড়ি এই সময় সুনেকে বিদেশে পাঠালেন, আমার বুদ্ধিতে আসে না। নিজের শরীর খারাপ, পাটনা ছাড়তে হবে এসব জেনেও দুম করে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন।'

'নিজের শরীরের অবস্থা জেনেই বোধহয় শচীন তাকে কিছু একটা করার উৎসাহ দিতে পাঠালো, মিস লিলির সাহায্য মিলে গেল, নিজের জীবনের সংশয় তাকে দুর্বল করেছে, বেঁচে থাকতে থাকতে সুনীল একটা শিক্ষা শেষ করে আসুক যখন সুযোগ পেয়েছে, পরে হয়তো যাওয়াই ঘটবে না।' আবার বললেন ফণীবাবু, 'শচীন চিঠি পেয়েচে মিস লিলির। তিনি লিখেচেন, দশ-বার ঘণ্টা পরিশ্রম করে রাত্রে খাওয়ার পর শুয়ে পড়চে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বাইরেই কাটাতে হয় আঁকার ব্যাপারে, শরীর ভালই আচে, চিন্তার কারণ নেই।'

আনন্দময়ী হেসে বললেন, 'হ্যাঁ গো, বুড়ি মেমসাহেব সুনেকে যত্ন-আত্তি করে তো, না খরচা নিয়েই খালাস!'

ফণীবাবু একটু ঠেস দেওয়া কণ্ঠে বললেন, 'তুমি কি মনে করো, তোমার বড় বেটা তোমার কাচে ছাড়া আর কোথাও যত্ন পায় না? আগের চিঠিতে সুনীল পঞ্চমুখে প্রশংসা করেচে লিলি আন্টির।'

আনন্দময়ী বললেন, 'ভাল ভাল, খুব ভাল।'

হাসি হাসি মুখে সবাই উঠে পড়লো সুলেখা একবার আড়চোখে চাইল মায়ের দিকে। কামিনী খাবার বাসন ওঠাতে এলো, সকলে যে যার ঘরে গেল।

॥ ৭ ॥

মন যখন সময়ের হিসাব রাখার অবকাশ পায় না, দিন মাস বছর কখন যে কেটে যায় হদিস থাকে না। সুনীলের একবছর কেটে গেল পারীতে আসা। নিয়মিত ক্লাশ করা চলছে গ্রাঁদ শেমিয়ের চিত্রশিক্ষালয়ে। চৌকির ওপর দাঁড়ানো মডেল রীতা, সম্পূর্ণ বিবসনা। চারিপাশে ছাত্ররা তাকে ঘিরে যে যার ছবি এঁকে চলেছে। প্রথম কিস্তি, সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট স্থির নিশ্চল পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকবে, এর মধ্যে ছাত্রদের কাজ সেরে নিতে হবে; এর জন্যে মডেলের প্রাপ্য দেড় ফ্রাঙ্ক, সকলে ভাগ করে দেবে। যদি দু'বার দাঁড়াতে হয়, পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে আবার দাঁড়াবে, এবারেও একই মজুরী পাবে। মডেলের জীবিকা এই নগ্ন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। অনেক

মডেল আছে এই পেশায়, ছাত্রদের শিক্ষার অবশ্য অঙ্গ এই মডেলরা। তাদের এই নগ্নাবস্থা শিল্পীদের উপভোগের জন্য নয়, সৌন্দর্য স্বষ্টির শিক্ষা উপকরণ হিসাবে। শিল্প-গোষ্ঠীর বাইরে সাধারণ লোকের ধারণা এরা সকলেই ভ্রষ্টা, অপবিত্র, কুরুচিসম্পন্ন নারী-বিশেষ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এটা সত্য নয়; অনেক শিল্পীর বিবাহিত স্ত্রী, অনেক দুঃস্থ পরিবারের কন্যাও এই পেশায় থাকে। এ অভিজ্ঞতা স্থনীলের হয়েছে যে মডেল সংসারের চাহিদা মেটাতে এই পেশায় এসেছে। অনেক শিক্ষিত মহিলা, শিল্পীকে সাহায্য ও নিজের অমরত্ব আকাঙ্ক্ষায় মডেল হতে উৎসাহিত হয়েছেন। এঁদের না পেলে ইউরোপের অনেক বিশ্ববিখ্যাত অমর স্বষ্টি সম্ভব হতো না। ঘৃণা বা অবজ্ঞা এঁদের প্রাপ্য নয়। স্থনীল এ কথা উপলব্ধি করেছে কাজের মধ্যে। সে যখন রীতার মডেলে নানা ভঙ্গি নকল করে, তখন তার মন সম্পূর্ণ দেহানুভূতি মুক্ত, সৌন্দর্য স্বষ্টির আবেগে উন্মুখ। এ কাজে চাই একাগ্র নিষ্ঠা, কঠোর অনুশীলন আর নিরবচ্ছিন্ন দর্শনানুভূতি; খুঁজে ফেরা মূল মর্মস্থল, ছবির প্রাণবস্তু। দিনের পর দিন সে চেষ্টা করে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাল ছবি করার, কিন্তু তার তুলি হাত সব সময়ে বাধ্য থাকে না, হাতকে বশে আনতে হবে অনুশীলনের চাবুকে। ক্লাশে কাজ ছাড়া, ক্লাশের শেষেও সে নিয়মিত রীতার সাহায্য নিচ্ছে। অবশ্য রীতা ক্লান্ত থাকলে সেদিন কাজ হয় না। এতে তার অর্থব্যয় বেশী হয় একাই খরচ দিতে হয়। অন্য কোন বাজে খরচ মদ সিগারেট তার না থাকায় চালিয়ে যাচ্ছে হাত খরচ থেকে আর জমা পাউণ্ড থেকে কিছু কিছু নিয়ে। মাঝে মধ্যে ছাত্রবন্ধু বা রীতাকে নিয়ে কফি খাওয়া ছাড়া বাড়তি কোন খরচ করে না। বাবাকে মডেল খরচের কথা এখনও জানানো হয়নি। রঙ তুলি কাগজ মডেল ইত্যাদি খরচের কথা চিঠিতে জানাবে, কিন্তু সময় করে উঠতে পারে না। প্রায় একবছর যে কি ভাবে ঝড়ের মত কেটে গেল, মনে হচ্ছে এই তো সেদিন! রাত্রে কখন-সখনো মামণি, স্থলেখার মুখ ভেসে ওঠে, কিন্তু এত ক্লান্ত তখন, মনে হয় ঘুমের ঘোরে। এত কিছু শেখার আছে, এত কিছু জানার আছে, করার আছে শিল্প-কলায়, তা কোনদিন কল্পনা করেনি। প্রকৃতির এত অফুরন্ত সৌন্দর্য ভাণ্ডার সে জ্ঞানও ছিল না। সখ করে ছবি আঁকা শুরু, এখন গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু, পারের মাটি ছুঁতে পারবে কিনা ভরসা করতে পাচ্ছে না, ভাবনায় ডুবে গেল স্থনীল। পেছন থেকে ডাক শুনলো, 'হাই ইয়োগী, ফাঁকা ক্লাশে বসে বসে কি ভাবছো, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে—না ইয়োগ করছো?'

মডেল রীতা স্থনীলকে ইয়োগী বলে ডাকে। ফরাসী দেশে কেউ কেউ ভাবে ভারতীয়রা মানে, এঁ্যাদুরা সবাই আধ্যাত্মবাদী যোগী। স্থনীলের সংযত কথাবার্তা, স্বভাব, অন্যমনস্কতা রীতার চোখে নতুন লাগে, তাই ঠাট্টা করে ইয়োগী বলতে শুরু করে;

তারপর যেদিন জানলো সোনীল এ্যাদ্রু ব্রাহ্মণ, তখন তো কথাই নেই, সারা ক্লাশে রটিয়েছে ও ভারতীয় ইয়োগী।

রীতা ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারায় সুনীলেরও ভাঙা ভাঙা ফরাসী ইংরেজী ভাষায় গল্প করার সুবিধা হয়। রীতা হাসতে হাসতে পাশে এসে দাঁড়ালো। তার দিকে চেয়ে সুনীল বললে 'তুমি আবার ইয়োগী বলছো, নটি গার্ল! তুমি জানো আমার নাম সোনীল, তাই না?'

তার গলার স্বরে ঘাবড়ে গিয়ে রীতা বললে, 'আমি দুঃখিত সোনীল, এবারের মত ক্ষমা করো!'

'আজ নিয়ে কতবার হলো ক্ষমা চাওয়া ম্যাদামোয়জেল?' কোমর বেঁকিয়ে সম্মান দেখিয়ে হাত ঘুরিয়ে বললে সুনীল।

রীতা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বিনীতভাবে বললে, 'থামো, আমি ম্যাদামোয়জেল নই, শুধু রীতা, শিল্পীদের সেবিকা, তুমি ভালই জানো।'

সুনীল হাসিমুখে চাইলো রীতার চোখের দিকে, নীল স্বচ্ছ গভীর চোখ দুটি মমতা ভালবাসায় ভরা, বললে, 'চলো রীতা, একটু কফি পান করা যাক্ রাস্তার ধারের কাফেতে।'

'আপত্তি নেই মঁ্যাসিয়!'

কাফেতে এখন ছেলেমেয়ে ভর্তি, কোনরকমে কোণার দিকে দুটো চেয়ার নিয়ে বসে পড়লো। সকলের দৃষ্টি তাদের দিকে পড়েছে, সকলেই প্রায় শেমিয়েরই ছাত্রছাত্রী। কেউ কেউ হাত তুলে স্বাগত জানালো। একটু হেসে রীতা বললে, 'তুমি কি জানো সোনীল, তোমার সঙ্গে আমাকে কাফেতে দেখে ওরা কি ভাবছে?'

ভুরু কুঁচকে সুনীল বললে, 'কি আবার?'

'ওরা ভাবছে মডেলটা আজ বাগিয়েছে, (একটু হেসে আবার বললে) ঈর্ষায় মরে যাচ্ছে, বুঝলে?'

'কেন—কেন?' সহজ ভঙ্গিতে বললে সুনীল।

ঠোঁটে একটা শব্দ করে রীতা বললে, 'তুমি একটি বোকা।' সুনীল বোকার মতই হাসলো।

কফি দিয়ে গেল; দু'জন চুমুক দিতে দিতে পরস্পরের দিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে রইলো। সুনীলের রীতা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থাকলেও যেচে কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা তার মনোমত নয়। কাজের মধ্যেই তাদের দেখাশোনা। আঁকার সময় রীতার সুতনুকা, সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দেহসৌষ্ঠব সুনীলের কাছে ক্রম-ছন্দেবাঁধা সঙ্গীত।

সৌন্দর্য সৃষ্টির জীবন্ত প্রতীক। তার মনে নির্মল সৌন্দর্য অনুভূতি ছাড়া অন্য কোন চেতনা আনে না কাজের সময়ে। রীতাকে সে সম্ভ্রমের আসনেই রেখেছে, কলা সাধনার হাতিয়ার। 'কিছু খাবে রীতা?'

'সামান্য কিছু।' সুনীল উঠে গিয়ে দুটো প্লেটে খাবার নিয়ে, দু' মগ কফি দিতে বলে, এসে টেবিলে বসলো। রীতা চিজকেকে একটা কামড় দিয়ে বললে, সোনীল, তুমি তো আমার কোন পরিচয় জানতে চাওনি, ধারণা মডেলের কিবা পরিচয় থাকতে পারে, বুর্জোয়ারা কাজের লোকদের পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

'ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কি বলছো।' ক্ষুব্ধ স্বরে সুনীল বললে। হাতজোড় করে সে আবার বললে, 'তুমি আমার কাছে সম্মানীয়া বান্ধবী সহকর্মী, তোমার কথায় আমি নিষ্ঠুর আঘাত পেলাম রীতা!'

'বুঝিনি সোনীল, আমি দুঃখিত, আমায় ক্ষমা করো আমার ভুলের জন্যে।'

টেবিলে রাখা সুনীলের হাতের ওপর হাত ছোঁয়াল রীতা। অনুতপ্ত কণ্ঠে শুরু করলো, 'শোন সোনীল, আমার একটু পরিচয় না জানিয়ে পাচ্ছি না আমার দুঃখের কথা, তুমি বিরক্ত হবে না তো?'

'না না, প্লিজ বলো।'

একটু এদিক ওদিক চেয়ে রীতা বললে নিম্নস্বরে, 'এখানে অসুবিধা হবে, সবাই উৎসুক, চলো পাশের পার্কে যাই।' সুনীল বিল মিটিয়ে বাইরে বেরোল দুজনে।

পার্কের ভেতরে একটা ভাস্কর্যের পাদদেশে তারা বসলো। সুনীল কেয়ারী করা রঙ-বেরঙের ফুলের দিকে চেয়েছিল, তা দেখে হেসে বললে রীতা, 'আর বলা হলো না, আজ থাক অন্য দিন।' সুনীল লজ্জিত হয়ে গভীরভাবে চাইল রীতার মুখের দিকে। রীতা বললে, 'ওরকমভাবে চেয়ে থাকলে আমি মডেল হয়ে যাবো, একটা কথাও মনে আসবে না।'

সুনীল বললে, 'তোমার দিকে না চাইলে তুমি ভাববে আমি অন্যত্র বিচরণ করছি, শুরু করো, আমি চেয়েই থাকবো।'

হেসে রীতা বললে, 'আচ্ছা—আচ্ছা! শোন, আজ অল্পেই শেষ করবো, সময় কম। আমি বিবাহিতা, এক সন্তানের জননী। তাকে মানুষ করার খরচের জন্যেই এই মডেল বিত্তি। লেখাপড়া শেষ না করেই নাবালিকা বয়সে এক শিল্পী মহাশয় আমায় প্রেমের খেলায় মাতায়; তাকে ভালবেসে এই সন্তানলাভ ঘটে। বিবাহ অনিবার্য হয়ে পড়ে। দু' বছরের মধ্যেই শিল্পী মহাশয় নিরুদ্দেশ। প্রায় সাত বছর হয়ে গেছে তার কোন ঠিকানা পাইনি। মায়ের আশ্রয়ে থেকে কিছু কিছু রোজগার করে কোনরকমে চলে; ছেলেকে স্কুলে দিয়েছি, এখানে লেখাপড়ার খরচ লাগে না। তবু খরচ তো কিছু আছে!

আমার অনেক রোজগার হতে পারতো, কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ, আত্মসম্মান বজায় থাকতো না। তাই শুধু মডেল পেশাতে আটকে আছি।'

সুনীল বললে, 'তোমাদের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ দুটোই আইনগত। তুমি আবার বিবাহ করলে না কেন?'

'ঘেন্না ধরে গ্যাছে একবারেই, আবার?' রীতার মুখে ম্লান হাসি। হাতের ঘড়ি দেখে বললে, 'আমায় অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে সোনীল, শুভ বিদায়!'

সুনীল তার পাশে পাশে এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, 'আমার জন্যে দেরী হলো, তুমি হেঁটে যেও না, বাসে যাও।'

'আমার এত পয়সা নেই বাজে খরচ করার, এখুনি পৌছে যাবো, ভেবো না।'

পকেট থেকে একটা নোট বার করে হাতে গুঁজে দিয়ে বললে সুনীল, 'এখন নাও, পরে শোধ করে নেবো একটু বেশী খাটিয়ে।'

রীতা তার দিকে চাইল, হাসলো, তার গভীর নীল চোখ নেচে উঠলো, 'ধন্যবাদ!' বলে চলে গেল।

রিক্তা, পরিতক্তা মাতা! সুনীল বাড়ীমুখো বাসে উঠে বসলো, ভারী মন নিয়ে।

॥ ৮ ॥

১৯৩০ সালের ২২শে মার্চ ভারতের জনজীবনে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। লবণ আইন অমান্য উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর ডাণ্ডি যাত্রা। সেই সঙ্গে প্রায় সমগ্র দেশে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম, আইন অমান্য আন্দোলন। মেদিনীপুরে কাঁথি সমুদ্র কিনারায় ডাণ্ডি মার্চের পরেই ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কাঁথিতে লবণ আইন ভঙ্গ করা হলো। কলকাতায় ফণীবাবুরা এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন, বে-আইনী লবণ বিক্রয়, পুলিসী অত্যাচার জুলুমের সংবাদ প্রচার, অর্থ সংগ্রহ, কাঁথিতে সত্যাগ্রহী শিবিরে খাদ্য প্রেরণ তাঁদের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। ফণীবাবু গ্রেফতার হওয়ার পর এই কাজে সুলেখাও আগ্রহ দেখিয়েছিল, কিন্তু তার পড়াশোনার ক্ষতি হবে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছিলেন আনন্দময়ী। তাছাড়া বাড়ীতে একা মণ্টুকে নিয়ে থাকবেন কি করে। সব কথা ভেবে সুলেখা ক্ষান্ত হয়েছে।

সুনীলের চিঠি কদাচিৎ আসে। ছবির পোস্টকার্ডে দু'চার লাইন লেখে, সময় নেই, আমার চিঠি না পেলেও চিঠি দেবে। বাবা জেলে যাওয়ার পর থেকে মণ্টুকে নিয়ে প্রায়ই শচীনকাকুর খবর নিতে যায়। তাঁকে দেখে বড় কষ্ট হয়, একা একা রামুকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। মাঝে মাঝে সুপ্রকাশ অবশ্য খবর নেয়। শরীর ভাল নয়,

কিছুদিন আলীপুর কোর্টে বেরোবার পর ডাক্তার বারণ করেছেন এখন পূজাপাঠ নিয়ে থাকেন। মিস লিলির চিঠিতে সুনীলের খবর পেয়েছেন, শরীর ভাল আছে, শিক্ষাকর্ম ভালভাবে চলছে, উন্নতি করছে, চিন্তার কারণ নেই। মাঝে একটা সুনীলের চিঠি পেয়েছিলেন রঙ, তুলি, কাগজ, মডেল এইসব বাবদ কিছু বাড়তি টাকা লাগবে। কাকু বলেন, ঠাকুরের দয়া যা করেন, তুমি আমি কি বা করতে পারি? তোমার বাবার জন্যে চিন্তা হচ্ছে, এই বয়সে জেলখানার খাওয়া-দাওয়া সহ্য হলে হয়! যাক্ আর বেশিদিন নয়, গোলটেবিলের কথা চলছে লণ্ডনে, হয়তো শীঘ্রই ছাড়া পেয়ে যাবেন। শচীনকাকুর অদৃষ্টকে মেনে নীরবে সহ্য করা এই একাকিত্ব সুলেখাকে বিস্মিত অভিভূত করে ফেলেছে। ভাই বন্ধু স্বজন সকলের কথা উপেক্ষা করে বহুদিন গতায়ু পত্নীর স্মৃতি সম্বল করে এই একক জীবনযাত্রা কজনের সাধ্যে কুলোয়?

সুলেখা সময় পেলেই আসে এ মানুষটির কাছে। এঁর স্নেহভরা ব্যবহার তাকে আনন্দ দেয়, সাহস, দেয়, সান্ত্বনা দেয়, বাসনা সংযমে উৎসাহ দেয় তাঁর চরিত্র।

সেদিন রামুদা বললে, 'দিদিমণি আপনি এলে বাবু খুব খুশী হন, সেদিন বাবুর মুখের চেহারাই পাল্‌টে যায়। মাঝে মাঝে আসবেন দিদিমণি।'

'হাঁ রামুদা আসবো' বলে আশ্বাস দিয়ে সুলেখা বাড়ী ফেরে ভারাক্রান্ত মনে। এখন সে প্রায় হপ্তাহেই যায়, একাই যেতে পারে।

এবারে ফণীবাবুকে কারাবাস বেশীদিন করতে হয়নি; ছ'মাসের মধ্যে ১৯৩১ সালের জানুয়ারীর মধ্যে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরলেন। বাড়ী ফিরে সকালের জলখাবার খেয়ে দু'একটা কথা বলেই শচীনবাবুর খবর নিতে গেছলেন। ফিরলেন তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আনন্দময়ী খুব রাগারাগি, দুপুরের ভাত নিয়ে তিনি বসেছিলেন তিনটে পর্যন্ত। ফণীবাবু অপরাধী গলায় বললেন, 'কি করবো আনন্দ, শচীন না খাইয়ে কিছুতে ছাড়লো না, অনেকদিন পর দেখা?'

আনন্দময়ী গজগজ করতে করতে চলে গেলেন রান্নাঘরে। ফণীবাবু লাইব্রেরীঘরে সুলেখা বাবার কাছে গেল, তাকে দেখে ফণীবাবু বললেন, 'আয়, বই নিয়ে তোর মার্চে পরীক্ষা না? এবার আই-এ, আই-এসসি এগিয়ে দিয়েছে নাকি?'

'জানি না বাবা, আজ পড়া থাক, তুমি বিশ্রাম করো, কাল থেকে বসবো।' সুলেখা বললে।

'আরে বিশ্রাম এই ক'মাসই করলুম। শচীনকাকু তোর খুব সুখ্যাতি করলে,

বললে এমন মেয়ে দেখা যায় না, বড় মিষ্টি মেয়ে। ফণীদা ওকে ভাল করে দেখেশুনে বিয়ে দিও।'

আনন্দময়ী চা নিয়ে ঘরে এলেন, বললেন, 'এসেই বাপবেটিতে কি পরামর্শ হচ্চে শুনি?'

'তোমার রাজ্যতে বিদ্রোহ কি করে আনা যায়, সেই পরামর্শ মহারাণী।'

'কেন, এতবড় বিদ্রোহ করে এলে তবু আশ মেটেনি? ইংরেজরা খাইয়ে পরিয়ে জামাই আদরে বাড়ী পৌঁছে দিয়েচে, আমার রাজ্যে বিদ্রোহ হলে পেটে ভাত জুটবে না সে খেয়াল আছে?'

'ওরে বাবা, শান্তি প্রস্তাব দিচ্চি, চৌক টেবিলেই হয়ে যাক্ মহারাণী!' হাসতে হাসতে বললেন ফণীবাবু।

'বেশ তবে শান্তিপ্রিয় প্রজার মত খেয়ে নাও।' আনন্দময়ী চেয়ারে বসলেন, মণ্টু ঘরে ঢুকে মায়ের পাশে দাঁড়ালো। তার দিকে চেয়ে ফণীবাবু বললেন, 'এই যে মণ্টুবাবু, পরীক্ষা কবে?'

'মার্চের প্রথমেই।'

'মাস্টার মশায় নিয়মিত পড়াচ্চেন তো? দরকার হলে আমার কাচে পড়তে পারো।'

মণ্টু মাথা নাড়লো হ্যাঁ, ও হয়, না ও হয়। তার ভরসা মা, বাবার কাছে পড়ার গরজ নেই। লুচি ছেঁচ্‌কী থালা ভর্তি আনলো কামিনী; ফণীবাবু বললেন, 'একা আমি এত খাবো না, তোমরা সবাই খাও।'

আনন্দময়ী ইসারা করলেন, সুলেখা মণ্টু লুচি তুলে মুখে দিল। ফণীবাবু বললেন, 'আনন্দ তুমিও খাও!'

'কি যে বলো, বুড়বয়সে ভীমরতি হয়েচে?' রাগের সুরে আনন্দময়ী বললেন।

ফণীবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আনন্দ, কি বেস্মই হয়েচ? স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর খাওয়া নিষিদ্ধ, এই মতটা ভুলতে পারোনি। তুমি আজ আমার সামনে একটা অন্তত লুচি না খেলে আমি খাওয়া বন্ধ করলুম!'

হাত গুটিয়ে নিলেন ফণীবাবু, ছেলেমেয়ে বলে উঠলো, 'খাও না মা, কি যে করো এখনকার দিনে!' আনন্দময়ী ফাঁপরে পড়লেন, কোনদিন যা হয়নি বাধ্য হয়ে রক্তিম আননে একটা লুচি তুলে মাথা নীচু করে মুখে দিলেন। মণ্টু ও সুলেখা হাততালি দিল, ফণীবাবু হাসিমুখে চাইলেন তাঁর দিকে, বললেন, 'আজ রাত্রি থেকে রোজ সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়ার আইন চালু হলো। আনন্দ, তোমার রাজ্যে আমাদের বিদ্রোহের প্রথম ফললাভ। পুরোনো আইন ভঙ্গ নূতন আইন চালু।' হাসতে হাসতে সুলেখা ও মণ্টু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আনন্দময়ী প্রশ্ন করলেন, 'হাঁগা, ঠাকুরপোকে কেমন দেখলে ?'

চিন্তিত মুখে ফণীবাবু বললেন, 'মোটেই ভাল মনে হলো না। আলীপুর যাওয়া বন্ধ, সামনের ফুটপাতে পায়চারি দুবেলা, খাওয়া-দাওয়া খুব ধরকাট।'

'এই সময় ছেলেটাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলে, তিনি যে আবার কি ধিঙ্গি হয়ে আসেন।' আনন্দময়ী হতাশ ভাবে বললেন।

ফণীবাবু বললেন, 'মিস লিলি চিঠিতে জানিয়েছে, সুনীল কাজের সুনাম করেছে খুব খাটছে, ধিঙ্গি হবে কেন ?'

আনন্দময়ী চলে গেলেন, ফণীবাবু গেলেন লাইব্রেরীঘরে।

* * *

রাত্রের খাওয়াশেষে ছেলেমেয়ে উঠে যাওয়ার পর আনন্দময়ী আবার সুনীলের কথা তুললেন, অনেকদিন তিনি চিঠি পাননি সুনীলের। তিনি বললেন, 'আর কতদিন সুনে প্যারিসে থাকবে গো ?'

ফণীবাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু লক্ষ্য করে বললেন, 'আরো একবছর তো বটেই, বেশীও হতে পারে।'

ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন আনন্দময়ী, 'বাবাকে চিঠি দেয়, না শুধু মিস লিলিরই চিঠি আসে ?'

'মাঝে একটা বড় চিঠি দিয়েছিল কিছু খরচ বাড়ানোর জন্যে ; লিখেছে, মডেল নিয়ে বেশী আঁকার অভ্যাস করতে হচ্ছে, তাছাড়া তেল রঙ কাপড় কাগজ সবই বেশী লাগচে। আট-দশ ঘণ্টা শুধু আঁকতে হয়, তার ওপর ছবি দেখা, শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা আছেই। সবে মিলে খরচা বেশী লাগচে, বাজে খরচ কিছু নেই। লিলি আন্টি খুব যত্ন করেন, শরীর ভালই আছে, কোন চিন্তা করো না।' ফণীবাবু বললেন।

একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দময়ী প্রশ্ন করলেন, 'মডেল কি গো ?'

প্রশ্ন এড়ানোর জন্যে ফণীবাবু বললেন, 'ও আমি ভাল বুঝি না, তুমিও বুঝবে না।' অন্য কথা পাড়লেন, 'আনন্দ, আমি জেলে থাকার সময় তোমার খরচপাতি কুলিয়ে গ্যাচে তো ? যদি কোন বাকি থাকে আমায় জানিয়ে দাও, কাল ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দেবো।'

হেসে বললেন আনন্দময়ী, 'টেনেটুনে চালিয়ে নিয়েচি। যাক্ সংসারের কথাটা মনে পড়েচে দেকচি।'

'মনে নিশ্চয় পড়েচে জেলে বসে বসে, কি করবো, এই ইংরেজ ব্যাটারা না গেলে দেশের অবস্থা আরো খারাপ হতেই চলবে।'

'সব তো বুজলুম, কিন্তু (চারিদিকে চেয়ে নিয়ে আনন্দময়ী বলে গেলেন) মাথার

ওপর যে পাথর চাপা সেটার কথা তো ভাবতে দেখি না? মেয়ের বয়স বসে নেই, বেশ বেড়েচে, পাত্তর খোঁজা উচিত, অথচ তোমার হুঁশ নেই, সারা দেশ নিয়ে মত্ত!'

ফণীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে! ওকে আই-এ, বি-এ'টা পাশ করতে দাও, এখনি বিয়ের কথা ভাবচো কেন? সুলেখা তো বলেই দিয়েচে, গ্রাজুয়েট না হয়ে বিয়ে করবে না, তুমি কি জোর করে বিয়ে দেবে নাকি?'

'তখন পাত্র জুটবে বাঙালী সমাজে? এ্যাকে বয়স বেশী তায় লেখাপড়া বেশী, কোথায় খুঁজে বেড়াবে ঘর বর।'

ফণীবাবু বললেন, 'কি যে বলো! দিন কাল পাল্টেচে, আরো পাল্টাবে।'

মাথায় হাত দিয়ে আনন্দময়ী বললেন, 'আমার কপাল! কি যে ভাবচো!'

হেসে উঠে দাঁড়িয়ে ফণীবাবু বললেন, 'আজ আর থাক চলো তাড়াতাড়ি, অনেকদিন ভাল করে ঘুমোন হয়নি নিজের বিছানায়।'

ঠাট্টার স্বরে আনন্দময়ী নীচু গলায় বললেন হেসে, 'ঘুমোনর শেষ হবে না তোমার, লজ্জা করে না?'

'লজ্জা নারীর ভূষণ, পুরুষের নয় গো। চলো, ওঠো!' দু'জনে বেরিয়ে চারিদিকে খিল ছিটকিনী দেখে নিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকলেন।

॥ ৯ ॥

শমিয়ের ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে সুনীল সোজা কাফের দিকে চললো। পারীর রাস্তায় পা দিলেই মনটা জুড়িয়ে যায়। চারিদিকে গাছ, ঘাস, পার্ক-ভর্তি ফুলের বাহার। প্রতিটি মানুষের যেন সযত্নে রক্ষিত আপন আঁঙিনা, ক্লান্তি দূর করে নিমেষে মনটাকে প্রফুল্ল করে তোলে। সুনীল আজ খুব ক্লান্ত, নূতন এক মডেল নিয়ে কাজ করতে হয়েছে, কথাবার্তা, চালচলন মণিকার ভাল মনে হয়নি, পুরো পেশাদার, শরীর সর্বস্ব। রীতা আজ দেরীতে এসেছে, সময় হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে সুনীলকে অন্য দলে কাজ করতে হয়েছে। কাফেতে একমগ কফি নিয়ে বসলো। মনে এলো কলকাতার কথা; সুপ্রকাশের চিঠিতে জেনেছে বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না। এত সময় আর খরচা লাগবে, একবার দেখে আসার কথা ভাবাই যায় না! কফি শেষ করে দাম দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বসলো পার্কে মর্মরমূর্তির নীচে। মুহূর্তে মনটা শান্ত হয়ে এলো, ঘাসের ওপর সূর্যের আভা দেখতে দেখতে কখন যে রীতা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে খেয়াল হয়নি, হঠাৎ নাকে পরিচিত গন্ধ পেতে ফিরে দেখলো, হাসিমুখে রীতা দাঁড়িয়ে। খুশীর স্বরে বললে, 'হ্যালো

ম্যাদামোয়জেল, কতক্ষণ এসেছো, আজ দেরী করলে কেন আসতে ? দয়া করে একটু বসবে ?'

পাশে বসে শান্তস্বরে বললে রীতা, 'সোনীল, ফের ম্যাদামোয়জেল বললে আমি কিন্তু সেদিন থেকে একবারও ইয়োগী বলিনি। আমি সরলভাবে তোমার কাছে রীতা নামে পরিচিত। মুখ গোমড়া পেঁচার মত করে ঘাসের দিকে চেয়েছিলে কেন ? আজ তো তোমার নূতন মডেল পেয়ে উৎফুল্ল হবার কথা। আর আমার দেরী হওয়ার কারণ ছেলের স্কুলে একবার যেতে হয়েছিল তাই।'

'দুঃখিত। রীতা! তোমার ছেলের কত মাহিনা লাগে স্কুলে, জানতে ইচ্ছে করছে ?'

'১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফরাসী বালক-বালিকাদের ছ'বছর থেকে তেরো বছর পর্যন্ত বিনা খরচায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদান আইন আছে, তাই এখনও একবছর কোন খরচ লাগবে না। যাক্ তোমার মণিকাকে কেমন লাগলো বল।'

'কারুর অসাক্ষাতে মন্দ বলাটা আমি এড়িয়ে চলি।' হেসে বললো সুনীল।

'তবু একটু বলই না, ওর সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে আমি খুব আগ্রহী।'

'বেশ তবে শোন, দেহসর্বস্ব হৃদয় বা বুদ্ধি দুটোর একটাও নেই। মাংসপেশী ও যৌনতা ছাড়া আঁকার কিছু মেলেনি আমার। তুমি তো জানো আমার চেয়ে বেশী, তবু আমার মুখ থেকে শোনার আগ্রহ কেন ?'

হাসি হাসি মুখে রীতা বললে, 'আর কিছু শোনার নেই সোনীল, আমি যা জানার জেনে নিয়েছি।'

'পাজি মেয়ে, শুধু ঈর্ষা।' একটা চড় মারলো কড়া চোখে চেয়ে; রীতা ম্লান মুখে তার দিকে চাইল; সুনীল তার গভীর হয়ে ওঠা ঘন নীল চোখের দিকে ক্ষণিক চেয়ে থেকে হেসে ফেললো, পরে দুজনেই। ঘাসের দিকে চোখ পড়তে সুনীল বললে, 'দেখ দেখ, ঘাসের রঙ কত পাল্টে গ্যাছে !'

'এত সহজে তোমার চোখে পড়লো ?' রীতা প্রশ্ন করলে।

'নিশ্চয়, কেন পড়বে না ? আকাশ, মাটি, গাছ পাতা মায় তোমার মুখের রঙ, সবই তো চোখে পড়ে, পড়ছে।'

রীতা সুনীলের দিকে প্রশংসা ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'তুমি শিল্পী হোয়ে গ্যাছ, কিম্বা হোয়েই ছিলে, এখন চাই তুলির ওপর অধিকার, চাই পরিশ্রম।'

'থামো রীতা। আজ বড় খোসামদ করছো।'

'বিশ্বাস করো সোনীল, আমার কথায় একবিন্দু খোসামোদ মেশানো নেই !' সুনীলের

হাতের ওপর রীতা হাত রাখলো। সুনীল রীতার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, 'ক্লাশ থেকে আজ তাড়াতাড়ি ছুটি নিলে, শরীর খারাপ নাকি?'

'না এমনি, ভাল লাগলো না।'

'তোমার রোজগার আজ অর্ধেক হয়ে গেল?' চিন্তিতভাবে বললে সুনীল।

'হোক।' একটু থেমে আবার বললে রীতা, 'দেখো সোনীল, অন্য সব ছাত্ররা আমায় ভাল চোখে দেখছে না মনে হয়, কেমন যেন বাঁকা বাঁকা কথা বলে; জানো সোনীল, এদেশীয় ছাত্রদের অনেকেই মডেলের কাছে বাড়তি কিছু প্রত্যাশা করে, তোমার ওপর ঈর্ষাও আছে। একজন আজ বলেই ফেললো, কি আজ তোমার মাস্টার-পেণ্টার মণিকাকে নিয়েছে যে? রেগে উত্তর দিয়েছি, বেশ করেছে নিয়েছে, তোমার তাতে কি আসে যায়!' দু'জনেই বাগানের দিকে চেয়ে নীরব হয়ে গেল। সূর্যাস্তের বিচিত্র আলোছায়া, দূরে কুয়াশার বিষাদময়তা দু'জনকেই বোধহয় তন্ময় করে দিয়েছিল, বেশ কিছুক্ষণ পর রীতার হুঁশ হলো, বললে, 'আজ যাই সোনীল, শুভ বিদায়, কাল ঠিক সময়মত আসবো।'

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।'

যেতে যেতে রীতা বললে, 'তুমি কি জানো তোমাদের গাঁধীজী আজ লণ্ডনে পৌঁচেছে স্বাধীনতার জন্যে বোঝাপড়ার কথায় গোলটেবিল বৈঠকে ইংরেজদের সঙ্গে।'

'আমি ঠিকমত জানি না, অনেকদিন কাগজ দেখার সুযোগ পাইনি।' লজ্জিতভাবে বললে সুনীল।

'তুমি স্বাধীনতা চাও না?' কড়াভাবেই বলে ফেললো রীতা।

আমার খুব অন্যায় হয়ে গ্যাছে রীতা, একদম ভুলে গিয়েছিলুম, কাল ভাল করে কাগজ দেখতে হবে, ভুলে গেলে আমায় মনে করিয়ে দিও দয়া করে!'

'ঠিক আছে!' হেসে বললে রীতা।

'দেখো, আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কারাবাস করছেন, আমার উচিত ছিল খবর রাখা দেশের, কি অন্যায় যে হয়ে গ্যাছে!' স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সুনীলের দিকে চেয়ে হেসে বললে রীতা, 'আর্টিস্টরা পাগলাটে হয়ে থাকে প্রায়ই, তাই না?'

সুনীল হেসে বললে, 'বাজে কথা, প্রচারিত দুর্নাম শিল্পীদের; পাগল হলে আঁকতে পারে তোমার চোখ, চুল আর ঠোঁট?' রীতার গোলাপী রঙ, মুখ, কান, গাল, লাল হয়ে উঠলো, সে লজ্জায় মাথা হেঁট করে নিলো। সুনীল অপরাধীর মত বললে, 'আমি কিছু ভেবে বলিনি রীতা, আমায় ক্ষমা করো।'

'আঃ, কারণে অকারণে ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস খুব বিরক্তিকর। সব সময় মডেল-

ভেবো না, সরল ভাবে আমরা বন্ধুর মত আচরণ যদি না করতে পারি, কাজের বাইরে মেশা চলে না।' ক্ষুব্ধস্বরে রীতা বললো।

সুনীল ম্লান মুখে বললে, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে, কিছু মনে করো না, ভবিষ্যতে সাবধান থাকবো।'

তার মুখের চেহারা দেখে রীতা হেসে বললে, 'আজ থেকে স্থির হয়ে রইলো আমার কাছে কোনদিন তুমি ক্ষমা চাইবে না সোনীল, কেমন?'

সুনীল মাথা নীচু করলো; তার একটা হাত তুলে নিলো রীতা নিজের হাতের মধ্যে, বললে, 'তোমার হাত কাঁপছে, ঠাণ্ডা হীম! তুমি এত ভাবপ্রবণ, মনটা একটু শক্ত করো ভাই!' তারা হাত ধরা অবস্থায় এসে পৌঁছলো বাস স্ট্যাণ্ডে। রীতা হেসে বিদায় নিল, সুনীল নিজের বাসের দিকে গেল।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে আণ্টির প্রথম কথা 'গান্ধীজী লণ্ডন পৌঁচেছেন। লোক নগ্ন ফকির বলে সংবর্ধনা জানিয়েছে। খুব ভিড় হয়েছিল রাস্তায়। ইংরেজরা এবার ভয় পেয়েছে, রাজত্ব ছাড়তে হবে। সোনীল, তুমি ইভনিং পেপার দেখেছো?'

'না আণ্টি, রীতার মুখে শুনলুম, সকালে কাগজ দেখবো।'

'রীতা কোন বেয়াডাপনা করছে না তো?'

'না আণ্টি।'

'আমি জানি রীতা মেয়ে ভাল, ভদ্রস্বভাব, বেচারার বরাত মন্দ, স্বামীটা ছেড়ে চলে গেল। ছেলেটা শিল্পী ভালই ছিল, রোজগার না করতে পেরে লজ্জায় দেশত্যাগী হলো। কম বয়সের বিয়ে ভাল হয় না।'

সুনীল প্রশ্ন করলে, 'আর কি ফেরার আশা নেই?'

'খুব কম, প্রায় ছ'সাত বছর হয়ে গেল।'

চিন্তিতভাবে সুনীল জিজ্ঞেস করলে, 'রীতার আর বিবাহ হবে না?'

'হতে পারে, তবে মডেল হয়েছে, সমাজে কেবা বিয়ে করছে? মডেল ছাড়া অঙ্কন-বিদ্যা অসম্পূর্ণ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অথচ মডেলদের কোন সামাজিক মর্যাদা নেই; এ নিয়ে শিল্পীদের ভাবা উচিত। সোনীল, তুমি কি এরূপ ছবি আঁকবে?'

'না আণ্টি, আজ কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে।'

'যাও বেশী রাত করো না, শুভ রাত্রি।'

সুনীল প্রথমে বাবাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলো। পরম পূজনীয় বাবা, সুপ্রকাশের চিঠিতে জানলুম তোমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। যদি একবার যেতে পারতুম তোমাকে দেখতে? সময় ও খরচ এত যে ভাবতে হচ্ছে; তোমার অনুমতি পেলে আমি যাবো।

আশা করি রামুদাকে নিয়ে কলকাতার বাড়ীতে তোমার থাকার কোন অসুবিধা হচ্ছে না? বাবা, যদি প্রয়োজন হয় আমি ফিরে যাবো, বাকি কাজ ওখানেই করে নেবো কোন আর্টিস্টের কাছে। তোমার অসুখের খবর পেয়ে আমার মন খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছে ফেরার জন্যে। তোমার আদেশ না পেলে বাধ্য হয়ে আমাকে আরো ছয় মাস থেকে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করে যেতে হবে। এখন আমি আঁকায় অনেক এগিয়েছি শিক্ষকরা বলছেন। এ সম্বন্ধে তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। তোমার পত্রের আশায় রইলুম, আমার প্রণাম জেনো। ইতি সুনীল।

দ্বিতীয় পত্র লিখলো—পরম পূজনীয়া মামণি, আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। জ্যেঠুবাবু জেলে থাকায় তাঁর শারীরিক কোন ক্ষতি হয়নি তো? মামণি, এখানে গান্ধীজীর লণ্ডন আসা নিয়ে খুব আলাপ-আলোচনা করছে। ফরাসীরা খুব খুশী। আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি প্রায় কিছুই জানি না। যদি কিছু বাংলা কাগজ পাঠাতে পারো ভাল হয়। চিঠি দিতে পারি না বলে নিশ্চয় খুব রাগ করেছো? বড় পরিশ্রম মামণি, পেরে উঠি না, ক্ষমা করো কিম্বা ফিরলে খুব মারধোর করো, এখন এখানেই শেষ করি, তোমরা আমার প্রণাম জেনো, ছোটদের আমার ভালবাসা জানিও। ইতি তোমাদের সুনীল।

ঠিকানা লিখে খামে ভরে ঠিক করে রাখলো দু'খানা চিঠি। ঠিকানা লিখতে লিখতে কলকাতার কথা মনে পড়লো, মনে পড়লো একটা মুখ, বিদায়ক্ষণে মর্মস্পর্শী! যে দৃশ্য ভুলতে চাইছিল, যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পারলো না এড়াতে, আর একটা কাগজ টেনে নিয়ে বসলো। এসে থেকে একটাও চিঠি দেয়নি বলা চলে, শুধু 'নোতরদাম' গীর্জার ছবি ছাপা পোষ্টকার্ড 'আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরা সব ভাল। ইনি সুনীল। মামণিকে, বাবাকে সুপ্রকাশকে মাঝে মাঝে দু একটা চিঠি দিয়েছে কিন্তু সুলেখাকে চিঠি দিতে পারেনি, ভেবেই পাচ্ছে না কি ভাবে সম্বোধন করবে! আজও কাগজ হাতে বসে রইলো, ঠিক শব্দটি খুঁজে পাচ্ছে না, বাধ্য হয়ে লিখলো, প্রীতিভাজনীয়াষু, আশা করি ভাল আছ? আজ তোমার কথা মনটাকে দখল করেছে, একটা চিঠি দিয়ে মনটাকে হালকা করতে না পারলে শান্তি নেই। তুমি হয়তো ভাবো আমি এখানে পারী নগরের মোহে মুগ্ধ হয়ে খুব সুখে দিন কাটাচ্ছি! বিশ্বাস করো সুলেখা তা সত্য নয়; যতক্ষণ কাজের মধ্যে থাকি কিছু মনে থাকে না, আলাদা জগতে থাকি, কাজের শেষে তুমি সম্রাজ্ঞী আমার মনের। হাসছো? উচ্ছ্বাস হয়ে যাচ্ছে? আমি তোমাকে ভোলার উপদেশ দিয়েছিলুম ঠিকই কিন্তু নিজে ভুলে যাবো সে কথা কোনদিন বলেছি কি? কাজেই আজ যদি নিরানন্দ প্রবাসে চিঠিতে একটা অধীর উক্তি হয়ে পড়ে, মাফ করো। আমরা মানে পুরুষেরা দুনিয়ায় অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী, কিন্তু তুমি মানে ভারতীয়

নারী প্রথাগত সামাজিক অনুশাসন, জাতিগত বিধিনিষেধ মেনে চলায় অভ্যস্ত, কাজেই তোমার পক্ষে নিয়মবিধি মতে, বিবাহ ও সন্তানে সান্ত্বনা ও তৃপ্তি। এইটেই সহজ স্বাভাবিক। সেইজন্যে তোমাকে ভুলে যাওয়ার কথা বলি। আমার ভোলায় না ভোলায় কিছু আসে যায় না। তুমি প্রিয়তমা, তাই তোমার ভালমন্দ ভাবতে হয় নিজেকে ভুলে। মামণিকে ভালবাসি তাই তাঁকে অসুখী করতে চাই না, তোমাকে ভালবাসি তাই ভুলতে বলি। পড়াশুনা নিশ্চয় চলছে? সুপ্রকাশের চিঠিতে জানলুম তুমি নাকি আমার বাবার খুব প্রিয়পাত্রী হয়েছ? ও একটা খবর তোমাকে জানানো হয়নি। এখানে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী খুব জমেছিল; অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমি বোঝার চেষ্টা করেছি পারিনি, ভাবতে হবে। তুমি সুযোগ পেলে দেখে নিও। বিদায় দাও!...আমার প্রীতি শুভেচ্ছা জেনো। ইতি সুনীল।

চিঠি শেষ করে আলাদা খামে ঠিকানা লিখে রাখলো এক সপ্তাহ পরে পাঠাবে। এরপর সুপ্রকাশের চিঠি শুরু করলো, আজই শেষ করে রাখা ভাল নয় তো কতদিন যে হবে না কে জানে?

সুপ্রকাশের চিঠির কোণায় কিউবিক কায়দায় নারীমুখ স্কেচ করে নিলো। লিখলো—'প্রিয় সুপ্রকাশ, তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হওয়ার জন্যে কোন অজুহাত দেবো না, আমারই দোষ জেনো। তোমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাবাকে দেখাশোনা করার জন্যে। মাসীমা আশা করি ভাল আছেন। তোমার ফাইনাল এপ্রিলে, তার পর এম-এ না চাকুরী, এবং দ্বিতীয় বি-এ শেষ করা। ভাল ছেলেদের কোনদিকেই বাধা নেই সব রাস্তা খোলা। খারাপ ছেলেদের আমার মত অবস্থা, চাকুরী জুটবে না, বিয়ে দিতে ভরসা পাবে না, নাই পাক্ আমরা খারাপ ছেলেরা নিজেদের ঠিক চালিয়ে যাব ভাবিস না। আমাদের জাতভাই একজন মাস্টার পেন্টার লেখাপড়ায় সুবিধা করতে পারেনি বলে আঁকা ধরলেন একটু বেশী বয়সে, ওলন্দাজ উচ্চারণের দোষে বলি ভ্যানগগ্, মরার পর জগৎ বিখ্যাত আসল নাম পরে বলবো। তিনি দু-তিনবার বিবাহ করার চেষ্টা করেন পঁয়ত্রিশ বছরের স্বল্প আয়ুর মধ্যেই, কিন্তু কোনবারেই কন্যাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা কন্যাদানে সম্মতি দেননি। শিল্পী মহাশয় প্রথমবার যে বালিকাকে পছন্দ করলেন, সে ভালবাসার ভান করেছিল আশায় আশায়, কিন্তু দেখলে সুবিধা হবে না। না খেয়ে তো প্রেম চলে না! এ ব্যাপারে পশ্চিমী মেয়েরা খুব পোক্ত ভাই। দ্বিতীয় এক কন্যাকে ভালবেসে ঘনিষ্ঠ হলো, কন্যার পিতা-মাতা, কন্যাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন অন্য সহরে। আর্টিস্ট মহাশয় সন্ধান করে অনেক কষ্টে পায়ে হেঁটে কন্যার পিতার কাছে বিবাহ প্রস্তাব দিল। তাঁরা বললেন, ভেগাবণ্ড, খামখেয়ালী, অবিশ্বাসী, তোমাকে কি করে কন্যাদান

করি ? ভ্যান গগ্ রেগে জ্বলন্ত মোমবাতির ওপর আঙুল ধরে রেখে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে, সে অবিশ্বাসী নয় সত্যই ভালবাসে। কোন ফললাভ ঘটেনি, মাঝ থেকে পোড়া আঙুল নিয়ে অনেকদিন ভুগতে হলো। এই রকম নানা গল্প শিল্পীদের নিয়ে আমাদের আর্ট কলেজে চালু আছে। চিঠি বড় হয়ে যাচ্ছে, শেষে আর একটা গল্প বলে শেষ করি; ভ্যান গগ্ নামে প্রচলিত শিল্পীর আসল নাম ভিন্‌সেণ্ট ফান্ খোখ। জাতিতে ওলন্দাজ; প্রচণ্ড ভাবুক প্রকৃতির। জীবনের শেষদিকে মাথার ঠিক ছিল না অনেকে বলেন। ইতালীর এক ট্রপিক্যাল গ্রাম্য সহরে টুপি, ছাতা ব্যবহার না করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছবি এঁকেছেন দিনের পর দিন, যার ফলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। বিবাহ ব্যাপারে বারবার ধাক্কা খেয়ে ওতে আর মন দেননি। এই ছোট সহরে কৃষ্ণাঙ্গী একটি বালিকা বারনারীর সঙ্গে আলাপ ও যাতায়াত চলে। ছোট ভাইয়ের মাসিক দেড়শো ফ্রাঙ্ক অর্থ সাহায্য থেকে রঙ, কাপড়, কাগজ, তুলি, থাকা-খাওয়া চালিয়ে যেতেন। গাদা গাদা ছবি এঁকেছেন, বিক্রয়ের চেষ্টা নেই। হয়ও নি। একদিন অর্থ না নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গী বালিকার কাছে গ্যাছেন। বালিকা তাঁর একটি কান নিয়ে খেলা করতো প্রায়ই। সে জিজ্ঞেস করলে, তুমি আস না কেন ? ভিন্‌সেণ্ট বললেন, আমার এত পয়সা কই ? কান একটা হাতে নিয়ে বালিকা বলেছিল ঠাট্টা করে, তুমি যদি একটা কান আমায় দিতে আমি তোমার অদর্শনে সেই কানটা নিয়ে খেলা করে সান্ত্বনা পেতাম, টাকার বদলে এটা তো দিতে পারো ? পাগলা শিল্পী সেদিন শুনে গেলেন। পরের দিন সকালে দাড়ি কামাবার সময় দাড়ির সঙ্গে একটি কান কেটে, ধুয়ে মুছে ভাল করে প্যাকেট করে দান করে এলেন কৃষ্ণাঙ্গী প্রেমিকাকে, তারপর হাসপাতালে। কি কাণ্ড ভাবতে পারো ? ভয় পাচ্ছো আমার কথা ভেবে ? ভয় নেই সুপ্রকাশ, আমি দু'কান কাটা হয়েই আছি। এখানেই শেষ করি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, কম্বল ছাড়া রক্ষে নেই। মাসীমাকে আমার প্রণাম জানিও, তুমি আমার কাছে যা চাও নিও। ইতি সুনীল।

সুনীল জুতো খুলে বিছানায় গড়িয়ে গেল কম্বল টেনে নিয়ে।

॥ ১০ ॥

শেমিয়েরে কাজ শেষ করে আজ সুনীল সন্ধ্যার আগেই হ্যামলিটে ফিরেছে। ঘরের টেবিলে আঁকা ছবি রেখে, বাইরের পোষাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। এপ্রিল মাসের কুড়ি তারিখ হয়ে গেছে; চারিদিকে বসন্তের আগমনী সুর। বসন্তের আমেজ আকাশে বাতাসে, গাছপালায়, জমিতে ঘাসের রঙে, পাখীর ডাকে, রাস্তায় ছেলে-বুড়োর

পোষাকে, মুখে। সুনীলকে অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখে মিস্ লিলি বললেন, 'তুমি কি সন্ধ্যা থেকেই শুয়ে থাকবে সন্, শরীর খারাপ লাগছে ?'

সুনীল উঠে বসে বললে, 'এক মগ কফি যদি পেতুম আণ্টি, খুব সুখী হতুম। আজ সেই মণিকা মেয়েটা খুব খাটিয়েছে ভুল করে করে। ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

মিস্ লিলি বললেন, 'ঠিক আছে ভেবো না, এখুনি আনছি।' অল্প সময়ের মধ্যেই কফির মগ হাতে নিয়ে ফিরলেন। 'এই নাও। তোমার দুটো চিঠি এসেছে, আনছি।' চিঠি এনে দিয়ে চলে গেলেন।

চিঠি হাতে নিয়ে দেখলে সুনীল, একটা বাবার, চিঠিটা দেরীতে পেলো ; একটা সুলেখার, চিঠি পেয়েই উত্তর দিয়েছে। কফি শেষ করে বাবার চিঠিটা আগে খুললো। বাবা লিখেছেন, 'স্নেহের সুনীল, তোমার চিঠি পেয়ে খুব চিন্তিত হলুম। আমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তুমি কলকাতায় ফিরে আসার প্রস্তাব দিয়েছ, তাতে আমার একদম মত নেই জেনো। তোমার ভাবনার কারণ বুঝেই জানাচ্ছি, এখানে আমাকে দেখাশোনা করার লোকের অভাব নেই। আমার শরীর এখন ভাল আছে। নিয়মিত বেড়াচ্ছি, খাওয়া-দাওয়া নিয়মমাফিক রামু করে দেয়। সুপ্রকাশ, ফণীদা, সুলেখা পুরোনো বাড়ীর থেকে ছোটভাই, ডাক্তারবাবু প্রায় সারাক্ষণ নজরে রেখেছে। এর চেয়ে বেশী তুমি কি করবে ফিরে এসে ? আমার জন্যে চিন্তা ছেড়ে তোমার শিক্ষার দিকে ভাল করে মন দিলে আমি সুখী হবো জেনো। শিক্ষা সম্পূর্ণ শেষ করে তবে তুমি ফিরবে এই আমার ইচ্ছা। কিছু বেশী টাকা আগামী মাস থেকে পাবে তোমার বাড়তি খরচের জন্যে। আমার জন্যে ভাবনা করিও না। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো, মিস্ লিলিকে আমার মঙ্গল কামনা ও শুভেচ্ছা জানিও। ইতি বাবা।'

বাবার চিঠি পড়ে সুনীল অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। সুলেখার চিঠিটা নিয়ে খুলে পড়া শুরু করলে 'প্রিয়বরেষু, তোমার চিঠি পেলুম। আমার স্বপ্নের অতীত, রত্ন-প্রাপ্তিযোগ বলতেই হবে! তখন তাড়াতাড়ি দুর্লভ বস্তুটি না পড়ে সুটকেশে তোমার ছবির তলায় রেখে আই-এ পরীক্ষার শেষদিনের পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। পরীক্ষা শেষ করে বাড়ী ফিরে আগে দেখে নিলুম ঠিক জায়গায় চিঠিটা আছে কিনা, তারপর জলখাবার খেয়ে বাবার কাছে গেলুম, পরীক্ষায় আজকের রিপোর্ট জানাতে। পরীক্ষা শেষে তোমার পত্র, যেন ডবল আনন্দ। বাবার সঙ্গে গল্প করার মধ্যে মায়ের সঙ্গে মন কষাকষি বাবার কাছে আজই তাঁর মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করলেন, আই-এ হোল, এরপর বি-এ নয় বিয়ে স্থির করেছেন তাঁর জানা একটি ব্রাহ্মণপাত্র, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবংশ ও উত্তম রোজগারী, এ রকম মেলা ভাগ্যসাপেক্ষ। বাবার

সামনে আমি বলে দিলুম রেগেমেগে, আমি বিবাহ করিব না। বি-এ পাশের পূর্বে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা আমি শুনিতে প্রস্তুত নহি জানিও। বাবা মৌন, তোমার মামণি ক্রোধিতা হয়ে রান্নাঘরে প্রস্থান। রাত্রে চিঠি নিয়ে বিছানায় শুলুম, তোমার মামণি নিজ ঘরে শোবার পর নিশ্চিন্ত মনে চিঠি পড়া শুরু করলুম ; কি কায়দা করে লেখা হয়েছে! আমি নাকি তোমার মনের দখলদারনী হয়ে যাই কাজের শেষে, মানে সাম্রাজ্ঞী হয়ে পড়ি। সত্যই বলে থাক আর মিথ্যাই বলে থাক, পড়তে ভালই লাগছিল ; উচ্ছ্বাস মনে হয়নি। তবে নারীর প্রতি তোমার অযাচিত উপদেশ মোটেই ভাল লাগেনি। নিয়ম-বিধিবদ্ধ বিবাহ রীতি, সন্তানে সান্ত্বনা, ইত্যাদি। আমি তোমাদের এই দম্ভ ভাঙবো দেখে নিও। তাতে যদি আমার ভালবাসা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, ভয় পাই না। যাক একটা কথা, তোমার পত্রে আত্ম-উন্মোচন দেখে সুখী হয়েছি, প্রিয়তমা জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছি সুনীল। প্যারীর অনন্য গলিঘুঁজিতে পথ হারিয়ে না যাও অতি-প্রিয়তমার খোঁজ পেয়ে সেই আমার প্রার্থনা দেবতার কাছে। এক টুকরো চিঠি আমায় কতখানি সুখী করে, তোমায় তা বোঝাতে যদি পারতুম লেখায়! আশা করি তুমি, লিলি, আন্টি ভাল আছো? আমার প্রীতি ভালবাসা জেনো। ইতি। একান্ত তোমারি সুলেখা।'

হাতে চিঠিটা চেপে ধরে সুনীল পড়ে রইলো চোখ বুজে। সুলেখার চিঠি সুখী করলো না দুঃখী করলো, বিমনা বিষণ্ণ সুনীল বুঝে উঠতে পারলো না।

॥ ১১ ॥

শেমিয়ের অনুশীলন কক্ষে এঁকে চলেছে সুনীল। নগ্ন রীতা স্থির হয়ে শুয়ে আছে এমন ভঙ্গিতে যে সম্মুখভাগ সামান্য দৃশ্যমান, উপুড় হয়ে শোয়া এক পাশে, পশ্চাৎভাগের মধ্য অংশ প্রকাশ পেয়েছে। মাথার ওপর দু' হাতের মধ্যে সোনালী কুঞ্চিত চুলের ঢেউ ছড়ানো। একদিকের সামান্য মুখের অংশ, কপাল একটু চোখের পাতা ছাড়া কান্নায় ভেঙে পড়া মুখ-মাথা বালিশের মধ্যে গোঁজা। পিঠের মাংসপেশীর সূক্ষ্ম সুষমা, উর্মিল দেহরেখা, ঝরণার ধারার মত বয়ে চলেছে পায়ের দিকে। ঢেউয়ের লালিত্য-ভরা রেখার রূপসৌষ্ঠব সুনীলের তুলির টানে মূর্ত হয়ে নবজন্মলাভ করেছে। রীতার দেহ ছেড়ে পরিবেষ্টনী নিয়ে তুলি চললো সুনীলের। জানালা দিয়ে টুকরো প্রকৃতি আর ঘরের ভেতরে যাকিছু স্থির বস্তু, সবের মধ্যে হৃদয়ভেদী সকরুণ সুর ফুটিয়ে তুলতে হবে সার্থকভাবে ; শোক-সঙ্গীতের মত। 'এলিজী' হবে ছবির নাম। সময়ের নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে গেছে তবু রীতা নীরবে শুয়ে আছে, সুনীলের কাজে যাতে না ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষভাবে সুনীলের জন্যেই সে নিযুক্ত, অন্য কোন ছাত্র এ-ঘরে নেই শুধু

শিক্ষাগুরু আন্টির ভাই, আঁকেল রসেটি, তিনি মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। সুনীল এখন নিজের খুশীমত আঁকবে তিনি কোন উপদেশ দেবেন না। ডিপ্লোমা পরীক্ষার আগের অবস্থা ছাত্র হিসাবে। এখন থেকে স্বাধীনভাবে আঁকার কৌশল শিখেছে কিনা তার নমুনা দেখানো চাই। সুনীল প্রকৃতি, স্থির বস্তু, সব কিছুতে ধূসর, কালো লাল হলুদ নিয়ে সাবধানে তুলি চালাচ্ছে আর দেখছে দাঁড়িয়ে। রঙ দেওয়ার শেষে দেখছে ছবির তীব্রতা। একটু পরে বললে, 'ধন্যবাদ রীত', আজ থাক কাল আবার দেখা যাবে। ওঠো ডিয়ার।' রীতা উঠে তার দিকে হাসলো। সুনীল ছবি ইজেল ঢাকা দিয়ে গুটিয়ে নিলে বললে, 'চলো আজ অনেক পরিশ্রম করেছ, একটু কফি খাবে তো ?'

রীতা মাথা নাড়লো, সুনীল পকেট থেকে কয়েকটা ফ্রাঙ্কের নোট বার করে তার হাতে দিল। রীতা বলে উঠলো 'এত কেন, এত কেন ?'

'আজ তোমার পারিশ্রমিক আরো বেশী দিতে পারলে সুখী হতুম রীতা, আজ তুমি আমায় অনেক সময় দিয়েছ, অনেক স্ট্রেইন গ্যাছে দেহের ওপর, আমি দুঃখিত।'

'এই তো আমাদের পেশা সোনীল।'

'ঠিক কথা, কিন্তু একটানা তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুযোগ দিত না।' অপরাধীর মত সুনীল বেরোতে বেরোতে বললে।

রীতা তার একটা হাত তুলে নিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বললে, 'ভুলে যাই। তোমার আঁকায় সাহায্য করতে পেয়ে আমিও সুখী। এত পর ভেবো না, আমি কষ্ট পাই।' তার গলা ভেঙে এলো শেষদিকে।

সুনীল তার দিকে গভীরভাবে চেয়ে একটু হেসে বললে, 'প্রিয় বান্ধবী, আমি আন্তরিক দুঃখিত তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে ; তুমি একদিন বলেছিলে না, আমরা পাগলাটে হয়ে থাকি, আমাদের কথায় আর মনে মিল থাকে না ?'

মুক্তোর মত দাঁতের সারি প্রকাশিত হলো রীতার, বললে, 'মনে রেখেছ ? বদ্ধ পাগল ইয়োগী!' দু'জনে কফিখানায় ঢুকলো, ভেতরে গিয়ে দু'হাতে দুটো ভাজা খাবারের ডিস নিয়ে সুনীল রাখলো টেবিলে, তারপর বেশিনে গেল হাত ধুতে, ফিরে এসে বসলো সামনা সামনি। কফির পট আর মগ দিয়ে গেল ওয়েটার। হাসিমুখে দুজনে খাওয়া আরম্ভ করলে', দুজনেই ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, আজকের মত কাজ শেষ ভেবে নিশ্চিন্ত। খাওয়া শেষে দাম মিটিয়ে এসে সুনীল বললে, 'এখুনি বাড়ী ফিরতে চাও রীতা ?'

'তেমন কিছু তাড়া নেই।'

'তাহলে বুলভারে কিছুক্ষণ পায়চারি, চলো।'

রীতা হাত তুলে দেখিয়ে বললে, 'ওই বাঁক পেরুলেই সহরের সর্বশ্রেষ্ঠ বুলভার, এখন বসন্তের ফুলের মেলা ওখানে, পারীর প্রসিদ্ধ রাজপথ। বিদেশীরা বলেন এর তুলনা নেই অন্যত্র।'

তার পাশাপাশি হেঁটে চললো সুনীল, ভাবতে ভাবতে প্রশ্ন করলে, 'রীতা, তুমি কি রঙ ব্যবহারের কোন হদিস দিতে পারো, তোমার স্বামী তো শুনেছি ভাল শিল্পী ছিলেন?'

'তিনি কি ছিলেন, কেমন শিল্পী ছিলেন জানি না, তবে একটা বইয়ে পড়েছি—রঙের কারিগর প্রকৃতির মধ্যে, রঙ চিনে নেবে দেখা মাত্র, এবং সেটা বিশ্লেষণ করে নেবে। যেমন একটা রঙ ধূসর-সবুজ, গ্রে-গ্রীন, হলুদের সঙ্গে কালো যুক্ত এবং ব্লু রঙ এতে নেই বলা চলে। ভাবপ্রবণ দুঃখ প্রকাশ নয়, নিবিড় গভীর দুঃখ মনের গোপন স্তরে, প্রকাশ করার উপযুক্ত রঙ।'

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে সুনীল, রীতার কাঁধে হাত রেখে, 'মিষ্টি রীতা, তুমি আমার মনের সমস্যার সমাধান করে দিলে, কি করে বুঝলে আমি দুঃখের কথাই ভাবছিলুম, আজকের ছবির পটভূমিতে!'

'আমিও ইয়োগী ম্যাঁসিয়ো।' হাসলে রীতা মিষ্টি হাসি।

সুনীল অন্যমনস্ক হয়ে গেল, সূর্যাস্তের রক্তিম ছটা ধূসর মেঘের কোলে, বুলভারের বৃক্ষসারির কোলে কোলে কুয়াশার খেলা, ফুলের কেয়ারীতে রঙ বদল—রীতার নীল চোখে মুখে কি যেন প্রত্যাশা! মমতা ভরা চোখে চেয়ে দু'হাত ধরে সুনীল বললে, 'ফেরো রীতা, অনেকটা এগিয়ে এসেছি, তোমার ফেরারও সমস্যা আছে।'

'সমস্যা চিরদিন থাকবে সোনীল, চলো ফিরি, মন যদিও চাইছে না ভালই লাগছিল।'

॥ ১২ ॥

শেমিয়ের ছাত্র ভর্তি। মণিকা, খ্রীষ্টিনা, রীতা আরো একজন মডেল কাজে লেগেছে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ শুয়ে; তাদের ঘিরে ছাত্ররা এঁকে চলেছে। রীতা একজন বয়স্থ শিল্পীর সামনে দাঁড়ানো সম্মুখভাগ। রীতার কুচযুগল, কটিদেশ, পেট, নাভি, তলপেট, রোমাবৃত উদরাবর্ত, সুগঠিত জানু, পাদমূল, নিম্নপদ, পদতল; সুনীলের চোখে রেনেসাঁসের যুগে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের অনুবিম্ব, নিথর, নিস্তব্ধ পাথরের মূর্তি। প্রশংসার দৃষ্টি ও একটু হাসি তাকে দিয়ে, গতকাল করা ছবির রঙের সমস্যা নিয়ে মাতলো। আক্কেল রসেটি মাঝে এসে ছবিটা ভাল করে দেখলেন, মুখে কোন কথা নেই; সুনীল তাঁর দিকে চাইতে একটু হেসে চলে গেলেন।

আধুনিক চিত্রকলার দাবী যা দেখেছ তা ছাড়া যা অনুভব করেছ তাও বোঝাতে হবে। বারেবারে সুনীল হাতের প্যালেটে রঙ মেলায় আর মোছে, নিজের প্রিয় রঙটি আর পায় না ; আলাদা একটা কাগজে বারেবারে রঙের নমুনা করে আর দূরে ধরে দেখে। তার অঙ্কন অনুশীলনে এমন একটা দিনও ফাঁক যায়নি, যেদিন না তুলি টেনেছে, এখন তুলি তার সম্পূর্ণ বশীভূত। কিন্তু প্রকৃতি কারুরই বশে থাকতে চায় না, সদা চঞ্চলা। অবশ্য শিল্পী স্যোরা মনে করতেন তাঁর 'পয়েন্টিলিজম' রঙের ব্যাপারে অঙ্কের মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাঁধা, তিনি বিশ্বাস করতেন, রঙ তৈরী অবস্থায় দোকানে বিক্রয় করা যাবে যেটা ব্যবহারে শিল্পীর কোন চিন্তার কারণ থাকবে না। তিনি বলতেন নাকি, বিজ্ঞানের যুগে অঙ্কনবিদ্যাও বৈজ্ঞানিক হওয়া উচিত।

সুনীল এসব বোঝার চেষ্টা করে না। সুনীল বুঝেছে কোন একটা মানুষ বা মাথা আঁকতে গেলে শুধু তার এনাটমী জানলেই চলবে না, তার ভেতরে হৃদয় ও বুদ্ধির কথাও বুঝে নিতে হবে, যা এই পৃথিবীকে কি ভাবে ভাখে, অনুভব করে ; তবে একটি পুরো চিত্র হয়ে উঠবে। শরীরের হাড় পেশী, স্থানবিশেষে সূক্ষ্মতা, এসব না জানলে অবশ্যই দেহ অঙ্কন সম্ভব নয়, কিন্তু অনুশীলনের উত্তরণ যেখানে সেটাতেই সুনীল হাতড়ে বেড়াচ্ছে। অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর সুনীল কোনমতে ছবির দেহ ও পটভূমি শেষ করে ঢাকা দিয়ে, আজকের মত বাইরে বাগানের রকে বসলো। বাড়ী ফেরার সময় আঙ্কেল রসেটি সুনীলের পাশে এসে বললেন, 'বিশ্রাম নিচ্ছ সন্, কাজ শেষ করতে পারলে ?'

'বুঝতে পারছি না স্যার শেষ হলো কি না !'

'খুব ভাল বলেছ সন্, শিল্পীর ক্ষুধা মেটার নয়, সব সুন্দর বস্তুর মধ্যে প্রায়ই কিছু অজানা চমক থেকে যায়, যার মানে বা উত্তর নাগালের বাইরে থাকে, যেমন কবিতা যা বলে, তার চেয়ে অনেক না বলা কথার ইঙ্গিত দেয় ; সুরের আনন্দকে বাঁধা যায় না কোন বাণী বা মানে বলে। সুর বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় বিভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি করে। সৃষ্টিধর্মী কলাক্ষেত্রে, সব তুমি বোঝাতে যেও না সন্, যা করেছ তাকে নিজেই তোমার ইচ্ছার উর্ধ্বে উড়ে যেতে দাও আপন পাখা মেলে। তুমি সংশয়গ্রস্ত কুণ্ঠিত মনে এখানে বসে ভাবছ ছবি হলো কি না', আমি দূর থেকে লক্ষ্য করে এলুম তোমাকে জানাতে, চিন্তা করো না, তোমার ছবি ভাল হয়েছে, এটাকে ভুলে যাও, আগের কথা ভাবো। শুভ বিদায় সন্, তোমার আন্টিকে শুভেচ্ছা জানিও। চলি।'

অঙ্কনের কথাগুলো শুনে সুনীল স্বোয়াস্তি পেল, প্রফুল্ল মনে চারিদিকে চাইলো,

চোখে পড়লো, দরজার সামনে রীতা—বয়স্ক আর্টিস্টের সঙ্গে কথা বলছে, সে হাত নেড়ে অপেক্ষা করার জন্যে ইসারা করলো, সুনীল পায়চারি করতে লাগলো, একটু পরে রীতা এসে বললে, 'চলো আজ আমি তোমায় কফি খাওয়াবো।'

'কেন হঠাৎ?' সুনীল হেসে বললে।

'আজ আমি পেটি বুর্জোয়া, ওই বুড়ো আর্টিস্ট পূর্বে আমার তিন-চারটে ফিজ বাকি রেখেছিল, আজ সব মিটিয়ে দিলে। এই বুড়ো আমার খারাপ সময়ে অতীতে অনেক সাহায্য করেছে আমায় স্নেহ করে মনে হয়। ছেলে-ছোকরার ভিড় কম, ওর কাজের সুবিধা হয়, তোমার মত একাই পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেন, আমাকে পেলে অন্য মডেল খোঁজেন না, বয়স হয়েছে বাড়তি দাবী-দাওয়া নেই আমার মনোমত। একদিন ওঁর মুখ থেকে জানলুম, আমার ভীরু স্বামীটি ওর শিষ্য, পলাতক, ভীরুটাকে খুব গালাগালি দিলেন আমার কাছে নাম ও অপকীর্তি শুনে; তুমি হাঁ করে চেয়ে আছ যে, কফিখানায় যাবে না?'

সুনীল হেসে বললে, 'তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে গেল, তোমার কথার তোড়ে বলার সুযোগ পাইনি।'

'যাও! আমার মুখের দিকে চেয়ে ছবির কথা ভাবছিলে মনে করো সবাই বোকা?' হাত বাড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কফিখানার দিকে রীতাকে ইসারা করলো, রীতা তার হাতে একটা তালি বাজিয়ে কফিখানায় ঢুকলো। সুনীলকে বসিয়ে নিজে চলে গেল ভেতরে। ফিরে এলো বেয়ারার হাতে ও নিজের দু'হাতে প্লেট নিয়ে। টেবিলে রাখার পর সুনীল বললে, 'এত কে খাবে, আমরা কি দৈত্য দানব?'

'রীতা নিজেকে আর সুনীলকে দেখিয়ে বললে, 'তুমি আর আমি।' দু'মগ কফি ঢেলে আগে গলা ভেজালো, ফরাসী কফিখানায় এত সুস্বাদু খাবার মেলে সুনীল জানতো না। রীতা জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগছে সোনীল?'

'খুব চমৎকার।'

'ছাই! একদিন আমি তোমায় রেঁধে খাওয়াব।'

'বেশ তো ছুটির দিনে।' বললে সুনীল।

রীতা হেসে বললে, 'কবে হবে ছুটি?'

'হবে হবে।' শেষ হতে সময় লাগলো, খাওয়া শেষে হাত-মুখ মুছে সুনীল বললে, 'রাতের খাওয়া হয়ে গেল, আন্টিকে বলতে হবে তোমার নাম, আপত্তি নেই তো?'

'বলতে হয় বলবে, না বলাই ভাল।'

'ঠিক আছে, এখন তাড়াতাড়ি চলো, তোমার বাসের সময় হয়ে গেছে।' রীতা বিল মিটিয়ে এলো। দু'জনে তাড়াতাড়ি বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে গেল।

সুনীল শেমিয়ের ছাড়া বাইরে মাঠে ময়দানে রাস্তায় বাগানে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে চলেছে। ধারণাই ছিল না সে এত খাটতে পারবে প্রয়োজনে। যে ছেলে নিজের জামা-কাপড় খুঁজে পরেনি, দাড়ি-গোঁফ নাপিত ছাড়া কাটেনি, চানের সময় চাকর সঙ্গে থাকতো সেই মানুষ ইজেল ঘাড়ে মাঠে মাঠে ঘুরছে নেশাগ্রস্তের মত সব ভুলে শুধু তুলি আর রঙের মধ্যে ডুবে আছে; মামণি সুলেখার মুখ যেন ভুলতে বসেছে; কত মুখ কত দৃশ্য, প্রকৃতির, মনুষ্যদেহের ওপর তার কত অধিকার, আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠছে; আত্মভোলা হয়ে, আরো, আরো, আরো ছবি আবিষ্কার, নির্মাণ, সৃষ্টির ঝোঁকে মাতোয়ারা! ভাল-খারাপের কথা ভাবেই না, শুধু কাজ করে যাওয়া। অতৃপ্তির যন্ত্রণায় জ্বলে মরা অষ্টপ্রহর! তবু ভাল লাগছে এই আত্মাহুতি। তাকে লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়ে পড়েন মিস্ লিলি, শঙ্কিত হয় রীতা।

'এলিজী' আঁকার পর থেকে সুনীল যেন হয়ে উঠেছে অন্য মানুষ। মাঝে মাঝে রীতা জোর করে তাকে বিশ্রাম করায়, হাসায়, কফি খাওয়ার সময় নানা ফষ্টি-নষ্টি করে ওর মনটাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

একদিন রীতা বললে, 'সোনীল, তোমার তো কোনদিন দাড়ি-গোঁফ রাখার অভ্যাস ছিল না, এখন কুৎসিতভাবে দাড়ি-গোঁফ ঝুলে পড়েছে তোমার খেয়াল নেই!'

সুনীল লজ্জিতভাবে উত্তর দিয়েছিল, 'ডিয়ার রীতা, আমি সেলুনে যাবার সময় পাচ্ছি না, কি করবো?'

'কেন, নিজে সকালে কামিয়ে নিতে পারো না?'

সুনীল অপরাধীর মত বললে, 'আমি কোনদিন নিজে দাড়ি কামাইনি, ভয় হয়।'

খুব খানিকটা হেসে রীতা বললে, 'অবাক ম'নেস্থি! আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি পুরুষ কিনা।'

সুনীল হেসে বলেছিল, 'পুরুষ না হলে ভালই হতো, তোমার সঙ্গে আরো ঘনিষ্টভাবে মেশা যেত, একঘরে শুয়ে রাতে গল্প করা যেতো, আরো কত কি করা যেতো, তাই না?'

'যাও, তুমি বড় দুষ্টু!' রীতার মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছিল।

পরের দিন কাজের শেষে সুনীলকে টেনে নিয়ে গেল, বাগানে ফোয়ারার কাছে একটা নির্জন জায়গায়। এখন রীতা একমাত্র সুনীলের মডেল হিসাবে কাজ করে, কাজেই সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকে। কখন মিস্ লিলির সঙ্গ দেয়, সুনীলের ঘর গোছায় ছুটির দিনে। সুনীল যা টাকা দেয় তাতেই টেনেটুনে চালিয়ে নেয়। সুনীল

রীতা বাড়ীতে কাজ করলে মিস্ লিলি নিশ্চিন্ত, যতই হোক জোয়ান ছেলেমেয়ে। ফোয়ারার ধারে জলের দিকে চেয়ে সুনীল বললে, 'হঠাৎ এখানে টেনে আনলে কেন রীতা?'

হাতের ব্যাগ থেকে দাড়ি কামানোর সাজ-সরঞ্জাম বার করতে করতে রীতা বললে, 'দেখতেই পাচ্ছ এগুলো কেন এনেছি?'

'হায় ঈশ্বর, রক্ষা করো!' ওপরে হাত তুলে বললে সুনীল, 'আমি পারবো না, আমি পারবো না রীতা!'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না, ওই ফোয়ারার জল দেখো, আমি সব ম্যানেজ করে নেবো; নড়াচড়া করো না, মডেল বনে যাও প্লিজ।' হাতে জল নিয়ে গোঁফদাড়ি ভেজালো, ক্রীম লাগিয়ে ব্রাস দিয়ে গোঁফদাড়ি ভাল করে ঘসে ফ্যানা করে নিল মুখভর্তি। সুনীল হতবাক, স্থির হয়ে তার দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবলে ফরাসী মেয়েরা কি না পারে! নিপুণ হাতে সেফ্‌টি রেজার চালাতে লাগলো আর নীচে পাতা কাগজে স্তূপীকৃত হলো সুনীলের দাড়িগোঁফ। বেশ সময় লাগলো একপ্রস্থ শেষ হতে। ব্রাসে ক্রীম লাগিয়ে মুখে ঘসে, আবার শুরু হলো ক্ষৌরকর্ম। হাত দিয়ে স্পর্শ করে জায়গায় জায়গায় থেকে যাওয়া দাড়িগোঁফ একদম সাফ করে, দুহাতে গালটা অনুভব করে রীতা বললে, 'দেখো কি ভাল লাগছে। আমি একদম সইতে পারি না দাড়ি-গোঁফ, যদিও, অনেক শিল্পীর এটা একটা সখ, কামানোর সময় মেলে না এটা বাজে কথা; অবশ্য তোমার মত ভীরুর কথা স্বতন্ত্র।'

বিস্ময়ে অভিভূত, গালে হাত বোলাতে বোলাতে সুনীল হেসে বললে, 'এটা তুমি পেশা করে নাও, লোকে ডবল ফিজ দিয়ে দাড়ি কামাবে এ আমি হলপ করে বলতে পারি রীতা!'

'তাই নাকি? কিন্তু প্রথম খরিদ্দারই এখনও কিছু দেবার নাম নেই!'

'কি চাই বলো, এখনই রাজী।' পকেটে হাত দিল হেসে সুনীল।

রীতা তার হাত পকেট থেকে টেনে বার করে ধরে বললে, 'তোমার কামানো দু'গালে দুটো চুমু খেতে দাও, ওতেই হবে।'

'এ তো আমার দেবার কথা তোমার দু'গালে!'

'বেশ বেশ দুজনেরই দেবার নেবার সুযোগ থাক, কেমন?' সুনীল রীতার মুখ দুহাতে তুলে ধরে দুটি গালে দুটি চুম্বন এঁকে দিল। রীতা সুনীলের মাথাটা দুহাতে চেপে দু'গালে প্রথমে গাল ঠেকালো, পরে আস্তে আস্তে ভিজে ঠোঁটে গভীরভাবে চুম্বন করলো। দুজনেই বাক্যহীন, কেমন যেন আড়ষ্ট অন্তর্মুখী আবেশে স্তব্ধ। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, একদল শিশুর কলকলানিতে চমকে উঠলো।

সুনীল বললে, 'চলো একটু কফি খাই রীতা, তোমার নাপিত বাক্স গুছিয়ে নাও।'

রীতা হাতব্যাগে সব কাগজে মুড়ে ভরে নিলো। সুনীলের দিকে চেয়ে হেসে বললে, 'তুমি যদি মেয়ে হতে, অনেক প্রেমিক তোমার জুটে যেতো, এত নরম তোমার গাল আর মুখের চেহারা!'

'তোমার চেয়ে নয় রীতা, তবু তুমি আজও একজনের বেশী প্রেমিক পেলে না, যাও বা একটা পেলে পালিয়ে গেল। তোমার সেই পলাতকটির কথা ভালভাবে জানতে ইচ্ছা করে, এত নির্দয় সে কি করে হতে পারলো!'

'আজ নয় একদিন সব কথা বলবো, যদি তোমার ভাল লাগে।'

'নিশ্চয় ভাল লাগবে তোমার কথা, হতভাগার কথা!' তারা কফিখানায় ঢুকে বসলো সামনা-সামনি। দু' আঙুল দেখিয়ে ইসারা করতে কফি পট আর দুটো মগ দিয়ে গেল।

॥ ১৪ ॥

শেমিয়ের ক্লাশে আজ প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে সুনীলকে। কাজ সেরে কফি খেয়ে, রীতাকে বাসে তুলে দিয়ে, ক্লান্ত হয়ে ফিরলো কর্টিজে। রাত হয়ে গেছে। মিস্ লিলি কালো ফ্রক পরে খাবার টেবিল মুছছেন ভিজে কাপড় দিয়ে। সুনীলকে দেখে বললেন, 'হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলেই বসো সোনীল, খেয়ে নাও, আমার শরীরটা ভাল নয়, ভাত ও কিছু ফল খেয়ে নাও।'

সুনীল হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলে বসলো। মিস্ লিলি ভেজিটেবল মেশানো ভাত, মাখনের টিন চিজবল, দুধ, ফল দিলেন। মাখন দিয়ে ভাত মেখে খেতে ভাল লাগছে। পেট ভরে ভাত খেল, দুধ ফল খেল, বললে, 'আন্টি, খেতে ভালই লাগলো।'

মিস্ লিলি কোন কথা না বলে চলে গেলেন, সুনীল উঠে পড়লো। ঘরে গিয়ে বাইরের পোষাক পাল্টে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বেশ খানিক বাদে মিস্ লিলি কম্পিত হাতে একটা টেলিগ্রাম দিলেন সুনীলকে। টেলিগ্রাম পড়ে সুনীলের কান্নাভরা জড়িত কণ্ঠস্বর, 'বাবা নেই! আমার কেউ নেই আন্টি, আমার কেউ রইলো না!' উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুনীল।

তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন মিস্ লিলি, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা সন্, মঙ্গলময় তিনি, মেনে নিতেই হবে। তোমার বাবা তাঁর কাছে গেছেন, দুঃখ করো না!'

সুনীল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো ছোট ছেলের মত। আন্টি তাকে জড়িয়ে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। নিস্তব্ধ হ্যামলিট, মাঝে মধ্যে বাদুড়, খেঁকশেয়ালের

ডাক। সুনীলের মনে হচ্ছে যদি এখুনি যেতে পারতুম কলকাতায়, কিছুটা সান্ত্বনা মিলতো হয়তো। বিরতিবিহীন কান্নার স্রোতে বালিশ বিছানা ভিজে উঠলো, বারেবারে মিস্ লিলি টোয়ালে চেপে ধরলেন। অনেক রাত পর্যন্ত সুনীল কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, আন্টি তাঁর পা মুড়ে সুনীলের পাশেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঘুম ভাঙলো সুনীলের, বেশ বেলা তখন। মাথাটা ধরে আছে খুব। চোখ জ্বলছে, জ্বর-জ্বর ভাব। হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা আবার তুলে নিলে। চোখ বোলাতে লাগলো। শেষ লাইনে 'Dont come letter follows'। ফিরতে বারণ করছেন ফণীজেঠু টেলিগ্রাম করেছেন তিনি। চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করার নেই। আবার কান্না বুক ঠেলে উঠতে চাইছে। বিদায় বেলায় বাবার বিষণ্ণ মুখ ভেসে উঠছে। মিস্ লিলি চায়ের পট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, বললেন 'সোনীল, চা খাও, তোমাদের নিয়ম-রীতি আমি জানি না, যেমন বলবে পালন করার ব্যবস্থা করবো।'

সুনীল তাঁর দিকে চাইল তাঁর হাতে কালো ব্যাণ্ড লাগালো, সে বললে, 'আন্টি, নিয়ম-কানুন আমি কিছুই জানি না, একমাত্র জানি দশ দিন আমিষ খাওয়া নিষেধ। আপনাদের নিয়ম মানতে আমার আপত্তি নেই। বাবা মুক্ত চিন্তার মানুষ ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের, যিনি সব মত মেনে চলতেন আপনি যদি খ্রীষ্টীয় প্রথায় কিছু করেন করুন। স্মরণ করাই মূল কথা।'

মিস্ লিলির চোখ ছলছল করে এলো। সুনীলের চা খেতে ভাল লাগছে না, টেবিলে কাপ নামিয়ে রেখে ইজেলের দিকে গেল, একটা কাগজ লাগালো, মিস্ লিলি তাড়াতাড়ি তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আজ কাজ করো না, তোমার শরীর ভাল নয় জ্বর জ্বর লাগছে গায়ের তাপ, শুয়ে থাকো সন্!'

সুনীল বললে অনুনয়ের ভঙ্গিতে, 'বাবার মুখ ভেসে আসছে বারেবারে, সে মুখ যদি একটু ধরে রাখতে পারি।'

'করো করো!' কেঁদে ফেলে, চোখ মুছতে মুছতে মিস্ লিলি বেরিয়ে গেলেন। সুনীলের কানে এলো কান্না জড়িত কণ্ঠ, 'হে ঈশ্বর, আমার ভাইকে টেনে নিলে কেন? সে যে আমার চেয়ে অনেক ছোট ছিল।'

সুনীলের ছবি মোটামুটি শেষ হয়েছে। সে ক্লান্ত হয়ে তুলি হাতে বিছানায় বসে পড়লো ছবির দিকে চেয়ে। মিস্ লিলি এসে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে বললেন, 'তোমার বাবাও তোমার জন্যে দুঃখিত, দেখো ঠিক কি না? তাঁর প্রশান্ত মুখ পরিচিত আমাদের, এ-মুখ কোথায় পেয়েছ সোনীল?'

'পারী যাত্রার বিদায় বেলায় আন্টি!' সুনীল তুলি নিয়ে আবার দাঁড়ালো ছবির

সামনে, মিস্ লিলি তার তুলি কেড়ে নিয়ে বললেন, 'আজ আর নয় সন্, সকাল থেকে কিছু খাওনি চলো লাঞ্চ খেয়ে নেবে।'

সুনীল বেশিনে গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে, ঠাণ্ডা জল হাতে নিয়ে কপালে চুলে মাথায় দিয়ে মুছে নিয়ে খাবার ঘরে গেল। টেবিলে শুধু তারই খাবার ভেজিটেবল, ভাত, মাখন চিকবল, দুধ আপেল পাই। সুনীল বললে, 'আন্টি, তোমার খাবার?'

তিনি বললেন, 'এ দশদিন তুমি একা খাবে আমি পরে খাবো সন্! আরম্ভ কর, চেয়ে আছ কি আমার দিকে?'

'কৃতজ্ঞতায় সুনীল চুপ, কি বা বলবে এই স্নেহময়ী বিদেশিনীকে। 'খাও সন্, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খাবার।' তিনি একটা চেয়ার টেনে দূরে একপাশে বসলেন।

খাওয়ার পরই সুনীল বিছানায় শুয়ে পড়েছিল চোখ বুজে। রীতা নিশব্দে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালো তার খাটের পাশে। পরিচিত গন্ধ, সুনীল চোখ খুলে দেখলে রীতা বিষণ্ণ মুখে তার দিকে চেয়ে। সুনীলের চোখ জলে ভরে এলো, কি যেন বলতে যাচ্ছিল রীতা হাত নেড়ে বললে, 'আন্টির কাছে সব শুনেছি, তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই, তুমি শুয়ে থাক।' কাঁধে চাপ দিয়ে সুনীলকে শুইয়ে কপালে হাত দিল বললে, 'তোমার জর মনে হচ্ছে (জামার ভেতরে হাত দিয়ে দেখলো) আন্টিকে জানিয়ে আসি।'

আন্টিকে নিয়ে এলো রীতা থার্মোমিটার হাতে। আন্টি তার হাত থেকে থার্মোমিটার নিয়ে সুনীলের মুখে দিলেন, ঘড়ি দেখে তুলে দেখলেন, জর বেশী নয়। সুনীল তাদের দিকে চেয়ে বললে, 'উত্তেজনায় এ রকম গা গরম চিরকাল হয় ভেবো না আন্টি, ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি শুয়ে থাকো সন্, আমি তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিই।'

রীতা এগিয়ে এসে বললে, 'আপনি বিশ্রাম করুন আমি থাকছি দরকারমত হাত বোলাতে পারবো।'

'সেকি? তোমার শেমিয়েরে ক্লাশ দিতে হবে না?' সুনীলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ইনি না গেলে আমার কাজ নেই, সেইজন্যে খবর নিতে এসেছিলাম আর যাবার দরকার হবে না আন্টি।'

'বেশ ভালই হলো, তুমি ওর কাছে বসো ও বোধহয় ঘুমোচ্ছে।' আবার ফিরে এসে বললেন, 'সারা সকাল ছবি এঁকেছে আর ওকে ছবি আঁকতে দিও না, ওই যে।'

ছবি দেখে রীতা প্রশ্ন করলে, 'কার ছবি?'

'ওর বাবার!' রীতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, রুমালে মুছে নিয়ে বললে, 'আপনি যান আন্টি, কোন চিন্তা নেই আমি দেখছি।'

আন্টি বেরিয়ে যেতে রীতা সুনীলের বিছানায় সন্তর্পণে বসলো ; তার চুলে মাথায় হাত বোলাবার সময় বুঝে নিল সুনীল নীরবে মুখ গুঁজে কেঁদে চলেছে। কোন কথা না বলে রীতা তার মাথায় ঘাড়ে পিঠে সস্নেহে হাত বোলাতে লাগলো। সুনীল ক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে হলো। সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার হতে রীতা পা টিপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আন্টির কাছে বিদায় নেবার সময় বললে, কাল সকালেই আসবো। আন্টি বললেন, 'মাকে বলে এসো কাল এখানেই খাবে।'

'আচ্ছা।' রীতা চলে গেল।

॥ ১৫ ॥

শচীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ফণীন্দ্রনাথ বসুর গৃহে, নিকট আত্মীয় বিয়োগে শোক-সন্তপ্ত পরিবার। ফণীবাবু খাটে বসে, শূন্য দৃষ্টিতে মেঝের দিকে চেয়ে আছেন। মুখের চেহারার মধ্যে এই কদিনে আঘাতের গভীরতা স্পষ্ট। শৈশব থেকে গড়ে ওঠা তাঁদের সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তারও উর্ধ্বে ছিল। দীর্ঘদিন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, বিশ্বাস তুলনাহীন। ফণীবাবু যে রকম চুপচাপ হয়ে গেছেন তাঁর ভাবগতিক দেখে আনন্দময়ী, সুলেখা শঙ্কিত অন্তরে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে লক্ষ্য করছেন। কলেজে যাওয়া ছাড়া বাড়ীতে তাঁর মুখে শুধু শচীনের কথা, গল্প। লাইব্রেরীতে বসছেন না, আনন্দময়ী সর্বদা পাশে পাশে আছেন। এক কাপ চা এনে হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্মশান-যাত্রার সময় ঠাকুরপোদের পুরানো বাড়ীর কারা এসেছিলেন ?'

'বুড়োরা ছাড়া সকলেই। শচীনের ছোট ভাই, বৌমা, ভাইপো মৃত্যুর খবর পেয়েই এসেছিল। ভাইপো মুখাগ্নি ইত্যাদি করলো, সে প্রায় সুনীলের বয়সি। ভায়েরা মিলে, শ্রাদ্ধের যাবতীয় বন্দোবস্ত, আত্মীয় ভোজন, তার মোটামুটি হিসাব আমার হাতে দিয়ে ওর ছোট ভাই বললে, দাদা, এটর্নী অফিসে যা করণীয় তা আপনার। আমরা কিছু জানিও না। উইল হিসাবে, আপনি যা করার করুন তবে আমাদের অনুরোধ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি এ বাড়ীতে থাকলেই ভাল হয়। রোজ যাতায়াত করতে আপনার কষ্টও হচ্ছে ; বাড়ীটা রাত্রে রামুর ওপর ভরসা করে রাখা ঠিক নয়, দিনকাল খারাপ। আমিও ভেবে দেখলুম, ওরা ঠিকই বলেচে, রামুও ভয় পাচ্চে !'

ভয় পেয়ে আনন্দময়ী বললেন, 'তোমাকে একা ছাড়বো না, আমি সঙ্গে যাবো।'

সুলেখা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আমি যাই মা, তুমি গেলে এই সংসার মণ্টু সব আমি সামলাতে পারবো না।'

ফণীবাবু বললেন, 'দরকার ছিল না রামু আছে, তবে সুলেখাই চলুক তুমি গেলে সংসারের সবাইকে নিয়ে যেতে হয়।'

আনন্দময়ী ফুঁপিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন, 'হতভাগাটা কি যে করচে বিদেশে বিভূঁয়ে ভগবান জানেন!' মায়ের কান্নায় সুলেখার চোখ জলে ভরে এলো ফোঁটা পড়লেই হয়। 'হ্যাগা, সুনের বিদেশে টাকা-পয়সার কোন অসুবিধা হবে না তো?' কাঁদতে কাঁদতে বললেন আনন্দময়ী।

ফণীবাবু বললেন, 'শচীন একটা মোটা টাকা সুনীলের খরচা বাবদ জমা রেখেচে আগেই। ছ'মাসের মধ্যে সুনীলের ফেরার কথা, সে পর্যন্ত মাসের টাকা আর বাড়তি কিছু আছে; উড়িয়ে না দিলে, খরচ আটকাবে না। সুনীলের ওপর শচীনের বিশ্বাস ছিল অগাধ, শুধু ভয় ছিল তার নরম মনের সুযোগ নিয়ে লোকে না ঠকিয়ে দেয়। সুনীল দেখতে যেমন মায়ের মত স্বভাবও মায়ের মত একটু বেহিসাবী। ভাবপ্রবণ দুঃখকষ্ট দেখলে হিসাব থাকে না।'

আনন্দময়ী বললেন, 'যা হোক ভালয় ভালয় দেশে ফিরে এলেই বাঁচি।'

শচীনের কথা উঠলে, স্বল্পভাষী ফণীবাবু বহুভাষী হয়ে ওঠেন, মৃত বন্ধু স্মরণে। আনন্দময়ীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'জানো আনন্দ, ইদানীং সুলেখাকে খুব স্নেহ করতো। আমাকে বললে একদিন, ফণীদা সাবধানে দেখেশুনে সুলেখা মায়ের বিয়ে দিও। ওর মনের গঠন খুব শক্ত; আত্ম-সম্মানবোধ প্রখর। আমি ওর যৌতুক বাবদ পাঁচ হাজার টাকা তোমার কাছে রাখবো, ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেবে, যেন অসুখী না হয়। গলা ভেঙে গেল ফণীবাবুর বলে গেলেন, মৃত্যু সম্বন্ধে যেন আগেভাগে জেনেছিল। উইল করা সম্পত্তির বন্দোবস্ত, সব শেষ করে কেমন গেল। আনন্দ কি সুন্দর মৃত্যু দেখো, ভোরে বিছানায় বসে ইষ্টনাম জপ করতো, সেদিনও পদ্মাসনে বিছানায় বসেছিল, সামনে তাকিয়াতে দুটি কনুই ভর দিয়ে কখন চলে গেল কেউ টেরও পেলো না। সকালে রামু চা রেখে টেবিলে ডাক দিলে, বাবা চা খাও। কোন সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিতেই ঢলে পড়লো দেহ। ভয়ে রামু নীচে ভাড়াটিয়াদের খবর দিলে; তারা এসে দেখলে, নিশ্বাস নেই, নাড়ী নেই, ডাক্তার এসে বললো অন্তত দু'ঘণ্টা আগে মারা গেছেন। জীবনে জ্ঞানত কারুকে কষ্ট দেয়নি, শেষেও না; শান্তিতে বিদায় নিলো।'

ফণীবাবুর গলা আবার ভেঙে এলো। আনন্দময়ী তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ থাক আর একদিন বলো।' মণ্টু ও সুলেখা চলে গেল। আনন্দময়ী আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

* * * *

পিতার মৃত্যুর পর সুনীলের নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়েছিল। পাটনার কথা, ঘরবাড়ী, বাবার নানা কথা, মনে পড়লে মনে হতো ফিরে গেলেই বাবাকে দেখবে।

এই বিদেশে যেন সব শূন্য, মামণি নেই, সুলেখা নেই, ফণীজেঠু নেই, সব মরুভূমি। অসহ্য লাগছিল এখানের বিধিবদ্ধ কর্মকাণ্ড। এখানে সব সময়ে নানা আকর্ষণ থেকে মনকে প্রতিসংহার করায় ভিতরকার অতৃপ্তির নির্মম বেদনা তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। তার স্বভাবজাত নীতিবোধ, অভ্যাস এখানের স্বভাবজাত জীবনধারার সম্পূর্ণ বিপরীত; একজন জোয়ান ছেলে মদ খায় না, ধূমপান করে না, ক্যাবারে থিয়েটার, নারীসঙ্গ করে না, একথা সহ-শিল্পগোষ্ঠীর কাছে অকল্পনীয় অবাস্তব। শেমিয়েরে ছাত্ররা তাকে নিয়ে নানা গবেষণা করে। তবে এদেশে বা পারীতে এদের একটা বড় গুণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, খারাপ ব্যবহার কখনই করবে না; তাকে ভারতীয় ইয়োগী ভেবে হয়তো শ্রদ্ধাও করে। বিদেশে আসার আগে, চিঠিতে মামণির বিবাহ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, বাবার কাছে প্রতিশ্রুতি, তার মনে গাঁথা সর্ব সময়ে। তার প্রতি বাবার অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা, বাবার অবর্তমানে তাকে যেন আরো সচেতন করে দিয়েছে। কথায় কথায় রীতা বলেছিল একদিন, যৌনতা তো যৌবনের ধর্ম! সে উত্তরে বলেছিল, কলা-সাধনা আমার একমাত্র ধর্ম, সৌন্দর্যপ্রীতি অনিবার্য ফলশ্রুতি। এই মনোভাব তার সহজাত না স্বকৃত এ প্রশ্নের জবাব সে নিজেই এড়িয়ে চলছে।

রীতা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'অবদমিত মন, মানসিক আর্তি এনে দেবে না তো?'

তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সুনীল বলেছিল, 'তখন দেখা যাবে।'

আজ কাজ করেছে মণিকাকে নিয়ে। বাঁধা হিসাবে কাজ করে তাকে ছেড়ে সে কলকাতার কথাই ভাবছিল এমন সময় আঙ্কেল রসেটি তাকে দেখে দাঁড়ালেন। সে উঠে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, 'সোনীল, তোমার আকাদামির শিক্ষা শেষ, আগামী মাসের প্রথমেই তুমি ডিপ্লোমা পাবে, দেশে ফিরতে পারো, কিম্বা এখানে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে দু-চার বছর চাকুরী করতে পারো আমার সঙ্গে, যা তোমার খুশী। সকলে তোমার কাজে সন্তুষ্ট খুব সন্, তুমি কী স্থির করলে আমায় দু-একদিনের মধ্যে জানিয়ে দিও আমি সেইমত ব্যবস্থা করবো, শুভ-বিদায়।'

আঙ্কেলের কথা শুনে তার মন আনন্দে নেচে উঠলো, ইচ্ছে করলে ফিরতে পারবে দেশে। ক্লাশ থেকে বাইরে বেরোবার সময় দেখলো, রীতা বয়স্ক সেই শিল্পীর সঙ্গে কাজ করছে; আজ রীতাকে বলেই মণিকাকে নিয়ে কাজ করেছে। মতলব আছে এমন একটা চিত্র করার, যাতে অঙ্গভঙ্গিতে মুখমণ্ডলে লালসাযুক্ত যৌন আবেদন ফোটাবে। আজ শেষ হলো না কাল শেষ করবে। কলকাতা ফেরার সম্ভাবনায় বারেবারে সুলেখার মুখ মনে পড়ছে; বাইরে এসে সোজা কফিখানায় চলে গেল। কফিখানায় একমগ দু'মগ কফি নিয়ে এখানে যতক্ষণ খুশী থাকা যায়, পারীর প্রচলিত রীতি। এখানে ছাত্ররা

লেখাপড়া করে, শিল্পীরা ছবি আঁকেন, বড় বড় সাহিত্যিকরা বই লেখেন বা আসর বসান যে কোন দল, রাজনৈতিক হলেও আপত্তি নেই। দু' পাঁচ মগ কফি বিক্রি হয়েই যায়। সুনীলের কফি শেষ হয়ে গেল, রীতার দেখা নেই। পকেট থেকে স্কেচ্ খাতাটা বার করে কফিখানার স্টীল ছবি আঁকতে লাগলো, কফি পট মগ টেবিল চেয়ার মায় মালিকের রেখাচিত্র।

রীতা এসেছে, পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে ; হুঁশ হলো সুনীলের পরিচিত গন্ধে। শেষ টান দিয়ে, খাতা মুড়ে পকেটে পুরে রীতাকে ইসারায় বসতে বললে মাথা নেড়ে। রীতা বসলো সামনে, সুনীল ওয়েটারের দিকে চাইতে সে চলে গেল। অনেক দিনের আসা-যাওয়ার ফলে তার জানা হয়ে গেছে সে কফি পট মগ আর স্ন্যাকের প্লেট নামিয়ে দিলো। সুনীল গম্ভীর মুখে বললে, 'রীতা, আজ একটা ভাবনায় পড়েছি, পরামর্শ দেবে ?'

'শিল্পীরা কি কারো পরামর্শ নেয় ?' রীতা হেসে বললে।

'না-না হাসি নয়, আজ আঙ্কেল রসেটি বললেন, আগামী মাসে আমি ডিপ্লোমা পেয়ে যাবো। আমি দেশে ফিরতে পারি, কিম্বা যদি ইচ্ছা করি প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে তাঁর সঙ্গে দু-চার বছর এখানে চাকরী করতে পারি। কি করবো ঠিক করতে পারছি না রীতা ?'

'এতে আমি কি বলবো, এটার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে।' সরল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সুনীল বললে, 'মডেল হিসাবে ভাবছি না, তোমায় বন্ধু হিসাবে পরামর্শ চাই রীতা !'

তার হাতের ওপর একটা হাত চাপিয়ে অনুনয়ের সুরে রীতা বললে, 'আমায় ক্ষমা করো সোনীল, এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারবো না !'

দুজনে কফিতে চুমুক দিল অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে চেয়ে। দুজনেই নীরব, কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। বেশ খানিক বাদে রীতা বললে, 'আজ তোমার কাজ হয়েছে ?'

'সামান্য বাকি, মণিকার দরকার হবে না। কাল তুমি খালি আছ তো ?'

'তোমার জন্যে আমি সব সময় খালি।' হেসে বললে রীতা।

'অনেক ধন্যবাদ !'

চোখ পাকিয়ে রীতা বললে, 'আবার ওইসব বাজে ভদ্রতার কথা ?'

'ভুল হয়ে গ্যাছে। চলো তোমার সময় হয়ে গেল, বাসে তুলে দি।' বিল মিটিয়ে, দুজনে রাস্তায় নামলো।

কটেজে ফিরে সুনীল দেখলে তার টেবিলে দুটো চিঠি কলকাতার। একটা হাতের লেখা সুলেখার, অন্যটি টাইপ করা এটর্নী অফিসের। বাইরের পোষাক বদলে আরাম

করে বিছানায় বসে আগে টাইপ করা চিঠিটা খুললো। চিঠিটা শঙ্করজেঠুর। লিখেছেন,—ফণীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে তোমার খরচের টাকা নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। তোমার ভাড়া আদায়ের জন্যে একটি লোক ঠিক করেছি, সে শতকরা দশ টাকা হারে কমিশন নেবে। বাড়তি তোমার জন্যে কিছু টাকা আমার কাছে জমা রইলো, প্রয়োজনে পাইবে। কবে নাগাদ ফিরবে জানিও। ফণীবাবু আবার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন। তুমি সাবধানে থেকো বাবা। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জেনো। ইতি শঙ্করজেঠু।

মিস্ লিলি ঘরে ঢুকে বললেন, 'কখন এসেছ সন্! জানতে পারিনি; খেয়ে নাও, রাত হয়েছে!' সুনীল ধীরে ধীরে খাওয়ার ঘরে গিয়ে টেবিলে বসলো। মিস্ লিলি তাকে একটু লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি কি ভাবছ, মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত?'

'তেমন কিছু নয়!' সুনীল খেতে খেতে মাঝে মাঝে মিস্ লিলির দিকে চাইছিল, সেটা দেখে মিস্ লিলি বললেন, 'কি বলতে চাইছ সন্, বল না!'

সুনীল হেসে বললে, 'আঙ্কেল আজ বললেন, আমি আগামী মাসে ডিপ্লোমা পেয়ে যাবো, দেশে ফিরতে পারি, ইচ্ছা করলে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে এখানে দু-চার বছর চাকরী করতে পারি।'

মিস্ লিলি খুশীর স্বরে বললেন, 'খুব ভাল খবর সোনীল।'

'আণ্টি, এঁরা মাহিনা কত দেবে?'

'এখন কত দেয় জানি না, তবে একজনের খরচা চলে যাওয়ার মত নিশ্চয় দেবে।'

প্রশ্ন করলো সুনীল, 'আপনার কি মনে হয়, আরো দু-এক বছর থাকা উচিত?'

'নিশ্চয় সন্, এতে তোমার ভবিষ্যত ভাল হবে!'

'আমি থাকলে আপনার কষ্ট হবে না অতদিন?'

হেসে বললেন মিস্ লিলি, 'কি যে বলো! তোমার মত শান্ত সুইট ছেলের জন্যে পরিশ্রম করতে আমার ভালই লাগে। আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন, তোমার এই খবর তাঁকে কত আনন্দ দিত জানো সোনীল? শেমিয়েরের শ্রেষ্ঠ ছেলে না হলে এ সম্মান, সুযোগ পায় না।'

সুনীল খাওয়া শেষ করে ঘরে গেল, সুলেখার মুখ আজ বড় বিরক্ত করছে। মিস্ লিলি কফির মগ হাতে নিয়ে ঘরে এলেন, বললেন, 'সোনীল, তোমার এই সুযোগ আসায় আমি গর্বিত। তুমি আমার অতিথি নও, আমার ছেলের মত। কাল রসেটিকে জিজ্ঞেস করবো কত মাহিনা দেবে। তোমার খরচা এসে গেলে তোমার কি অসুবিধা? আমার জন্যে ভেবো না।' তাঁর স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর মামণিকে স্মরণ করিয়ে দিল।

মিস্ লিলি চলে গেলেন শুভ বিদায় জানিয়ে। সুনীল চিঠি নিয়ে বিছানায় শুয়ে

পড়লো—প্রিয়তমেষু, আশা করি কুশলে আছ? তোমার ফিরে আসার সময় হয়ে আসছে তাই কতকগুলো ঘটনা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। এখানে দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন চরমে উঠেছে, বড় বড় নেতারা জেলে। বাবা কবে গ্রেপ্তার হবেন জানা নেই, যে কোন দিন হতে পারেন। আমি বি-এ পড়ছি বেথুনে। তবে প্রয়োজনে আমিও আন্দোলনে যোগ দেবো ঠিক করেছি, পড়াশুনা জেলেও হতে পারে। আমার জেলে যাওয়া তুমি পছন্দ করবে কি না জানি না, তবে আমার নানা কারণে মন চাইছে জেলে। তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, আমায় চিঠি দিও না। তুমি ব্যথা পাবে, তবু না জানিয়ে পারছি না: একদিন মা আমার ঘর পরিষ্কার করতে এসে আমার বইয়ের আলমারীর মধ্যে গোপনে যত্ন করে রাখা তোমার ছবি ও চিঠি ইত্যাদি সব দেখেছেন, পড়েছেন। আমি কলেজ থেকে ফেরার পর আমায় অপমানজনক কথা বলেন যাতে আমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। নিজের পায়ে দাঁড়ানো হলে, আমি সেই মুহূর্তেই বাড়ী ছেড়ে যেতুম। এখন একটা নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে। মায়ের পরিচিতা এক ব্রাহ্মমহিলার পুত্র, এম-এ পাশ, ভাল চাকুরী, দেখতে ভাল, অতএব আমার বিবাহের পাত্র হিসাবে স্থির করে বাড়ীতে ঘন ঘন চায়ের নিমন্ত্রণ করছেন, মায় মহিলাটিকেও। এদের প্রতি ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তুমি কবে আসবে জানি না, এলেও তুমি তোমার মামণিকে কিভাবে সামাল দেবে আমার বুদ্ধির অগোচর। বাড়ী থেকে নিজেকে কোন অছিলায় সরিয়ে না রাখা ছাড়া আমার শান্তি নেই, আমি বাঁচবো না সুনীল। দিনের পর দিন অভিনয় মিথ্যাচার সইতে পাচ্ছি না। আমি তোমারই আছি, থাকবো, ভেবো না। বি-এ পাশ হয়ে গেলে নিজের পথ নিজে করে নেবো। তুমি সাবধানে থেকো, আন্টিকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি আমার ভালবাসা জেনো, চিঠিতে আমার চুম্বন রইলো। ইতি সু।

চিঠিটা চেপে ধরলো। আনন্দ জড়ানো দুঃখ মধুর হয়ে উঠলো। মনে কঠোর প্রতিজ্ঞা জেগে উঠলো। সে ফিরবে না দেশে, প্যারীতেই থেকে যাবে।

॥ ১৬ ॥

মণীবাবুদের বাইরের ঘর। ড্রয়িংরুম আর বলা চলে না। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কতকগুলো সাধারণ কোচ আসবাব-পত্তর খদ্দরের কাপড়ে ঢাকা দেওয়া। একপাশে একটা তক্তাপোষ ধবধবে সাদা খদ্দরের চাদরে ঢাকা দেওয়া। ঘরের এ কোণে একটা সোফায় অমর নাথ দত্ত, আনন্দময়ীর সখিপুত্র বসে। ঢিলে হাতা গিলে করা সাদা পাঞ্জাবী, কোঁচানো ফরাসডাঙার ধুতি, পায়ে পম্প-শু পেটেন্ট চামড়ার কালো টেপ সামনে, চুলে, মুখে,

পোষাকে, প্রসাধনে পরিশ্রম করেন বোঝা যায়। আনন্দময়ী বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে তাকে দেখে বললেন, 'কতক্ষণ বসে আচ, সুলেখা কোথায় একা একা বসে আচ? আমি একবার দোকানে গেচলুম, ভেতর থেকে আসচি, বসো বাবা।' আনন্দময়ী, সুলেখা —সুলেখা ডাকতে ডাকতে ভেতরে গেলেন।

সুলেখা সাড়া দিল, 'এই যে যাই মা।' বাইরের ঘর থেকে তার সাড়া শোনা গেল। বাইরের ঘরে ঢুকলো সুলেখা, লাল পাড় ধূসর রঙের খদ্দরের শাড়ী, সাদা ব্লাউজ হাফ হাতা, কাঁধে খদ্দরের থলে ঝোলানো, পায়ে মাদ্রাজী স্লিপার, তাকে দেখে অমর উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলো, 'কিছু মনে করবেন না মিস্ বোস, আপনার শাড়ীটি সুন্দর মানিয়েছে!'

সুলেখা একটু টেপা হাসি মুখে বললে, 'তাই নাকি, খদ্দরের শাড়ী আপনার ভাল লেগেচে?'

'রঙটি বড় চমৎকার হয়েচে।' বললে অমর।

'অনেক ধন্যবাদ, এ কাপড়ের সুতো আমার কাটা, রঙ আমি বাড়ীতে করেচি, বোনানো হয়েচে অভয় আশ্রমে।'

'একটু বিরক্ত হয়ে অমর বললে, 'সে কি! লেখাপড়া ছেড়ে এতে সময় নষ্ট করেন?'

'আমাদের সারা দিন-রাতে অনেক সময় অকারণে নষ্ট হয় দত্তবাবু। নিয়মিত কিছুটা সময় এতে ব্যয় করলে সময়ের সদ্ব্যবহারই হবে।' অমর এমন কাটা কাটা উত্তর আশা করেনি, সুলেখা একটু হেসে বললে, 'আমার কথায় কিছু মনে করলেন না তো?'

'না-না, মনে কেন করবো, এ রকম পারলে খুবই ভাল।'

আনন্দময়ী কামিনীর হাতে জলখাবার, নিজে চায়ের ব্যবস্থা নিয়ে ঘরে এলেন। অমরের সঙ্গে সুলেখা গল্প করছে দেখে খুশী হলেন। 'খাও বাবা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' আনন্দময়ী ও কামিনী চলে গেল। অমর দু' আঙুলে একটা নিমকী তুলে, দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে বললে, 'সাহিত্য কি উপন্যাস পড়েন না?'

'পড়ি, পুরোনো বই লাইব্রেরীতে যা আছে পড়া অনেকদিন হয়ে গেচে, আধুনিক বই পাই না বেশী, পেলে পড়ি।'

'আধুনিক বই বেশীর ভাগ রাবিশ!' অমর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে। 'আপনি বোধহয় আপনার যুগের অবিচার করচেন, কল্লোল কালি-কলম গ্রুপের অনেক শক্তিশালী আধুনিক লেখক পাবেন, কবি, সাহিত্যিক। আমি সব বই পাই না।' সুলেখা হতাশ ভাবে বললে।

অমর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'ও না পেলেও চলবে।' সুলেখা চুপ করে গেল, তর্কে না যাওয়াই ভাল, শুধু কথা বলার জন্যে কথা বলা তার পোষায় না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমর বললে, 'আপনি ব্যাগ নিয়ে এলেন, কোথাও যাবার আছে?'

'যেতে হবে, একটা সভা আছে, অবশ্য আধঘণ্টা বাদে গেলেই চলবে।'

'এইসব সভাসমিতি করে কি লাভ মিস বোস? গোল টেবিল চৌকো টেবিল সব দেখলেন তো, ইংরেজরা রাজত্ব ছেড়ে যাবে, না ভাবাই ভাল। দুর্জনের ছলের অভাব হবে না, মাঝ থেকে ছেলেরা জেলে গিয়ে মুখ্যু হয়ে পড়ে থাকবে। আপনার তো যাওয়াই চলে না, সামনে পরীক্ষা।' সুলেখা একটু হেসে চুপ করে রইলো। আনন্দময়ী ঘরে এলেন, সুলেখার দিকে চেয়ে বললেন, 'না গেলেই নয় মিটিং করতে?'

সুলেখা চুপ, অমর বললে, 'মাসীমা, আমি আজ আসি, আমারও এক জায়গায় যাবার আছে।' বলেই উঠে পড়লো।

আনন্দময়ী ক্ষুণ্ণ মনে বললেন, 'এসো বাবা!' অমর চলে যাওয়ার পর রাগতভাবে বললেন, 'কি অসভ্যতা শিকেচ! একদিন না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত!'

সুলেখা কোন কথা না বলে শুধু বললে, 'আসচি মা!'

রাত্রি দশটায় সপরিবারে ফণীবাবু খেতে বসেছেন। বসু পরিবারে পুরোনো চাল পাল্‌টে গেছে ফণীবাবুর চাপে পড়ে। কর্তা-গিন্নির প্রথম প্রথম মনকষাকষি, রাগ অভিমান পালাশেষে এখন স্বাভাবিক ধারায় শান্তি ফিরেছে না বলে বলা চলে অশান্তি হয় না। এখন বাড়ীতে একটি চাকর বিশু, একটি ঝি কামিনী আর সকালে একটি ঠিকে ঝি শুখো মাইনের। রান্না করেন আনন্দময়ী সঙ্গে কামিনী, খাওয়ার পদ স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে তিনটি চারটি পদের বেশী নয়। একসঙ্গে খাওয়ার রীতি সব দিন মানা যায় না, কারণ খাওয়ার পদ নিজেদের নিয়ে নেওয়া সব সময় সম্ভব নয়; যাই হোক, যে কেউ পূর্ব পরিচিত লোকের চোখে পড়ার মত পরিবর্তন বসু পরিবারে। অভাবে নয় স্বেচ্ছায়, এটা বোঝা যায়। খেতে খেতে ফণীবাবু বললেন, 'আজ সুনীল মাস্টারের একটা চিঠি পেয়েচি আনন্দ!'

'কি লিখেচে, ভাল আচে?'

'খুব ভাল আচে, চাকরী করচে ছেলেদের আঁকার শিক্ষক, তা ছাড়া নিজে আঁকছে, নাম হয়েচে, প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েচে ওর ছবি। বড় একজন আর্টিস্টের শিষ্য হয়ে আরো শিকচে, তাই লিখেচে—আমার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে সুযোগ পেয়ে, যাওয়া হলো না। যা মাইনে পাই তাতে আমার ব্যক্তিগত খরচের পক্ষে যথেষ্ট। তবে আমার শিক্ষার কাজ ঠিকমত চালাতে হলে কলকাতার মাসিক টাকাটা পাওয়া দরকার। গত দু' মাস হলো টাকা আসেনি, বেশী কাজ করার সুবিধা থাকা সত্বেও সম্ভব হচ্ছে না; এ সম্বন্ধে এটর্নী অফিসে খোঁজখবর নিয়ে কি করা উচিত উপদেশ দেবেন। আপনি মামণি আমার প্রণাম নেবেন, ছোটদের আমার ভালবাসা জানাবেন।'

সুলেখা ম্লান মুখে উঠে গেল ; আনন্দময়ী, মণ্টু, ফণীবাবু সবাই উঠে পড়লেন।

॥ ১৭ ॥

'ল্য লা গ্রাঁদ 'শেমিয়েরে' চাকরী করা হয়ে গেল প্রায় এক বছর। এখন আর সুনীল ছাত্র নয়, চালচলনে ভারিক্কী ভাব আনতে হয়েছে ছাত্রদের সামনে। এখন সে সকলের চোখে সম্ভ্রমের স্থান পেয়েছে, ক্লাশে পড়ানো, শেখানোর জন্যে। ছাত্ররা তার ক্লাশের, দিন, ঘণ্টা, মনে রাখে উপস্থিত থাকার জন্যে। 'আতালিয়েতে' নূতন ছাত্রদের প্রাথমিক অঙ্কন রীতির বাঁধা আইন-কানুন বেশ রসালো করে বলে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, সেই কারণে ক্লাশ কামাই করতে চায় না ছাত্ররা। আজ ক্লাশে এসে একেবারে নূতন ছাত্রদের বললে, 'প্রিয় বন্ধুরা শোন, নকশা, ড্রয়িং মানে, রেখার ক্রিয়া। যেমন, (বোর্ডে এঁকে বুঝিয়ে দিল) কণ্টুর, মানে, বস্তু বা শরীরের সীমারেখা পৃথককরণ। বাস্তব জগৎকে ঢেলে সাজানো বক্তব্যের তাগিদে, দৃশ্যমান জগৎকে ঢেলে সাজানোকে বলে, রূপভেদ প্রমাণ ; প্লাস্টিক এমন একটি জিনিস যা বাঁকানো চোরানো যায়, ময়দার লেচির মত ; যে রকম খুশী আকার দিয়ে পূর্বের রূপ বদলে দেওয়া যায়, শিল্পীর চোখে যা সব দেখা যায়, সেইসব আকার হলো প্ল্যাস্টিক। রঙ রেখা, আলো, বৈষম্য, জমি, স্পেস, দৃশ্য ও অদৃশ্য, ছন্দ রিদ্‌ম্‌, এইসব গুণাবলী ফোটাতে হয় চিত্রে শিল্পীকে। শিল্পীর চোখ হচ্ছে বড় কথা। প্রকৃতির পরিবর্তন সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে, বর্ষায়, ঝড়ে, ঘূর্ণীতে, কোয়াশায়, শিল্পীর চোখে সর্বক্ষেত্রে নব নব অর্থ প্রকাশ বা মানে সৃষ্টি করবে বা সারমর্ম প্রকাশিত হবে। অন্যে কি বলছে তা সে আঁকবে না ; নিজে যা প্রত্যক্ষ করছে তাই আঁকবে। শিল্পীর স্বাধীনতা থাকা উচিত কোন কিছু বাড়িয়ে প্রকাশ করার, সৃষ্টির খাতিরে ; সাহিত্যের মতই বেশী সুন্দর করে বলা, সহজ সরলভাবে বিশ্বের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা, যা বেশী তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি এনে দেবে বাস্তবের তুলনায়, অন্যের কাছে বা দর্শকের কাছে। প্রিয় ছাত্ররা ভুলে যেও না, সব কিছুর রচনা কৌশল বা কম্পোজিশন শিল্পীর নিজের হাতে ; অনুশীলন একমাত্র তোমাদের হাত বা তুলিকে বশে আনবে, অন্য কোন মন্ত্র আমার জানা নেই ; বন্ধুগণ, স্টীল লাইফ, যেমন একটা ঘর, টেবিল, চেয়ার, ডিম, আপেল, লেবু, কফিপট কিম্বা পশু-চিকিৎসার জন্যে আঁকা পশুপক্ষীর এনাটমী বা চিত্র এইসব নিয়ে প্রথমে খুব বেশী অনুশীলন করতে হবে। অভ্যাসে তোমাদের হাত তোমাদের অধীন হবে, দাস হবে, বিশ্বস্ত হবে, এই আমি প্রার্থনা করি। অনুশীলন তোমাদের মূল মন্ত্র।'

সুনীলের কথা বলার ভঙ্গি ছাত্রদের মুগ্ধ করে, বারে বারে ধন্যবাদ দেয়, বিদেশী বলে

কোন অশ্রদ্ধার ভাব তাদের মুখে থাকে না। ক্লাশে ড্রয়িং অভ্যাস দেখে, করিয়ে, ক্লাশ শেষ করে নিজের অনুশীলন কক্ষে চলে যায় সুনীল। রীতা, মণিকা সেখানে উপস্থিত থাকে, আঙ্কেল রসেটি আসেন। তার নিজের অনুশীলন পুরোদমে চলে। এখন অর্থের টান নেই সুনীলের। ফণীজেঠুর চেষ্টায় কলকাতার টাকা আসছে। মাহিনার টাকায় আন্টিকে দেয়।

কাজের শেষে রীতাকে ইশারা করে বাইরের দিকে পা বাড়ালো। মণিকা তার বাঁধা সময়টি ছাড়া এক মিনিটও থাকে না, আঙ্কেল রসেটি কিছু আগে চলে গেছেন। সুনীল যতক্ষণ কাজ করে, রীতা দাঁড়িয়ে ত্থাখে, তাকে ছুটি দিলেও সে বলে, 'ঠিক আছে আমি সময়মত যাবো, তুমি কাজ করো।' রীতার এই অপেশাদারি মানসিকতা দুর্লভ পারী বা পশ্চিমী সমাজে। সুনীলের মনে তার প্রতি মর্যাদাময় মমত্ববোধ জাগিয়েছে। মডেলের প্রতি শিল্পীদের সাধারণত এই আন্তরিকতা মেলে না, যেতে যেতে হেসে বললে সুনীল, 'ডিয়ার রীতা, চলো আজ 'বুলভারে' পায়ে হেঁটে বেড়াই, চাই কি 'নোতরদাম' 'লুভর' স্তেন নদীর তীরে তীরে।'

'ওঃ গড! সারা রাতেও ফিরতে পারবো না বাড়ী, যদি তোমার খেয়াল চাপে শিল্প-সংগ্রহশালা দেখার।' রীতা বললে হাসতে হাসতে।

রীতার কাঁধে একটা হাত চাপিয়ে সুনীল হালকা স্বরে বললে, 'তোমার কি ভয় হয় আমার সঙ্গে রাত কাটাতে পথেঘাটে?'

'অবিশ্বাসীর কাছে রাত্রিদিনের বিচার থাকে না সোনীল, সে অভিজ্ঞতা আমার আছে।'

'তাই নাকি, তোমার অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে ভালই লাগবে।'

'সত্যি গল্প আমার ভাল না লাগতে পারে, সময় নষ্ট করবে।'

'তবু শুনবো, যদি অবশ্য তোমার নিজের আপত্তি না থাকে।' হতাশভাবে রীতা বললে, 'তবে শোন, শেমিয়েরে এক নতুন ছাত্র আমাকে নিয়ে কাজ করলো প্রথম দিন সামান্যক্ষণ। হঠাৎ কাজ না সেরেই বললে, 'চলো রীতা কফি খাই, কাজে মন বসছে না; নিয়ে গেল এক দামি কফিখানায়। পর্দা ফেলা কেবিনে ঢুকেই চুমু খাওয়ার ভঙ্গিতে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আমি তো হতভম্ব, বেকুফ; জানা নেই চেনা নেই, কথাবার্তা নেই, এ কি ব্যাপার! তা ছাড়া সকলেই জানে আমি এ পথের পথিক নই, একবারই ভুল করেছি ফলভোগ চলছে। আমার আড়ষ্ট ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখে, ছেলেটা স্বৈরাচার সামলে নিয়ে বললে, তোমাকে মডেল অবস্থায় দেখেই আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ি, কিছু মনে করো না, আমি ক্ষমা চাইছি, আমি দুঃখিত, আমার এই ব্যবহারের জন্যে কিছু অর্থদণ্ড

দিতে প্রস্তুত আছি। তার কথার উত্তর না দিয়ে, কফি না খেয়ে বেরিয়ে আসি; ভরা দুপুরে লোকভরা ঘরেও এরকম হয় সোনীল, পাত্র বিশেষে প্রযোজ্য। তোমার ভাবনায় কিছু মনে মনে আছে কি খুলে বলো।' হোঃ-হোঃ, হিঃ-হিঃ করে দুজনেই হেসে উঠলো, পাশে হাঁটা পথিকের কেউ কেউ আড়চোখে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

সুনীল হাসতে হাসতে বললে, 'চলো তাহলে আমরা একটা ভাল কফিখানায় ঢুকি।'

'বেশ তো চলো না, কি ভয় দেখাচ্ছ?' হেসে বললে রীতা। হাঁটতে হাঁটতে খুঁজে সত্যি একটা ভাল রেস্তরাঁয়ে ঢুকলো সুনীল।

'কি করছো, কি করছো, অনেক খরচ হয়ে যাবে!' ব্যস্তভাবে বললে রীতা।

সুনীল তার হাত ধরে সাজানো প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে চলে গেল। তাদের পর্দাঘেরা একটি ছোট্ট নিরালা স্থানে বসিয়ে দেওয়া হলো। খাতা হাতে এসে দাঁড়ালো সুবেশী ছোকরা। সুনীল রীতার হাতে মেনুকার্ড দিয়ে বললে, 'আমি ভাল খারাপ ভুল করবো, তুমি দেখে বলো, পয়সার হিসাব করো না, ভাল হওয়া চাই খেতে!'

রীতা সঙ্কোচভরা চোখে সুনীলের দিকে চেয়ে কার্ড দেখতে লাগলো। অনেক খুঁজে খুঁজে একটা খাবার আর একপট কফির ফরমাইশ দিয়ে, সুনীলকে হেসে বললে, 'কি বীর-পুরুষ, চোখ নিচু করে এমন বিজন ঘরে মহাপুরুষ হয়ে গ্যালে তো?' পূর্ব কথা স্মরণ করে, খুব খানিকটা হেসে নিল নীরবে চাপা দুজনেই। তারপর সুনীল রীতার হাত তুলে নিয়ে গভীরভাবে চুম্বন করলে; রীতা ম্লান দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সুনীলের দিকে বেদনার্ত প্রত্যাশায়। খেতে খেতে রীতা প্রশ্ন করলে, 'সোনীল, তোমাদের দেশে সব ছেলেরা কি তোমার মত মরালিষ্ট হয়?'

'আমি মরালিষ্ট কি না, হলপ করে বলতে পারবো না রীতা। তবে দেশের ছেলেদের সব খবর জানি না শুধু কলকাতা ছাড়া, ওখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার সম্বন্ধে বলতে পারি। তাঁরা বিবাহের পূর্বে মেয়ে-পুরুষের দৈহিক মিলন অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন। এর বড় কারণ একটা আছে অবশ্য, অল্প বয়সে বিবাহরীতি। আর শিক্ষিত সমাজের মানসিক গঠন ইংরাজী শিক্ষায় হলেও, কিছু বিশিষ্ট মহাজনদের উপদেশ সাহিত্য নবধর্মমত তাদের চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের মধ্যে অতি অল্প বয়সে বিবাহ প্রাচীন নীতিবোধ, তাদের সংযত রাখে মনে হয়।'

রীতা আবার প্রশ্ন করলো, 'মধ্যবিত্ত বলতে কি বোঝায়? বুর্জোয়া?'

'তোমাদের বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে এঁদের কোন মিল আছে মনে করি না। ইংরাজ আমলে বাংলাদেশেই এ সমাজ গড়ে উঠেছে। কিছু জমিজায়গার মালিক বা সহরে

নানা জীবিকায় আছে, চলতি কথায় ভদ্রলোক বলা হয় এরা আদর্শবাদী হয়, কোন শ্রেণীগত চৈতন্য নেই।'

'তবে কি পেটি বুর্জোয়া?' রীতা জিজ্ঞেস করলে।

সুনীল হেসে বললে, 'এসব জানি না, বুঝিও না, মাথাও ঘামাইনি কোনদিন। ছাড়ো, এখন তোমার অল্প বয়সের গল্প কিছু বলো অবশ্য আপত্তি না থাকলে।'

রীতার মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কফির পট থেকে কফি ঢালার ছলে কিছু সময় নিয়ে নিলো। কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে, নিজে এককাপ নিয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললে, 'নেহাৎই শুনবে? ঘৃণা করবে না তো?'

'ছিঃ, তোমাকে ঘৃণা করবো রীতা!'

'তবে শোন; আমার বয়স তখন চোদ্দ বছরের বেশী নয়, আমাদের কটেজের পাশে মাঠ আর আঙুরক্ষেত। আমার ফ্রক আর জ্যাকেট পরে মাঠে মাঠে, আঙুরক্ষেতের মধ্যে দুপুরবেলা ছুটাছুটি, কখন সঙ্গী নিয়ে, কখন একা অত্যন্ত প্রিয় অভ্যাস রোজই; একদিন দেখি একটি ছোকরা ইজেল লাগিয়ে ছবি আঁকছে। গাছের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। সে বললে—ত্যাখো না ভাল করে, উঁকি দিয়ে দেখতে কেন হবে খুকী? আমি সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম। সে জিজ্ঞেস করলে—কেমন লাগছে? বললাম খুব ভাল মঁসিয়ো। সে হেসে বললে—তোমার নাম কি? বললাম, রীতা। সে বললে, মানে প্রথম টোপ ফেললো—তোমার নামটি সুন্দর! তোমার মুখের মতই সুন্দর। কম বয়স মনে গর্ব নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরলাম। তার পরদিন দেখলাম ছবি আঁকছে, আমাকে দেখে হাতের ইসারায় ডাকলো, তার সামনে গিয়ে আগেই বললাম, তুমি কাল আমার নাম জেনে নিলে, কিন্তু নিজের নাম বলা উচিত ছিল নাকি মঁশিয়ো? ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে বললে—খুব অন্যায় করে ফেলেছি ম্যাদামোয়াজেল, ক্ষমা চাইছি। তার এই নাটুকে কথা শুনে আমি জোরে হেসে উঠলাম, এই শুরু হলো আমাদের মেলামেশা। স্টিফেনের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে মনে হয়, কিন্তু এমনভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করতো আমি যেন মহিলা পর্যায়ে। কম বয়সে একটি সুন্দর যুবক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে এটা ভেবেও আমি আত্মতৃপ্তিলাভ করতে লাগলাম। স্টিফেন আমাদেরই গ্রামেরই একজন আঙুরচাষীর আত্মীয়, কাজেই একেবারে অপরিচিত ছিল না; দিনে দিনে আমাদের মেলামেশা ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো, সে আমাকে রোজ ফুল চকলেট ছবি কিছু না কিছু দিত, তার আন্তরিক ব্যবহার আমার কাছে মন মুগ্ধকর হয়ে উঠলো, (আর একবার কফি দি সোনিল। সুনীল মাথা হেলালো, রীতা তাকে এককাপ দিয়ে নিজে এককাপ নিলো) এরপর তার সান্নিধ্য ক্রমে গা ঘেঁষাঘেষী চুম্বন

সুখকর হয়ে উঠলো, সে ভালবাসার কথা বিবাহের কথা শোনাতে লাগলো আমি ভালবেসে বিশ্বাস করলাম, সে বললে, একটু রোজগার বাড়লেই বিবাহ করবে। তখন সে সহরের দোকানে ছবি বিক্রি করতো। রোজ সকাল থেকে ছবি আঁকতো ছোট বড়, ঘুরে বিক্রি করতো দোকানে। দেখেছি খুব পরিশ্রম করতে। আমার তার ওপর মমতা দুর্বলতা বেড়ে গেল। একদিন নির্জন আঙুরবাগানে সে এমনভাবে আমার অজানা কামকলা শুরু করলো যে আমিও উন্মত্ত হয়ে উঠলাম। সেইদিন আমি তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে বাধ্য হলাম। আমার সর্বনাশের সূচনা। তিন চার মাস পরে মায়ের কাছে ধরা পড়লাম স্বীকার করতে হলো সব কথা। পাগলের মত মা গেলেন সেই আঙুরচাষীর কাছে, সে ধর্মভীরু লোক, স্টিফেনকে চাপ দিতে সে স্বীকার করে নিলো পিতৃত্ব অনাগত সন্তানের ; অস্বীকার করলেও পারতো, এইখানে সে মহত্ব দেখিয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে সাধারণভাবে গ্রামের গীর্জায় আমায় বিবাহ করে সামাজিক সম্মান রক্ষা করেছে এর জন্যে আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আছি, আর কৃতার্থ হয়েছি আমায় একটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর পুত্রসন্তানের জননী হবার সুযোগ দেওয়ায়। শুনলে তো আমার নিষিদ্ধ কাহিনী ?' ছল ছল করে উঠলো রীতার ঘননীল চোখ।

তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আগ্রহে তার হাতে হাত রেখে সুনীল বললে, 'মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, তুমি নিষিদ্ধ ভাবছো কেন ? তোমার দেশে এমন কিছুই নয়। এখন তোমার নিঃসঙ্গ জীবনের জন্যে আমি দুঃখিত রীতা। একটা প্রশ্ন করবো, তুমি কি আশা রাখো সে ফিরে আসতে পারে ?'

রীতা কোন উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইলো মেঝের দিকে মাথা নীচু করে। সুনীল স্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, 'চলো তোমার বাড়ী পৌঁছে দি, রাত হয়েছে।'

রীতা বললে শান্ত কণ্ঠে, 'তুমি আবার অতটা যাবে, সারাদিন কাজ করেছো।'

'কিছু ভেবো না রীতা, তোমায় সঙ্গ দিলে আমি শান্তি পাবো চলো !' রীতার হাত ধরলো।

হেসে রীতা বললে, 'বিল না মিটিয়ে, আমায় বাঁধা রেখে যাবে নাকি ?' সুনীল 'ওঃ' বলে ওয়েটারকে ডাকলো, বিল মিটিয়ে বাইরে এলো সামনেই বাস মিলবে, কেউ কারুরই হাত ছাড়েনি যেন হারিয়ে যেতে পারে !

বেশ রাত হয়ে গেল, রীতাকে তাদের কটেজের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসতে। মিস্ লিলি রাতের খাওয়া সেরে সোফায় বসে বই পড়ছেন। দরজায় শব্দ পেয়ে উঠে

দরজা খুলে দিলেন। সুনীল অপরাধীর স্বরে বললে, 'আমি দুঃখিত আন্টি, দেরী হয়ে গেল।'

'ঠিক আছে, আগে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসো পরে শুনবো সন্।'

একটু হেসে সুনীল বললে, 'আমি হোটেলে খেয়ে এসেছি কিছু মনে করো না।'

মিস্ লিলি অবাক দৃষ্টিতে চাইলেন সুনীল তো বাইরে কোনদিন খায় না! সুনীল একটু ভেবে বললে, (মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত নয়, বলে দিলো যা হয়েছে) 'রীতাকে নিয়ে কফি খেতে গেছলাম, সেখানে রীতাকে একদিন খাওয়ানোর ইচ্ছা হলো, খিদেও পেয়েছিল দুজনে খেয়ে নিলুম।'

মিস্ লিলির মুখ একটু ম্লান হলো, বললেন, 'কি খেলে? রীতা তো ওয়াইন খায়, তুমি কি করলে?'

সরল ভাবে সুনীল বললে, 'রীতাই খাবার অর্ডার দিয়েছিল। কই ওয়াইন অর্ডার তো দেয়নি। আমি তো জানতুম না, কোনদিন লিকার খেতে দেখিনি, এটা কি আমার রীতি বিরুদ্ধ হয়ে গেল?'

মিস লিলি হেসে বললেন, 'তুমি যখন অর্ডার দাওনি, দ্বিতীয়ত তুমি ভারতীয়, এতে দোষ হবে না সন্।'

সুনীল বাইরের পোষাক ছাড়তে ঘরে গেল। পোষাক বদলে ফিরে এসে, কফি খেতে বসলো আন্টির পাশে। তার হাতে কফি মগ দিয়ে মিস্ লিলি বললেন, 'সোনীল, একটা কথা জানার ইচ্ছা করছে, তোমার কি কোন দুর্বলতা হয়ে পড়েছে রীতার ওপর? যদিও এটা ব্যক্তিগত তবু আমি তোমার মায়ের মত আমাকে বলতে কোন লজ্জার কারণ নেই।'

সুনীল তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'চিন্তা করো না আন্টি নিশ্চিন্ত থাকো, রীতার মত ভাগ্যহীনা, দুঃখী, সুন্দর স্বভাবের মেয়েকে দয়া দেখানো যায় না। কারণ ওর আত্ম-সম্মানবোধ প্রবল, তাই মমতা, বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আপনার থেকে।'

মিস্ লিলি খুশী মনে বললেন, 'কিছু মনে করো না সন্, তুমি ঠিক কথাই বলেছো, এক্ষেত্রে বন্ধুত্ব হওয়াই স্বাভাবিক। শুভ রাত্রি!' মিস্ লিলি চলে গেলেন।

সুনীল কফি শেষ করে ঘরে গেল। শোবার সময় চোখে পড়লো একটা চিঠি টেবিলে, তুলে নিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। খাম খুলতে বেরোল সুপ্রকাশের চিঠি। মেঘাচ্ছন্ন মনটা উজ্জল হয়ে উঠলো; বিছানায় চিৎ হয়ে চিঠি পড়া শুরু করলে,—প্রিয়বরেষু, অনেকদিন তো মার চিঠি না পেয়ে চিন্তিত হয়েছি। একটা ছবি-পোস্টকার্ড কিম্বা সাদা পোস্টকার্ডে দু'লাইন লিখে পাঠাতে তোমার এত অনীহা! তুমি না হয় স্বপ্নালোকে

আকাশচারী, ধরাতলে বিচরণশীল মৃত্তিকাবিলাসী অধম কিঙ্কুলকদের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি থাকলে তারা পৃষ্ট হয় না, এই কথাটুকু মনে রেখ ভাই। এরপর পূর্বাচল সংবাদ শোন; আমি এখন আর্টের কর্তা, মানে এম-এ হয়েছি, বর্তমানে একটি কলেজে বক্তৃতাবাজ চাকুরী করছি। মা ভাল আছেন তোমার খবর চান, আমাকে এটা সেটা বলে সন্তুষ্ট করতে হয়। সব চেয়ে গুরুতর খবর হেতুয়া বাড়ীর। ফণীবাবু পরে মুলেখা রাজদ্রোহ আইনে কারারুদ্ধ। মণ্টুবাবু এখন সে বাড়ীর মাতব্বর। এমনি স্বাস্থ্য সব ভাল আছে চিন্তার কারণ নেই। মনে হচ্ছে দেশ স্বাধীন না হলে তুমি ফিরবে না। তোমার খবর দু'লাইনে, আশায় রইলাম দয়া করে মনে রেখো। ইতি সুপ্রকাশ।

শেষে তলায় ছোট ছোট করে লিখেছে। 'তোকে কতদিন দেখিনি, কবে আসবি?'

চিঠিটা হাতে মুড়ে রেখে, চিন্তার ঘূর্ণীতে তলিয়ে গেল সুনীল।

॥ ১৮ ॥

পারী ছাড়ার অভিপ্রায় যেদিন থেকে হয়েছে, মন অস্থিরমতি, দেখতে দেখতে পারীর জীবনযাত্রা প্রায় চার বছর হয়ে এলো সুনীলের। অঙ্কনবিদ্যার কলাকৌশলে সে আর সন্তুষ্ট নয়। সৃজনের বুভুক্ষা পীড়িত চাঞ্চল্য, সারা চেতনা ছেয়ে গ্যাছে। পারীর চিত্রশালায়, বা শিল্পীগোষ্ঠীর সান্নিধ্যে তার শিক্ষা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মনের তৃপ্তি হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা সামুদ্রিক ব্যবধান। আধুনিক চিত্রকলার অনবদ্য চিত্রগুলি, প্রশংসার বস্তুই থেকে যায়, নানা বৈষম্যমূলক অনুভূতি আনে, কিন্তু আত্মজ হয়ে ওঠে না। সুনীলের প্রশ্ন থেকে যায়, ভারতীয় জীবনের সঙ্গে বৈপরীত্য থাকার জন্যেই কি এটা হয়? পারীর জনজীবনে আন্তর্জাতিক লক্ষণ খুবই স্পষ্ট, তবুও পশ্চিমী জগতের সঙ্গে পূর্ব জাগতিক ভেদ অনুভব করে। প্রায়ই দেশে ফেরার বাসনা জোরালো হয়ে উঠেছে। শঙ্করজেঠুর চিঠিতে যা জেনেছে তাতেও ভাবিয়ে তুলেছে আর্থিক চিন্তায়; যদিও এখানের চাকরীতে মাহিনা বেড়েছে। কিন্তু পাটনার ভাড়াটিয়া ভাড়া দিচ্ছে না, পাটনায় মামলা রজু করতে হলে তার উপস্থিতি প্রয়োজন। শঙ্করজেঠুর দ্বারা কলকাতা থেকে সম্ভব নয়। তাঁর কাছে জমা তহবিল প্রায় নিঃশেষিত। এখানের শিল্পব্যাপারী গোটাকতক ছবি বিক্রয় করেছে। কিন্তু তাঁর মতে সুনীলের শিল্প-রীতি ও ধারণার পরিবর্তন না হলে অর্থাগম হবে না। তাঁর মতে এমন ছবি চাই যা সাধারণের চোখে ধরে, কিম্বা প্রসিদ্ধ সমালোচকের প্রশংসা প্রাপ্ত, বুঝুক না বুঝুক, কেনার ক্ষমতাওয়ালা লোকে বেশী দামে কিনবে। বুদ্ধিমান বোদ্ধা, দেখবে, ভাল বলবে, কিন্তু কিনতে পারবে না।

সুনীলের মণিকাকে নিয়ে আঁকা দুটো ছবি বেশ ভাল দাম পেয়েছিল। তাই রীতা প্রায়ই বলে, তুমি মণিকাকে নিয়ে মন দিয়ে কিছু আঁকো, আমি তো আছিই।

সুনীল বাজে সময় নষ্ট করতে চায় না তার অর্থের প্রয়োজন কম। রীতাকে বলে ছবি বিক্রয় করার জন্যে সে আঁকতে চায় না ভাল ছবি আঁকার চেষ্টা করতে চায় আর একটা কথা নিজের ভাল ছবি কেউ বিক্রয় করে না। আর্টিস্ট তার ভাল ছবি মন ধরে পরের হাতে তুলে দেয় না বাধ্য হয়ে ছাড়া। তুমি তোমার ছেলেকে পর করার ভয়ে নিজে এত বঞ্চিত যন্ত্রণা ভোগ করছো কেন? বিক্রয়ের খাতিরে বা সমালোচনার খাতিরে কোন কিছু করার উৎসাহ পাই না রীতা। সুনীলের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে রীতা চুপ করে যায়।

সুনীল আবার বলে, 'মনে করো ভিনসেণ্ট ফান্ খোখের কথা অসামান্য শিল্পীর ছবি তোমাদের পারী সহরে তাঁর মৃত্যুর পর বিক্রয় শুরু হয়। এই কলা-সম্রাট আজীবন ছোট ভাইয়ের সামান্য অর্থ সাহায্যে আজীবন কষ্টে কাটিয়েছেন ছবি এঁকে শুধু। সে হিসেবে আমার আর্থিক অবস্থা অনেক অনুকূল, প্রয়োজন সংযত, কেন আত্মবিক্রয় করতে যাবো রীতা? আধুনিক পশ্চিমী মানুষেরা কোনদিন অভাবশূন্য মনে করে না, অভাব বাড়িয়ে চলাই এঁদের জীবন বেদ!'

রীতা তার কথা ভাল বোঝেনি; ছবি বিক্রি করে সে সংসার চালাতে দেখেছে কম বয়সে; আমদানী কম পড়ায়, সাংসারিক দায় বাড়ায়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত শিল্পী আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে পলায়ন সহজ পথ মনে করলো। ডিভোর্স চায়নি সে। সুনীল রীতাকে বলেছিল, 'স্টিফেন হয়তো ফিরে আসতে পারে।'

উত্তরে রীতা বললে, 'ও লোকটা বড় দুর্বলমতি! অভাবে অনাহারে হয়তো মরেই গ্যাছে। ওর কথা আর ভাবি না। আমার একটাই চিন্তা সম্মানের সঙ্গে ছেলেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সোনীল।'

নানা ভাবনায় সকাল কাটাচ্ছে বিছানায় সুনীল। কোথাও যাবার নেই শুধু যাওয়ার ভাবনা নিয়ে, কলকাতায় ছবি আঁকতে মনে। এ কদিন যতই নিসর্গ প্রকৃতির নৈকট্যের কামনায় উন্মুখ হয়ে উঠছে আপন করার তাগিদে, ততই পারীর পথ ঘাট মাঠ ময়দান মানুষজন আকাশ বাতাস অপরিচয়ের কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে। আপনজন খুঁজে পাচ্ছে না যাকে সৃষ্টি করবে মনে মনে স্বপ্নের তিলোত্তমারূপে। পশ্চিমী চিত্রকলা দেখে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় মন ভরে গেলেও অপূর্ণতা থেকে যায় মনে, জড়তা, অপরিচিতির অনাত্মীয়তা। ভারতের বিচ্ছেদ বেদনা যেন ঠেলে ওঠে। নিজের মা'টির সঙ্গে কি নিবিড় বন্ধন, ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায় আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিসর্গের ছবি আঁকতে গিয়ে কাল-

বৈশাখীর কালো মেঘ মন ছেয়ে ফেলে। আষাঢ়ের বর্ষণমুখর মধ্যাহ্ন স্মরণ করায় বিরহী যক্ষের কথা।

প্রথম যখন বিদেশে এলো, চোখ ধাঁধানো প্রাচুর্যপূর্ণ নির্মাণ ও সৃষ্টি দেখে নূতনত্বের উন্মাদনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল সুনীলের মন। অনুশীলন পর্বে উৎসর্গীত উৎসাহ কোন কিছু ভাবার অবকাশ দেয়নি। অবকাশ যবে থেকে মিললো, চিরঅশান্ত সুনীল শান্তির আশায় রূপান্তরকামী হয়ে উঠলো। ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরেছে তুলির মর্মকথা আবিষ্কারের তাড়নায় এখন দেশে ফেরার সম্ভাবনায়, অজন্তা ইলোরা কনার্ক বুদ্ধ নটরাজ তাকে টানছে। বৈশাখের কাল-বৈশাখী আষাঢ়ের বর্ষণ মুখরতা, শরতের শিউলি-ঝরা ঘাসের গালিচা পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের উর্বশী মেনকা—রঙের স্বপ্নস্বর্গ, সবই তার মনে এসে পড়ছে যা এতদিন বেমালুম ভুলে ছিল।

সুনীল সারা সকাল বিছানায় গড়িয়ে, এখানে আর কাজে হাত দেবে না, এখন আঙ্কেল রসেটির আর রীতার আসার অপেক্ষায়, রীতার সকাল সকাল আসার কথা ছিল, সে আজ লাঞ্চ রান্না করে সকলকে খাওয়াবে। আন্টি একমগ কফি দিয়ে বললেন, ঘরে এসে, 'ওঠো সোনীল, কতক্ষণ শুয়ে থাকবে?'

সুনীল তার দিকে চেয়ে হেসে কফি নিল। আন্টির মনের অবস্থা সুনীল বুঝতে পারছে। তাঁর মুখের ভাব দেখে; এ মুখ তার চেনা, আর এক মায়ের দেখে দেখে। সব মুখই মায়েদের এক হয়ে যায় সময়ে। শুধু অবয়বের তফাৎ এই যা। আন্টির দুটো ছবি এঁকেছে, একটা দিয়ে যাবে, একটা নিয়ে যাবে। রীতার তো অনেক ছবি আঁকা আছে, পেন্টিং ফটোধর্মী অবশ্য একটাই, নিয়ে যাবে সব। নিজের ফটো একটা আন্টি নেবেন, একটা রীতা বলে রেখেছে। কবে যে রওনা হবে স্থির হয়নি এখনও আঙ্কেল রসেটি গ্যাছেন খবর আনতে জাহাজের। সুনীলের এই অনির্দিষ্ট স্থিতি বড়ই অস্বস্তিকর।

হাতে একটা বোঁচকা নিয়ে ঘরে ঢুকলো রীতা। জ্যাকেট পেটিকোট ফ্রক, বেশ রঙ মিলিয়ে পরেছে; মাথার চুলে ফ্রেঞ্চরোল, চোখে মুখে ঠোঁটে প্রসাধনের চিহ্ন রয়েছে। এসব ব্যাপারে সে খুব উদাসীন থাকে, আজ হঠাৎ তাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। এক গাল হেসে রীতা বললে, 'কি দেখছো হাঁ করে ইয়োগী?'

ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললে সুনীল, 'সখি অভিসারে যাবে নাকি?'

'যাবো না, এলাম সখা।' হেসে বললে রীতা।

সুনীল আঙুল দেখিয়ে বললে, 'হাতে বোঁচকাটা কিসের, গৃহত্যাগ করার বাসনা?'

'না-না, এটা আন্টিকে দিয়ে আসি, লাঞ্চের মালমশলা।' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল রীতা। সুনীল উঠে পোষাক পালটে মুখ ধুয়ে চুল ঠিক করে চেয়ারে বসে কর্টিজের

বাইরে রাস্তার দিকে চাইলো। ঘন সবুজ লম্বা লম্বা পাতায় সোনালী মুকুট। সাড়ে চার বছরে এ-দৃশ্য খুব চেনা হয়ে গেছে। এই রাস্তায় কদাচিৎ লোকজন দেখা যায়; ছুটির দিনে বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল মৌসুমী ফুলের মত রঙ ছড়ায় সারা মাঠময়।

আণ্টি আর আঙ্কেল রসেটির চড়া গলায় আলোচনা কানে এলো। ঘরের চারিদিকে নজর দিয়ে, চেয়ার ঝেড়ে সুনীল বিছানায় বসলো। অল্প পরেই আঙ্কেল রসেটির 'সোনিল সোনিল!' ডাকের সঙ্গে তাঁর ভারী বুটের আওয়াজ পেল, তিনি ঘরে ঢুকতেই সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিলে। চেয়ারে বসতে বসতে তিনি বললেন, 'ডিয়ার বয়, তুমি ভাগ্যবান কাল রাত্রেই একটি ব্রিটিশ জাহাজে তোমার প্যাসেজ রিজার্ভ হয়েছে একটু তাড়াহুড়ো হলো, তোমার আণ্টি খুব ক্ষুণ্ণ, কিন্তু এরপর আবার কবে পাওয়া যাবে ব্রিটিশ জাহাজ জানা নেই তো। তোমার কি খুব অসুবিধা হবে?'

'না না, ঠিক আছে স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!'

একটু হেসে আঙ্কেল বললেন, 'তোমার আণ্টি বলে কিনা, তুমি তাড়াতাড়ি সোনিলকে বিদায় করতে চাইছ কেন, ও তোমার কি অসুবিধা করছে? দেখ তো, তোমার আণ্টি বড় ঝগড়াটে মহিলা!'

সুনীল ম্লান হেসে চুপ করে রইলো। আঙ্কেল টেবিলে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'ও! সন্, এইটে রেখে দাও দরকারে কাজে লাগতে পারে।' পকেট থেকে রোলকরা একটা কাগজ দিলেন সুনীলের হাতে। সুনীল সেটা পড়তে লাগলো, গ্রাদ শেমিয়েরের লেটারহেডে স্ট্যাম্প দেওয়া সার্টিফিকেট, ফরাসী ভাষায় পরে ইংরাজী অনুবাদ। প্রশংসাপত্র মূলকথা লিখেছেন, 'কর্মকুশল, অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শী নির্মল চরিত্র, আদর্শ স্বভাবের অধিকারী আমাদের প্রিয় ছাত্র সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। তাহার সার্বিক উন্নতি কামনা করি। তাহার অঙ্কন কৌশল ও জ্ঞান যে-কোন প্রতিষ্ঠানের গর্বের বস্তু। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তার ভবিষ্যত সার্থক হউক। ইতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তিনটি সই একটি আঙ্কেল রসেটির।'

সুনীল কৃতজ্ঞচিত্তে রসেটির বুটে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতে, রসেটি সাহেব তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'মাই ডিয়ার বয়! মাই ডিয়ার সন্ গর্ড ব্লেস ইউ!'

সেই সময় আণ্টি এসে ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই মমতাহীন লোকটা তোমায় যত শীঘ্র সম্ভব প্যারী থেকে বিদায় করতে চায়।' সুনীল রসেটি দু'জনেই হেসে উঠলো। সুনীল বললে, 'না না এটা দৈব ইচ্ছা আণ্টি।'

হাত নেড়ে রাগের গলায় বললেন মিস্ লিলি, 'বাজে কথা! এখন তোমরা খেতে চলো সব প্রস্তুত।' তিনি বেরিয়ে গেলেন।

খাবার টেবিল ফুলটুস দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। ডিস গেলাস কাঁটা চামচ ছুরি সব ঝকঝকে, টেবিলে লোক অনুযায়ী সাজানো। মাঝখানে কাট গ্লাসের সৌখিন পাত্রে রঙিন পানীয়। খাবার যা কিছু হয়েছে সুন্দরভাবে নানা পাত্রে রাখা পশ্চিমী রীতিতে। দেখলেই খিদে পেয়ে যায়। আন্টি বললেন, 'আজ যা-কিছু দেখছো, সাজানো থেকে রান্না সব রীতা করেছে।'

আঙ্কেল জোরে বলে উঠলেন, 'সেই মূর্খটাকে যদি কোনদিন দেখতে পাই, কান ধরে নিয়ে আসবো রীতার সামনে, ভীরু জানোয়ার!'

রীতা সকলের রাখা গ্লাসে রঙিন পানীয় দিয়ে, সুনীলের বেলায় আন্টির দিকে চাইলো। সুনীল তার দিকে চেয়ে বললে, 'আঙ্কেলের সম্মানে আমাকে একটু দিতে পারো রীতা।' সবাই হাসলো, রীতা তার পাত্রেও সাবধানে ঢাললো। সকলে গ্লাসে ঠেকাঠেকি করে সুনীলের স্বাস্থ্য কামনা করে চুমুক দিল। আন্টি বললেন, 'সোনীল, ধীরে ধীরে চুমুক দাও!'

আঙ্কেল আরো দুবার গ্লাসভর্তি পানীয় নিলেন। খাওয়া শুরু করে আঙ্কেল সুনীলের দিকে চেয়ে বললেন, 'সন্, তুমি আমাদের মনে রাখবে তো?'

'নিশ্চয় স্যার!' জোর গলায় বললে সুনীল।

'তোমার শেমিয়েরকে, পারীকে?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় স্যার, আজীবন!'

'তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তাঁকে গল্প করতে পারতে। তবে সকলকে বলো আমাদের কথা, পারীতে বিদেশী ছাত্রদের প্রতি ব্যবহারের কথা। বলো আমরা ইংরাজদের মত দাম্ভিক জাতি নই, সকলকে সমান চোখে দেখি। এটা সত্য নয় সন্?'

'একশো ভাগ সত্য স্যার!' জোর দিয়ে বললো সুনীল।

আঙ্কেল বললেন, 'ধন্যবাদ। আমাদের শুভ কামনা নিয়ে দেশে ফিরে যাও। যদি পরে আসতে চাও, আমায় জানিও। তোমার মত শিল্পী, নিজের দেশের গৌরব বাড়াবে এই কাম্য।'

সবাই খাওয়ায় মন দিল, সুনীলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। আন্টি, আঙ্কেল, রীতার দিকে বারে বারে চাইতে লাগলো; আন্টি, রীতা মাথা নীচু করে খেয়ে চলেছে। মানুষে মানুষে ভালবাসার বন্ধন যত সাময়িক মনে হয় ততো সাময়িক নয়; সুনীলের মনে হচ্ছে। মায়া সর্বগ্রাসী, বিচ্ছেদ বেদনা তাই মানবিক সত্য, অনিবার্য পরিণতি। যে জীবনে মায়ার স্পর্শ নেই, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা নেই, দার্শনিকরা বলেন, সে জীবন নাকি অনন্ত সুখের অধিকারী হতে পারে। সুনীলের প্রশ্ন, 'কি সুখ, কিসের অধিকারী?'

এ প্রশ্নে উত্তর মেলেনি। সুনীল ভাবতে ভাবতে খাওয়া শেষ করতে পারেনি, সকলে খাওয়া শেষে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সুনীল বললে, 'আমি দুঃখিত! আপনারা উঠতে পারেন, আমার হয়ে এসেছে!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভেবো না।' আন্টি বললেন সকলের দিকে চেয়ে।

আঙ্কেল রসেটি স্নেহভরা দৃষ্টিতে সুনীলকে লক্ষ্য করে আন্টিকে বললেন ফরাসী ভাষায় নিম্নস্বরে 'বড়ই ভাবুক ছেলে, চোখ দেখো!'

আন্টি তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'চুপ করো, ও ফরাসী বুঝে নেবে।'

সুনীল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল। সে যে অন্যমনস্ক হয়েছিল এঁদের চোখ এড়ায়নি। ঘরে জানালায় এসে দাঁড়লো। রৌদ্রের ছোঁয়ায় সারা প্রকৃতি রূপোর মত দীপ্তিময়ী রূপসী। মনের কালো যবনিকা সরে গেল। কি করে কোন রঙে রূপসীকে ধরা যায় ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেল সুনীল। পেছনে নিঃশব্দে রীতা এসে দাঁড়াতেই চেনা গন্ধে সুনীল পেছনদিকে হাত বাড়িয়ে রীতাকে ছুঁলো। রীতা তার হাত নিয়ে বললে, 'খাবার খেতে কেমন লাগলো?'

'ভাল তো লাগছিল, ক্রমে বিদায়ের কথা মনে পড়ায় স্বাদ বিস্বাদ হয়ে উঠলো!'

রীতা সস্নেহে সুনীলের চুলে বিলি কাটতে লাগলো। একটু পরে বললে, 'আজ কাজ থাক সোনিল, বসো বিছানায়।'

সুনীল হেসে বললে, 'ঠিক কথা রূপসী তো পেয়ে গেলুম!'

'মানে?'

'জানালা দিয়ে দেখো।'

'ওঃ।' চুপ করে চাইল রীতা, সুনীল বললে, 'আন্টি আমার কফি দিলেন না?'

'আন্টি বাজারে গেছেন তোমার যাওয়ার কি সব বন্দোবস্ত করতে, আমাকে বলে গেছেন কফি দিতে, এখুনি নিয়ে আসছি।' চোখ বুজে সুনীল আরাম করছিল। হাতে কফির মগ নিয়ে এসে দাঁড়ালো রীতা। গন্ধ পেয়ে সুনীল সজাগ, হেসে বললে, 'তুমি যতই বেড়ালের মত হাঁটো। তোমার গন্ধ তোমায় ধরিয়ে দেবে, কি আকর্ষণীয় এ সেন্ট্, নাম কি?'

'তোমার ভাল লাগে?'

'খুব। ভোলা যায় না!'

'তুমি কফি খাও আমি আসছি।' রীতা ফিরে এলো একটা সুন্দর শিশি নিয়ে, সুনীলের হাতে দিয়ে বললে, 'আজই কিনেছি তোমাকে দিলুম এই গন্ধতে আমায় মনে পড়বে অবশ্য যদি চাও।'

'তোমাকে মনে করার জন্যে কোন উপলক্ষ্যের প্রয়োজন নেই, ওটা তুমি রেখে দাও।'

তার স্বর শুনে রীতা বললে, 'অমনি রাগ হয়ে গেল ? আমি যদি এইটুকু দিতে পেরে সান্ত্বনা পাই, তুমি তাও দেবে না ?'

'না না ভুল করো না রীতা, দাও—এই দেখ তোমার দেওয়া শিশি আমি বুকের মধ্যে রেখে দিলুম।' শার্টের মধ্যে গুঁজে নিল শিশিটা।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো রীতা। বললে, 'পাগল! শিল্পীরা এত পাগলামী করতে পারে ? হা ঈশ্বর!' একটু থেমে আবার বললে রীতা, 'আন্টি বলে গেছেন, তোমার নূতন কেবিন ট্রাঙ্কে ছবিগুলো সব তারিখ দেখে গুছিয়ে দিতে তুমি একটু বলে দেবে ?'

আঙুল দেখিয়ে বললে সুনীল, 'ওই তো এক জায়গায় জমা করা আছে, পত্রের পর তারিখ পেয়ে যাবে দেখো!'

রীতা ছবির দিকে গেল। জানালার দিকে চেয়ে কলকাতার একটা দিনের কথা সুনীলের মনে এলো। রীতা ট্রাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় বেরিয়ে এলো অন্য ছবির সঙ্গে রাখা একটা ছবি। সেটা নিয়ে গভীর আগ্রহে দেখতে লাগলো, পরে প্রশ্ন করলে, 'সোনিল, এ কার ছবি, এ তো এখানের আঁকা নয় ?' চমকে সুনীল ফিরে চাইলে, দেখলে সুলেখার ছবি নিয়ে একমনে দেখছে। 'ওটা কলকাতায় আঁকা রীতা!' সুনীলের মুখ গোমড়া। আবদারের সুরে রীতা প্রশ্ন করলে, 'কার ছবি সোনীল ?'

সুনীল উত্তর না দিয়ে বললে, 'ঐ তোমার ছবি সাজানো হচ্ছে, এভাবে যদি ছবির ইতিহাস জানতে চাও সারা রাতেও কাজ শেষ হবে না।'

'শুধু এই ছবিটার পরিচয় বলো। কি মিষ্টি মুখ, কি স্বপ্নাতুর টানা চোখের দৃষ্টি, ঘন কালো, শ্যামলা রঙে মুখশ্রী যেন পাথরে খোদাই, বলো সোনীল, এ কে ?' সুনীল মাথা নীচু করে রইলো, রীতা উঠে এসে তার কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বলার ভঙ্গিতে বললে, 'তোমার ফিয়াঁসি।' সুনীল চুপ করে মাঠের দিকে চেয়ে রইলো। রীতা তার কাঁধে হাত রেখে সেইদিকে চেয়ে বললে, 'দেখো সোনীল, কি সুন্দর! তুমি চলে যাবে, ওই মাঠ থাকবে, তুমি আমি দুজনে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো তখনও ওই মাঠ ওই ফসল ওই ভুট্টার ক্ষেতের মাথায় রূপালী সোনালী মুকুট থাকবে। প্রকৃতির আইন! প্রেম ভালবাসা এও প্রকৃতির আইন, এও থাকবে তুমি আমি থাকি বা না থাকি।'

অবাক বিস্ময়ে সুনীল চেয়ে রইলো রীতার দিকে, কি বলতে চায় বোঝার চেষ্টায়। রীতার মুখ, সকালের সেই ঝলমলে প্রজাপতি যেন পাতার ওপরে মরে পড়ে আছে। ছটফট করে সে রীতার দুটো হাত নিয়ে বললে, 'ক্ষমা করো রীতা, লজ্জার জন্যে কিম্বা

তোমার সান্নিধ্য হারাবার আশঙ্কায় সুলেখার কথা তোমায় বলিনি। তবে তোমার প্রতি কোন খারাপ আচরণও করিনি, আমার অনুরোধ আমায় ক্ষমা করো গোপন রাখার জন্যে ডিয়ার রীতা!'

রীতা হেসে সুনীলের মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে বললে, 'তুমি একটি চূড়ান্ত পাগল! কোন ছেলেকে এই বয়সে এত সংযত নির্মল চরিত্র দেখিনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, প্রেম ভালবাসা প্রকৃতিরই বিধান; তোমার একজন ভালবাসার পাত্রী আছে জেনে বলতে চাইছিলাম, ইয়োগীরও প্রেমিকা আছে যে যুবক চার বৎসর আমার পাশে পাশে থেকেও কোনদিন অঙ্গস্পর্শের আগ্রহ দেখায়নি বা মুখচুম্বন করেনি, তাকেও প্রকৃতি বশ করেছে। আমি না হয় সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেকে সংযত রাখতে বাধ্য হয়েছি, তোমার তো সে বাধা নেই। তোমার প্রতি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিলে কি বা বলার ছিল। তবু তুমি যে উদাহরণ সৃষ্টি করলে, তোমাদের শিল্পীগোষ্ঠী তা স্মরণ করবে। আমাকে বেশী অর্থ দিয়ে কোন বাড়তি প্রতিদান চাওনি, পশ্চিমী দুনিয়ায় এ কি কম কথা মনে করো। তোমার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই আমার কাছে।' শেষের দিকে গলা ভেঙে এলো, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রীতা।

রীতা ফিরলো দু' মগ কফি হাতে নিয়ে। সুনীল কফি নেবার সময় লক্ষ্য করলে রীতার চোখ মুখ ফুলো ফুলো লালচে। সে কফি শেষ করে ছবিগুলো গোছাতে শুরু করলে, সুনীল কোন কথা না বলে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে রইলো। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে রীতা ছবিগুলো সাজিয়ে রাখলো তারিখমত। সুনীল বিছানায় উঠে বসে বললে, 'যদি কিছু মনে না করো, আমি এখানে যে ভারী ওভারকোটটা কিনেছি, সেটা যদি তোমার ছেলের জন্যে আঙ্কেলের উপহার হিসেবে নাও খুব খুশী হবো।'

'সেকি, ওটা তোমার শীতকালে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।' বললে রীতা।

হেসে বললে সুনীল, 'কলকাতায় ওটা পরলে লোক হাসবে। ওটা তোমার ছেলের মাপে করে নিও।'

'তা বলে অত দামী জিনিষটা তুমি ফেলে দেবে?'

'ফেলে দিচ্ছি কই, তোমার ছেলেকে দিচ্ছি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।' হেসে বললে সুনীল।

রীতা বললে, 'ঠিক আছে, আন্টি এলে দেখা যাবে।' বলতে বলতেই আন্টির গলা শোনা গেল, 'রীতা, অন্ধকার হয়ে গেল তোমার দেরী হয়ে যাবে!'

চেঁচিয়ে বললে সুনীল, 'আন্টি আজ আমি পৌঁছে দিয়ে আসি রীতাকে?' ঘরে না ঢুকে তিনি বললেন, 'বেশ যাও, কিন্তু বেশী দেরী করো না সন্!'

সুনীল ওভারকোটটা কাগজে মুড়ে রীতার হাতে দিয়ে বললে, 'যাও জিজ্ঞেস করোগে।'

রীতা আন্টির ঘরে গেল, ফিরে এলো আন্টির সঙ্গে। মিস্ লিলি বললেন, 'সোনীল, তুমি এত দামী কোটটা বিলিয়ে দিচ্ছ? তার চেয়ে বিক্রি করে দাও, বাজারে অনেক দাম পাবে।'

'না আন্টি, আমি রীতার ছেলেকে একটা উপহার দিচ্ছি, আপনি আপত্তি করলে রীতা নেবে না বলেছে।'

খানিক চিন্তা করে মিস্ লিলি বললেন, 'বেশ দাও গরীব ছেলেটাকে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।' ওভারকোটের প্যাকেট নিয়ে দুজনে রাস্তায় বেরোল।

বসন্তের আমেজ এসেছে; পারীর রাস্তায় রাস্তায় বেশ ভীড় বেড়েছে লোকের। একহাতে বাণ্ডিল, একহাতে রীতার হাত ধরে বাস স্ট্যাণ্ডে এলো সুনীল। বাসে উঠে পেছনের দিকে সুবিধামত পাশাপাশি বসলো। বাস ছাড়ার পর সুনীল বললে, 'কাল আমায় বিদায় দিতে স্টেশানে আসবে তো?' রীতা কোন সাড়া দিল না। সুনীল একটু বাদে একই প্রশ্ন করলো; হঠাৎ টপটপ জলের ফোঁটা পড়লো সুনীলের হাতে। ব্যস্ত হয়ে সুনীল কাঁধ নেড়ে বললে, 'তুমি কাঁদছো! না না প্লিজ, আমি কষ্ট পাবো প্লিজ।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রীতা বললে, 'আমায় স্টেশানে যেতে বলো না সোনীল, আমি বিদায় দিতে গিয়ে সকলের সামনে সামলাতে পারবো না স্টেশানে, আর সারা পারী ঢিঢি পড়ে যাবে, নানা গল্পে ছেয়ে যাবে! আমি বরং ঘরে বসে কাঁদবো, তোমার মঙ্গল কামনা করবো যীশুর কাছে। আমায় ক্ষমা করো সোনীল। আমার প্রিয় সোনীল!'

তার একটা হাত তুলে নিয়ে সুনীল সান্ত্বনার সুরে বললে, 'ঠিক আছে, তোমায় যেতে হবে না আমি বুঝেছি রীতা।'

রীতা তার ঘাড়টা এলিয়ে দিল সুনীলের কাঁধে, তার চুলের স্পর্শ, গন্ধ, উন্মাদ করে দেয় বুঝি, তার বড় বড় নিশ্বাস পড়তে লাগলো সর্বশরীর কাঁপছে। রীতা তার হাতটা আঁকড়ে ধরলো; বাস চলছে পূর্ণ বেগে, সুনীল কেঁপেই চলেছে; রীতা পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে সুনীলকে জড়িয়ে ধরে সামলাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাসের গতিবেগে বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুনীল সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, রীতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। রাত্রের ফাঁকা বাস দু'একজন লোক তাদের লক্ষ্য করে চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। সুনীলের চোখ বোজা ভারী গলায় আস্তে বললে, 'রীতা পেরিয়ে না যায়, রাস্তা দেখো।'

সময়মত রীতা বেল দিলো, বাস থামলো। দু'জনে ধরে ধরে সামনে নামলো, তাদের দিকে চেয়েছিল বাসের লোকেরা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা কটিজের পথ ধরলো, সামনে এসে সুনীল বললে, 'এইবার আমি ফিরি রীতা?'

'না, কিছুতেই না সোনিল, একটু বিশ্রাম করে তবে যেতে দেবো তোমায়, ভেতরে চলো।' হাত ছাড়লো না রীতা।

সুনীল ধীরে ধীরে ঢুকলো কটেজে। রীতার ডাকে রীতার মা বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে, পরিচয় দিতেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার কি সৌভাগ্য, এসো এসো ভেতরে এসো! তোমার কত নাম শুনেছি রীতার কাছে কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য একদিনও তোমাকে আনা সম্ভব হয়নি। তোমরা বসো আমি কফি করে আনি, না লিকার দেবো?'

রীতা বললে, 'লিকার উনি খান না, তুমি কফি দাও, উনি একটু বিশ্রাম করে চলে যাবেন, বেশী দেরী হলে বাস মিলবে না।' তিনি কফি করতে ভেতরে গেলেন।

'একটু শুয়ে পড়বে আমার বিছানায়?' রীতা বিছানা দেখিয়ে বললে।

সুনীল ম্লান হেসে বললে, 'তোমার বিছানায়! ঈশ্বর রক্ষা করুন, তোমার চুলের গন্ধে কম্পিত হলুম, বিছানার গন্ধে মূর্ছিত হব নিশ্চয় প্রিয়!'

একটা চড় মেরে রীতা বললে, 'নটি বয়! কফি দেবার মাঝের সময়ে, হেলান দিয়ে আরাম করলো সুনীল। রীতার মা কফিপট মগ নামিয়ে রেখে বললেন, 'তোমরা বসো, আমি শুতে যাচ্ছি বাবা, বুড়ী মানুষ।'

'নিশ্চয় মা, আপনি শুতে যান।' সুনীল বললো।

রীতা কফি দিয়ে বললে আবেগভরা কণ্ঠে, 'আমার একটা শেষ অনুরোধ রাখবে?'

'কেন রাখবো না রীতা, যদি অন্যের ক্ষতি না হয়।' বললে সুনীল।

এক ভিভানে বসলো রীতা সুনীলের পাশে। বললে তার দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে, 'ছেলেকে ওভারকোট দিলে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে, আমাকে কিছুই দেবে না?'

'কি চাও বলো রীতা, কি দিতে পারি?' অপরাধীর মত বললে সুনীল।

'একটা স্মৃতি-চুম্বন সোনীল, আজীবন যা মনে রাখবো।'

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বললে, 'এসো প্রিয় বান্ধবী, আমি ধন্য হবো।' তার ঠোঁটের ওপর গম্ভীর চুম্বন করলো, রীতা ঠোঁট চেপে দীর্ঘ চুম্বন নিল চোখ বুজে। সুনীল ভিজে ঠোঁটের স্বাদ পেলো, গন্ধ পেলো; রীতা নিজেকে আরো চেপে ধরে তার সারা মুখের মিষ্টত্ব নিল, হাঁ করে সুনীলের ঠোঁট গ্রহণ করলো নিজের মুখে, চোখ দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রুর বন্যা সুনীলের শার্টকলার ভিজিয়ে দিল। এ চুম্বন কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল ধারণা নেই, মনে নেই, শুধু ক্রন্দন আর চুম্বন মিশ্রিত লোনা স্বাদের স্মৃতি অম্লান থেকেছে।

ফেরার বাসে উঠিয়ে দিয়ে গেল রীতা মুখে টোয়ালে ঢাকা দিয়ে, হাত নেড়ে বিদায় জানালো দু'জনেই। তাদের মুখে কোন কথা ছিল না।

তৃতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

চার বছর আট মাস বাদে বম্বে মেল থেকে হাওড়া স্টেশনে নামলো সুনীল। কেমন যেন তমসাচ্ছন্ন লাগছে মনে, মধুর মিলন প্রত্যাশায় কোন উৎসাহ আগ্রহ নেই! আন্টি, আঙ্কেলরসেটি, রীতা, সাজানো বুলভার, শেগিয়ের বারে বারে উঁকি মারছে, দৃশ্যের আমূল পরিবর্তনের মাঝখানে। অন্তরমুখী কল্পনাপ্রবণ সুনীল জনতার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে হাওড়া স্টেশনে পা দিয়ে।

অসহায় দৃষ্টিতে চারদিক চাইল; কুলীরা তার মালপত্তর নামাতে ব্যস্ত; এত পরিচিত হাওড়া তবু যেন অচেনা!

ভিড়ের ভেতর থেকে ঠেলে এলো পরিচিত মুখটি আর অতি চেনা গলার স্বর।

'সুনীল, সুনীল।' হাসিতে ভরা মুখ, এসে জড়িয়ে ধরলো সুপ্রকাশ।

যেন ভাসমান সাগরে পায়ে মাটি পেলো সুনীল, গালে গাল ঠেকিয়ে বললে, 'যাক্, বম্বের টেলিগ্রাম পেয়েছিস! আমি তোকে না দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলুম।'

একটা কুলী তোর কামরার ভুল হদিস দেওয়ায় ভিড় ঠেলে আসতে দেরী হলো। তুই ঘাবড়ে গিয়েছিলি মুখ দেখে মনে হচ্ছে, দুনিয়া ঘুরে এসেও তোর পরিবর্তন হলো না, মেয়েছেলেই রয়ে গেলি!'

'মেয়েছেলে মেয়েছেলে বলিসনি, যা মেয়েছেলে দেখে এলুম, তোর আমার মত পুরুষদের পকেটে পুরে বাজারে বিক্রি করে দিতে পারে।'

কুলীদের তাগাদায় সুপ্রকাশ বললে, 'চলো বাবা, আমরা পেছনে যাচ্ছি।'

গেট থেকে বেরিয়ে কুলীরা প্রথম শ্রেণীর ফিটন গাড়ীর সারিতে দাঁড়ালো। সাহেবের পোষাক-পরিচ্ছদ মাল-পত্তরের কায়দা-কানুন দেখে তারা বুঝে নিয়েছিল কোন ক্লাশের যাত্রী।

সুপ্রকাশ বললে, 'আরে এত মালপত্তর যাবে?' একজন গাড়োয়ান এগিয়ে এসে বললে, 'ঠিক যাবে, হামি ঠিকসে লিয়ে লেবে সাব।' চামড়ার বড় থলেতে মালপত্তর আর সামনের সীটে ট্রাঙ্ক চমৎকার সাজিয়ে নিল সে। পেছনের চওড়া গদিওয়ালা সীটে আরাম করে বসলো দুজনে। এ গাড়ী চলে ভাল, আওয়াজ নেই, বড় চকচকে ঘোড়া; এ গাড়ীর ভাড়া কিছু বেশী, সাহেব, মেম, বড়বাবুদের জন্যে গড়ের মাঠের দিকে বেশী দেখা যায়।

সুপ্রকাশ বললে, 'কি দেখে এলি গল্প বল।'

'পাগল! অনেক সময় লাগবে। এ্যাকেবারে আলাদা, নির্মাণে, সৃষ্টিতে, ভাষায়, সভ্যতায়, খাওয়ায়, স্বভাবে কোন মিল নেই। ফরাসী জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক অভিপ্সা, মানবিক প্রীতি প্রশংসনীয়, এটা ওঁরা বলেন বিপ্লবের শুভফল। বর্ণবিদ্বেষহীন কসমো-পলিটান মনোভাব পারীতে দেখার মত। রাস্তায় ট্রেন যাত্রায়, দুধারের দৃশ্য খুব সুন্দর কোথাও কোথাও ভারতের সঙ্গে মিল আছে; দক্ষিণ-পূর্বে আল্পস পর্বতমালা, উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত, উত্তর-পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল, বিস্কে উপসাগর। আল্পস দেখে হিমালয় মনে পড়বে। সবুজ সমতল, পশুচারণ ভূমি, পাহাড়ের মাঝে মাঝে ভ্যালী, চাষের জমি, আঙুর-ক্ষেত। পাহাড়ের গায়ে থাক থাক পাইন, ফার, আরো অন্যান্য গাছের জঙ্গল। পাহাড়ের চূড়া চিরতুষার ঢাকা শুভ্র কিরীটিনী। এখান থেকে চারটি বড় বড় নদী বেরিয়েছে, স্তেন, লোয়ার, আরোল আর রোন। স্তেন নদী এঁকে বেঁকে পারী নগরকে বেষ্টন করে তার চিরসখি হয়ে আছে। সুন্দর সুন্দর গ্রাম-জনপদ ঘিরে আছে নগরকে।

সুপ্রকাশ সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে ভাবলে, সুনীল যেন স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছে। সে প্রশ্ন করলে, 'ছবি করেছিস কিছু?'

'অনেক ছবি এনেছি দেখাবো।'

সুনীল আবার বলতে শুরু করলে, 'খেটে খাওয়া লোকের সঙ্গে মধ্যবিত্তের কোন প্রভেদ বুঝতে পারবি না, সাম্য সামবায়িক মনোভাব প্রধান সমাজচেতনা, যেন জন্মগত। থাক এখন পরে বলবো, তোর খবর বল।' সুপ্রকাশ একটা সিগারেট বের করে ধরালো, প্যাকেটটা এগিয়ে ধরতে সুনীল মাথা নাড়লো।

সুপ্রকাশ বললে, 'সেকি রে এখনো নাবালক!'

সুনীল হেসে বললে, 'তোর খবর বল।'

'নেটিভ লোকের আবার খবর! একটা কলেজে ছেলে ঠেঙাচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি সঙ্গীহারা পাখীর মত।'

'কেন তোর কবিতা মানসীর নেশা কেটে গেল?'

'না একেবারে ছাড়িনি, তবে মানসীর মন পাচ্ছি কই?'

'একটা জ্যান্ত মানসী খোঁজ, বিয়ে করে ফ্যাল।'

সুপ্রকাশ হেসে বললে, 'ভাল সমাধান, দুষ্টু বলদের বিয়ে দেওয়া।'

'বুঝলুম না তো?'

'শোন তবে। এক চাষী একজোড়া বলদ নিয়ে মাঠে যেতে যেতে একটা বলদ দড়িদড়া ছিঁড়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। চাষী তাকে বাগাতে না পেরে হতাশ হয়ে

বসে পড়লো। এমন সময় এক জোয়ান চাষী তাকে অভয় দেবার আশায় বললে, 'দে শালার বিয়ে দিয়ে দে!'

সুনীল হেসে বললে, 'মানে?'

হাসতে হাসতে সুপ্রকাশ বললে, 'মানে জানতে, পরে অনুসন্ধান করে জানা গেল, সেই জোয়ান-চাষী বিবাহ পূর্বে গ্রামে ত্রাসের কারণ ছিল, ভেবে-চিন্তে গ্রামের মুরুব্বিরা বুঝিয়ে ভুলিয়ে তার বিয়ে দিয়ে দেয়; বছর না পেরোতে সেই বেপরোয়া দুরন্ত ছোকরা চাষী, পোষা ভেড়া হয়ে যায়।' জোরে দু'জনে হেসে উঠলো।

সুপ্রকাশ বললে, 'চাষী-ছোকরার উপদেশ আমাদের দুজনেরই মানা উচিত। হাসতে লাগলো সুনীল প্রাণ খুলে অনেক দিন পরে। সুপ্রকাশ বললে চেঁচিয়ে, 'ওরে বাবা বাড়ী ছেড়ে এলি পেছনে!' গাড়ী থামলো, 'একটু পেছনে হাঁটাও ঘোড়াকে ওই গেটের সামনে।

এক-দু'পা করে সত্যি ঘোড়াটা পেছনে হেঁটে গেটের সামনে দাঁড়ালো। সুনীল কিছুই চিনতে পাচ্ছে না শৈশবে কবে এসেছে! সুপ্রকাশ গাড়োয়ানকে বললে, 'মালগুলো ওই বারান্দায় নামিয়ে এসো বাবা, কিছু বাড়তি দেবো।' সুনীল ভাড়া দিয়ে এক টাকা বেশী দিল। গাড়োয়ান বললে, 'সাব খুচরা নেই।' সুনীলের ফরাসী অভ্যাস যায়নি, বললে, 'তোমায় বকশিস দিলাম নিয়ে যাও।' দু'চারটে সেলাম করে গাড়োয়ান চলে গেল।

বারান্দার লোহার গেটের চাবি খুলে সুপ্রকাশ বললে, 'তুই নীচে দাঁড়া, আমি একটা একটা দোতলায় রেখে আসি।' সুনীল বললে, 'সেকি রে?' সুপ্রকাশ 'দাঁড়া না' বলে একটা মাল নিয়ে উঠলো সিঁড়িতে।

সুনীল চারিদিকে চাইল দুটি ভাড়াটিয়াদের বাচ্চা ছেলে হবে, কিছু বলার আগেই বাকি মাল নিয়ে সুপ্রকাশের পেছনে উঠে গেল। সুপ্রকাশ ফিরে এসে ছেলেদের গালে আদরের চড় মেরে সুনীলকে বললে, 'এইবারে তোকে একটু হাত লাগাতে হবে ভাই!' 'নিশ্চয়।' দু'জনে দুপাশের আংটা ধরে কেবিন ট্রাঙ্কটা আস্তে আস্তে তুললো দোতলার বারান্দায়।

'বন্ধ বাড়ী এত পরিষ্কার কি করে, চাবি পেলি কোথায়?' সুনীল প্রশ্ন করলো।

সুপ্রকাশ উত্তর দিলে, 'শঙ্করবাবুর কাছে, ভাগ্যে চেনা ছিল শচীনকাকুর অসুখের সময় যাতায়াতে, তাই তোমার চিঠি দেখাতে চাবিটা দিলেন দু'দিন আগে, আমি লোক লাগিয়ে সাফা করিয়েছি (ফোঁপানির শব্দে সুপ্রকাশের খেয়াল হলো) সুনীলকে জড়িয়ে বললো, 'চল ঘরের ভেতরে চল।' বসার ঘরের তক্তাপোষে দু'জনে বসলো, সুনীল নীরবে কেঁদে চলেছে; সুপ্রকাশ কিছু না বলে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

সুনীল কান্নার গলায় বললে, 'আমার আর কেউ নেই তুই ছাড়া সুপ্রকাশ!'

এই সময় দরজায় দাঁড়িয়ে একজন লোক বললে, 'বাবু আমার দেরী হয়ে গেল, রাস্তায় ট্রামের তার কাটায় অনেক সময় নষ্ট হলো।' তাকে দেখে নিশ্চিন্ত গলায় সুপ্রকাশ বললে, 'তুই এসে গেছিস দীননাথ, আমি ভাবছিলুম ভেতরে যা চা দে, স্টোভ জ্বালাতে পারবি, না আমি জ্বালবো।'

'জ্বেলে নেবো বাবু!' বলে ভেতরে গেল দীননাথ।

তাকে দেখেই সুনীল সামলে নিয়েছিল রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে। সে অবাক হয়ে সুপ্রকাশের দিকে চেয়ে বললে, 'তুমি একা একা এতসব করেছো ও লোকটা কে?'

'আমাদের পাড়ার পুরোনো চাকর চেনা, উড়িয়ার, এখন প্রায় বাঙালী আমার জানা বাড়ীতে অনেকদিন কাজ করেছে, এখন বসেছিল কাজের কথা বলতে রাজী হয়ে গেল, লোকটা বিশ্বাসী মাহিনা একটু বেশী এই যা, মাসিক কুড়ি টাকা নেবে, রান্না থেকে সব কাজ করবে, দরকার হলে বাসন মাজা ঘর-বাড়ী ধোয়ামোছা করতে একজন ঠিকে ঝি রাখলেই হবে চার-পাঁচ টাকায়।'

'উঃ সুপ্রকাশ, তুই মেয়ে হলি না কেন?'

'তুই পুরুষ হলি কেন? আমি মেয়ে হলে তোর কি দশা হতো সুনীল ভেবেছিস?' হাসলো দু'জনে।

'হয়তো ভেড়া হয়ে যেতুম।' সুনীল বললে হেসে হেসে। দীননাথ চায়ের ট্রে আর হাণ্টলি পামার বিস্কুটের টিন নামালো টিপয়ে। সুনীল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এসব তুই কখন করলি?' সুপ্রকাশ তার দিকে চেয়ে বললে, 'কি এমন শক্ত কর্ম? গতকাল বাড়ী সাফ করতে এসে, বাজারে চা চিনি কণ্ডেন্স-মিল্ক আর বিস্কুট এনে রেখেছি, আর আলমারী খুলে খাবার ঘরে সব বার করেছি কাপ ডিস ইত্যাদি।'

'কাজটা শক্ত নয় ঠিকই, মনে করে করাটাই শক্ত।' সুনীল বললে আন্তরিক আবেগে। সুপ্রকাশ চা তৈরী করায় মন দিল।

ভারী গলায় সুনীল বললে, 'তুই আমায় সত্যি ভালবাসিস, আমি অকৃতজ্ঞ, তোর কথা এমন করে কোনদিন ভাবি না, নিজের নিয়ে ব্যস্ত থাকি!' শেষের দিকে সুনীলের গলা ধরে এলো চোখ ছলছলে হয়ে এলো।

তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে সুপ্রকাশ, 'সুনীল চিরদিন তোর কথায় কথায় ছিঁচ-কাঁদুনে স্বভাব ছাড়, একটু শক্ত স্বাভাবিক না হলে জীবন চলবে? দুনিয়াটা অত দুর্বলতা সহ্য করে না, শক্ত হ, অত সেন্টিমেন্টেল হলে চলবে না ভাই!' সুনীল চা বিস্কুট খেতে লাগলো।

চা খাওয়া শেষ করে সুপ্রকাশ বললে, 'তোকে আমার আত্মকথা কিছু শোনাতে ইচ্ছে করছে, ওহো দাঁড়া, দীনুকে বাজারে পাঠাই কি খাবি ?'

'এখন আমি সব খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ফরাসী, ইংরেজী, চৈনিক, আরবী, বাঙালী যে খাবার দিবি বিনা বাক্যব্যয়ে নিঃশব্দে খেয়ে যাব তোর চিন্তা নেই।'

'বেশ আজ বিশুদ্ধ বাঙালী হোক। আজ আমি থাকবো দিনে রাতে, তোমাকে ছাড়তে পারবো না। মাকে বলে এসেছি, দরকার হলে আরো তিন-চারদিন থাকবো। এখান থেকেই কলেজের চাকরী বজায় রাখবো, যতদিন না তোমার শেকড় গজায় ভাল করে।'

আনন্দে লাফিয়ে জড়িয়ে ধরে সুনীল বললে, 'খুব ভাল, এর চেয়ে ভাল কথা ত্রিভুবনে নেই। তুই আমার আর-জন্মে কি ছিলি সুপ্রকাশ ?'

'কি বললে খুশী হোস ?'

'আমি বলবো না তুই বল।'

'তোর তুলি ছিলুম !' হেসে বললে সুপ্রকাশ।

'না-না, তুই আমার—থাক আর বলবো না লজ্জা করছে !'

তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে সুপ্রকাশ বললে, 'এমন একটা ছিঁচকাঁদুনে নিয়ে ঘর করা যায় না !' দুজনেই হাসতে লাগলো। দীননাথ এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে সুপ্রকাশ বললে, 'দীনু আজ খেতে দেবে তো ?'

'কেন দেবো না বাবু।'

'কি করে হবে ? ভাঁড়ে মা ভবানী।'

'তাতে কি বাবু, এখুনি নিয়ে আসবো।' একটা দশ টাকার নোট হাতে দিয়ে সুপ্রকাশ বললে, 'তোমার যা খুশী, কেবল গরু ঘোড়ার ডালনা বাদ।'

'কি যে বলেন বাবু', হাসতে হাসতে দীননাথ চলে গেল। সুপ্রকাশ বললে, 'তুই বাথরুমে যা, প্রাতঃকৃত্য চান সেরে আয়, আমি কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করি।'

'সব তো বুঝলুম, কিন্তু আমার প্যাণ্ট শার্ট ছাড়া কিছু যে নেই ভাই, কি করি !'

'ফরাসীরা কাপড় খুলে ছেড়েছে। কোন চিন্তা নেই, ওই ঘরের দক্ষিণের আলমারী খোলো সব পেয়ে যাবে। তোমারই ছাড়া জামা কাপড় ইত্যাদি।'

ম্লান মুখে ঢুকে গেল সুনীল। বড় ঘরের মত বাথরুমের আলনায় পরিষ্কার পাট ইস্ত্রি করা টোয়ালে গামছা। বারান্দার কিছু জায়গা নিয়ে বাথরুম বাড়ানো হয়েছে নতুন। একদিকে দিশী প্যান, মাঝখানে বেশিন, আলনা ইত্যাদি, আর একধারে বিলিতী কায়দায় কমোড টিশু পেপার জলের পাইপ কল প্রয়োজনমত। বাথটাব ফোয়ারা কোন কিছুই

বাদ নেই। মাথার ওপর সারা ঘরে জানালা আলো হাওয়া। পাটনার বাড়ীর চেয়েও ভাল, দেয়াল মেজে গ্লেজ টাইল মজাইক করা। অবাক বিস্ময়ে সুনীল চারিদিক দেখতে লাগলো। বারান্দার দিকে একটা ছোট দরজা, তাতে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি জমাদারদের জন্যে। এই রাজসিক কাণ্ড দেখে সুনীল ভাবলো, এসব ছিল, না বাবা এসে করালেন? সব প্রাতঃকৃত্য শেষ করতে সুনীলের বেশ দেরী হলো, ভাবনায় ভরা মন!

দরজায় ধাক্কা দিয়ে ব্যগ্র সুপ্রকাশ ডাকলে, 'সুনীল ও সুনীল, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?' টোয়ালে পরে বেরিয়ে এলো সুনীল। 'আয়।' সুপ্রকাশ শোবার ঘরে গিয়ে আলমারী খুলে দাঁড়ালো।

সুনীল অবাক হয়ে চেয়ে রইলো; সবই তার চেনা, কাচা ইস্ত্রি করা পুরানো নতুন যেন এইমাত্র কেউ গুছিয়ে রেখে গ্যাছে। ধরা গলায় সুনীল বললে, 'এসব কে গোছালো সুপ্রকাশ?'

ঢোক গিলে সুপ্রকাশ বললে, 'শচীনকাকু রোজ ঝাড়াঝুড়ি করতেন, এই দুদিন আমি করেছি।'

টপ্ টপ্ করে পাথরের মেজেতে জল পড়লো, মুক্তোর দানার মত ছড়ালো। সুনীল কোন রকমে পাজামা পাঞ্জাবী পরে সরে গেল সেখান থেকে। সুপ্রকাশের চোখও জলে ভরে এলো, আস্তে আলমারী বন্ধ করে খাবার ঘরে গেল। সেখানে ডিসে অমলেট ডিমের আর জেকবের ক্রীমক্রেকার নিয়ে টেবিলে রাখলো, ডাকলো, 'সুনীল এ ঘরে আয়।' খানিক পরে সুনীল এলো। ম্লান মুখে কোন কিছু না বলে টেবিলে বসলো। কাঁটা ছুরি নিয়ে অমলেট খেতে গিয়ে ডিস ঠকঠক করে উঠলো হাত কাঁপছে!

সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি টুকরো করে কাঁটা বিঁধে বললে, 'খা সুনীল, নয়তো আমারও খাওয়া হবে না, চা জুড়িয়ে যাবে, সাবধানে খেয়ে নে।' দুজনে খানিকটা খাওয়ার পর সুনীল বললে, 'চা দে ভাই, তোর ভাঁড়ারে কফি নেই বুঝি? আমি ওখানের কফি একটু এনেছি বার করে দেবো পরে।'

তাদের খাওয়া শেষ হতে হতে দীননাথ বাজারের থলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সুনীল সুপ্রকাশ ঘরের বেশিনে হাত ধুতে উঠলো। দীননাথ বললে, 'একটা থলি কিনলুম বার আনা দিয়ে বাজারের জন্যে। মাছ মাংসের ছোট একটা আছে, হিসাবটা নেবেন এখন?'

'না বাবা, তোমার ভাষায় টুকে রাখ পরে দেখবো।' সুনীলকে নিয়ে সুপ্রকাশ শোবার ঘরে গেল। 'এটা তোমার শোবার ঘর, খাটে বিছানা পাতা, শুয়ে পড় ইচ্ছা করলে।' সুনীল বিছানায় গড়িয়ে গেল, তার পাশে সুপ্রকাশ। সুনীল বললে, 'তুই যে কি আত্মকথা বলবি বলছিলি?'

'এখন থাক, বিশ্রাম কর আমি তো রইলুম, পরে একসময় বলবো।' সুনীলের গায়ে হাত চাপালো সুপ্রকাশ।

॥ ২ ॥

কলকাতার দ্বিতীয় দিনে, একটু বেলা করেই উঠেছে সুনীল। দীননাথের বারে বারে দাদাবাবু ডাকে তার ঘুম ভেঙেছে। রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে সুপ্রকাশ পুরোন দিনের কথা, তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা, নমঃশূদ্র শিক্ষিকার প্রতি দুর্বলতার কথা, মা ও সামাজিক সমস্যা জড়িত পরিস্থিতি; শৈশবে পিতৃহীন সুপ্রকাশের, সুনীলের অবর্তমানে শচীনকাকুর কাছে পিতৃস্নেহ লাভে ধন্য হওয়ার কথা। শচীনকাকুর অকৃত্রিম ভালবাসা আর নির্ভরতা ফণীবাবুর ওপর, আনন্দময়ীর প্রতি অভিমানভরা ক্ষোভ, সুলেখার প্রতি গভীর অপত্যস্নেহ, সুপ্রকাশের কাছে দিনে দিনে ক্রমপ্রকাশিত হয়েছে। অল্প কথার মানুষ শচীনকাকুর সুনীলের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ প্রকাশ হতে দেখেছে কাজের মধ্য দিয়ে। মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে সুপ্রকাশ নিজেকে সামলাতে পারেনি, সুনীলকে জড়িয়ে দুজনে কেঁদেছে। বিষাদমগ্ন নির্জীবতা নিয়ে কখন দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই।

সুনীল চা খেয়ে বাথরুমে চলে গেল। বাথরুম সেরে এসে দেখে, সুপ্রকাশ বেরোবার জন্যে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা করছে। সে বললে, 'সুনীল, আমার দুটো ক্লাশ আছে প্রথম দিকেই, আমি চললুম, দুটোর আগেই এসে যাব, তুই খেয়ে নিস। আমি চলি।'

সুনীল তাড়াতাড়ি বললে, 'আরে আমার সঙ্গে একবার শঙ্করজেঠুর অফিসে যাবি না? আমার কলকাতার রাস্তাঘাট বেশ সড়গড় নেই কি করবো?'

'কোন ভাবনা নেই, এটর্নী অফিসে তিনটের পর না গেলে কিছু হবে না, আমি সময়মত নিয়ে যাবো, চলি!' প্রায় ছুটে নেমে গেল সে।

সুনীল দীননাথকে ডেকে বললে, 'দীননাথ, আমার জিনিসগুলো শোবার ঘরে এনে দাও বাবা।' সে পাশের ঘরে ঢুকলো; এটাও বড় ঘর, পাটনা থেকে আনা তার আঁকার জিনিসপত্তর এই ঘরেই সাজানো দেখলো। দেওয়াল ভর্তি হুক পেরেকে ব্যাটমে গাঁথা, যেভাবে খুশী সাজানো সম্ভব। একপাশে একটা টুল, টেবিল, ড্রয়ারে চাবি দেওয়া, পাশে ইজেল দাঁড় করানো তিটে। প্যালেট ডিস বাটি টেবিলে। ঘরের কোণে হাত ধোয়ার বেশিন কল ফিট করা, আলনায় টোয়ালে, সাবান, বোতল ভর্তি ক্লিনার দেওয়ালে একটা ছোট আয়না। ঘরের অপর দিকে একটা ইজিচেয়ার একটা ছোট তক্তাপোষ গদি দেওয়া, দেওয়ালে বইয়ের আলমারী কিছু বইও রয়েছে। সুনীলের চোখ ভিজে এলো। কত

আশা নিয়েই না ছিলেন! সে জানালার দিকে চাইল এ দিকটা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

এ ঘর ছেড়ে বাবার শোবার ঘরে ঢুকলো। দেওয়াল ভর্তি মায়ের ছবি, মায়ের আঁকা ছবি। বাবার নিজের একটি অয়েলপেন্টিং। সুনীল চেয়ে রইলো ছবির দিকে বাবার, চেয়ারটায় বসে পড়ে। বিছানা নেই শুধু খাট, সেদিকে চাইলো না সুনীল। ছবির দিকে চেয়ে যেন পাটনায় চলে গেল; সেই ঘর সেই মায়ের আঁকা ছবিভর, ঘর।

'দাদাবাবু খাবেন না?' দীননাথ এসে বললে।

'এক কাপ চা দাও, সুপ্রকাশ এলে খাবো।'

সুনীল বাবার ড্রয়ারগুলো খুললো টেবিলের গায়ে। ডাইরীর পাতা নাড়াচাড়া করতে যেন বাবার হাতের গন্ধ পেলো। দীনু চা দিয়ে যেতে চুমুক দিয়ে মাঝে মাঝে পড়তে লাগলো, যেন বাবার সঙ্গে কথা বলছে। হিসাবের খাতা তুলে নিল, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কোথায় কি জমা কত খরচ সব লিখেছেন। অন্য ড্রয়ারে বেরোল একটা খাতা শঙ্করজেঠুর কাছে কি টাকা আছে, দলিল আছে ইত্যাদি যাবতীয় দলিল কপি উইল। সব সাজানো, কি মেথডিকেল ছিলেন বাবা। তিনি কি বুঝেছিলেন যে চলে যাবেন, সুনীল যাতে কোন অসুবিধায় না পড়ে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা দরকার।

চোখে জলের ধারা বইলো সুনীলের, কাগজপত্তর ড্রয়ারে রেখে হেলান দিলো চেয়ারে চোখ বুজে।

ছুটোর মধ্যে সুপ্রকাশ ফিরেছে, দীননাথকে খাবার দিতে বলে সুনীলের পেছনে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'খাওয়া হয়েছে?' চমকে সুনীল বললে, 'তুই এসে গেছিস, চল খেতে যাই।' হাত ধুয়ে টেবিলে বসলো। টেবিলে তরকারী, ঝোল, ডাল সাজানো, যার যতটা লাগবে বড় চামচে তুলে নেবে। দীননাথ ভাতের ডিস দিল দুজনকে।

সুনীল হেসে বললে, 'সাবেকি রীতি পাল্টে দিয়েছিস দেখছি। কাঁসার বাসন নেই কাঁচের সব!'

'আমি না শচীনকাকু পাল্টেছেন কলকাতায় এসে। বলতেন, ঝি চাকরের ভরসা না করাই ভাল আজকাল, দরকার হলে নিজেরাই ধুয়ে নেওয়া যাবে।'

'রামুদা এখানে ছিল?' সুনীল জিজ্ঞেস করলো।

'ছিল মানে, শেষ পর্যন্ত কি না করেছে? শ্রাদ্ধের পরদিন ফণীবাবুকে বললে, আমায় ছুটি দিন বাবু আমি এখানে আর থাকতে পাচ্ছি না। কথা শেষে কেঁদে ফেললো।'

'আহা।' বলে সুনীল থেমে বললে, 'ও পিতৃহীন হলো আমার চেয়ে বেশী সুপ্রকাশ!' দু'জনে নীরবে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় দীননাথকে রান্নাঘরের দিকে রেখে, ঘরগুলোয় চাবি দিয়ে, সুপ্রকাশ সুনীল বেরোল। 'একটা ট্যাক্সী ধরে নাও সুপ্রকাশ, হাইকোর্ট কিছু বেশী দূর হবে না রেড রোডে গেলে, ট্রামে হাঁটাহাঁটি বেশী সময় লাগবে।' সুপ্রকাশ মুচকি হেসে বললে, 'বেশ তাই চলো সাহেব!' সুনীল একেবারে পাকা পারীর পোষাকে। সকালে নাপিত ডাকিয়ে চুলদাড়ি কাটার ইচ্ছা ছিল ভুলে গেছে। তবু লাল্‌চে হয়ে যাওয়া তার মুখ বিদেশী বিদেশী লাগছে।

কোর্ট হাউস স্ট্রীটে ট্যাক্সী ছেড়ে দিয়ে সুপ্রকাশ সোজা দোতলায় উঠে গেল সুনীলকে নিয়ে। প্রথমে একটা ছোট ঘরে টাইপিস্টকে জিজ্ঞেস করে বড় ঘরে ঢুকলো। মস্ত চৌকো টেবিল, তিনপাশে চেয়ার একপাশে একটি গদিওয়ালা ঘোরানো কেদারায় বসে আছেন সাদা ধবধবে শার্ট কালো টাই বাঁধা ভারিক্কী চেহারার শঙ্কর মুখার্জী। সুপ্রকাশ বললে, 'জেঠুবাবু সুনীল এসেছে এই যে।'

প্রশ্নসূচক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সুনীলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে বললেন, 'বসো, কবে এসেছ?'

'গতকাল কলকাতা পৌঁছেছি!' বিনীতভাবে বললে সুনীল। ইতিপূর্বে কেউ কাউকে দেখেনি।

শঙ্করবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'মথুরবাবু, শচীনবাবুর ফাইলটা নিয়ে আসবেন আর দু'কাপ চা আনতে বলুন বেয়ারাকে।'

'এই যে যাচ্চি স্যার!' উত্তর এলো অন্য ঘর থেকে।

শঙ্করবাবু সুনীলের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার ডিপ্লোমা হয়ে গ্যাছে আগেই, এতদিন কি করছিলে?'

'চাকরী আর শিক্ষা দুটোই করছিলুম।'

'এখানে এখন কি করবে ঠিক করেচো?'

শঙ্করজেঠুর কথা ঠিকমত বুঝতে না পেরে সুনীল বললে, 'কেন? ছবি আঁকবো।'

'সে তো বুঝলুম, কিন্তু সংসার-পাতি চলবে কি করে?'

'একটা পেট কোনমতে চালিয়ে নেবো!' বিরক্ত মনে বললে সুনীল।

শঙ্করবাবু বললেন, 'সেকি, তুমি বিয়ে করোনি প্যারিসে?'

বেশ রাগতভাবে সুনীল বললে, 'পারীতে আমি শিখতে গিয়েছিলুম, বিয়ে করার কথা আসে কি করে?'

তার কথা বলার ঢঙে শঙ্করবাবু চটে গিয়ে বললেন, 'তুমি বিদেশে রয়ে গেলে, শচীনের জমা টাকা উড়িয়ে দিলে মেমসাহেব নিয়ে বেড়িয়ে!'

'এ আপনি কি বলছেন জেঠুবাবু, ভাল করে না জেনে অপবাদ দিচ্ছেন! খরচ অবশ্য আমি বেশী করে ফেলি হিসাব থাকে না, কিন্তু! বাবাকে আমার চরিত্র নিয়ে মিথ্যা অপবাদ শুনতে হয়েছে নাকি?' সুনীল দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

সুপ্রকাশ জোরে বললে, 'এসব কোথায় শুনলেন?'

'এই অফিসেই, আমাদের একজন আইনের লাইনের লোক বলে গেল, সে নাকি দেখেছে সুনীলকে একটা মেমসাহেবের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যেতে, অবশ্য শচীনের মৃত্যুর পর টাকাকড়ি টানাটানির কথায়!'

সুপ্রকাশ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'আমি ফণীজেঠু ছাড়া কলকাতায় সুনীলকে আর কেউ চেনে না, এমনকি আপনাদের পুরোনো বাড়ীর লোকেরা, সে কি করে পারীতে সুনীলকে চিনতে পারলো?'

শঙ্করবাবু থমকে গেলেন, সুনীলকে তিনিও চিনতেন না। একবার সুপ্রকাশ একবার সুনীলের দিকে চেয়ে বললেন, 'তাই তো, এক তরফা হয়ে গেছে। যাক্ বিয়ে যখন করোনি, টাকার টান ধরবে না বাবা, কিছু মনে করো না। তোমার সম্পত্তি বাঁচাতে সবচেয়ে জরুরী পাটনায় ভাড়াটের নামে উচ্ছেদের মামলা করা।'

'ঠিক আছে জেঠুবাবু কালই আমি পাটনা যাবো।' বললে সুনীল ভাঙা গলায়।

বেদনাহত সুনীল ভাবতে লাগলো তার চরিত্রহানির মুখরোচক সংবাদ কতদূর ছড়িয়েছে! ফণীজেঠু, মামণি, সুলেখা এই তিনটে জায়গায় তার লজ্জার কারণ, অন্য কারুর কথা ভাবে না। এঁদের মুখ দেখাবে কি করে?

শঙ্করবাবু শচীন্দ্রনাথের ফাইল খুলে দিলেন পাটনার নিজের দলিলের কপি, চিঠিপত্তর ইত্যাদি। বললেন, 'এগুলোর কপি করে নিয়ে যাও, কাল যাবে বলছো?' সুপ্রকাশ বললে, 'আমি না হয় টাইপ করে নেবো, যদি এখানে না সম্ভব হয়।' অন্য ঘর থেকে টাইপিস্ট চেঁচিয়ে বললে, 'আমি করে দিতে পারবো স্যার!' লাল ফিতে বাঁধা আধ-ভাঁজ করা বাণ্ডিল সুনীলের দিকে বাড়িয়ে বললেন শঙ্করবাবু, 'ওকে দিয়ে যাও কাল নিয়ে যেও তিনটের মধ্যে। আমার সঙ্গে দেখা হবে না, আমি কাল কোর্টে থাকবো কেস আছে।'

সুপ্রকাশ একটা লিস্ট করে নিয়ে কাগজগুলো টাইপ করতে দিয়ে দুজনে শঙ্করবাবুকে নমস্কার করে নীচে গেল। সিঁড়িতে নামার সময় সুপ্রকাশ হেসে বললে, 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া ভেবেছ শিবঠাকুর জানবে না? শঙ্করকে এত কাঁচা পেয়েছো?'

সুনীল বললে, 'চল মাসীমাকে প্রণাম করে আসি অনেকদিন আদর খাইনি, ওর সঙ্গে পুঁটিরামের কচুরী জিলিপী।'.

'বেশ তো চল, মা খুব খুশী হবেন।'

॥ ৩ ॥

পাটনা স্টেশনে ভোরে নামলো। সুপ্রকাশকে একদিন ছুটি নিতে হয়েছে। শনিবার রাত্রে পাঞ্জাব মেলে এসেছে, রবিবার দেখাশোনা, সোমবার কোর্টের কাজ সারবে, রাত্রে কলকাতা ফিরবে। সুনীল প্রথমে বাবার বন্ধু রামকৃষ্ণ মিশনের মহেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে দেখা করে একটা হোটেলে উঠবে ঠিক করে এসেছিল, মিশনের সাধুরা তাদের আটকে দিলেন। সুনীলকে দেখে সবাই খুব খুশী। তাদের থাকার একটি ঘর শোয়া খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সুনীলও নিশ্চিন্ত পরিচিত পরিবেশ।

চার-পাঁচ বছরে কিছু যেন বদলে গ্যাছে পাটনা তথা ভারতের বলা যায়। গান্ধীজীর আন্দোলনে একটা জিনিষ চোখে পড়ছে সুনীলের, সাধারণ মানুষের মনে আত্মসম্মান-বোধ। আমরা দাসানুদাস এই মনোভাব অনেকটা চলে গ্যাছে। বিদেশী বস্ত্র, পোষাক খুব সম্মানীয় নয়, খদ্দরের খাতির বেড়েছে, পাটনায় শিক্ষিত বিহারীদের পাগড়ীর বদলে গান্ধীটুপী সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। নিজের বিদেশী পোষাক সুনীলের কাছে লজ্জাকর মনে হচ্ছে। দুপুরে শুয়ে সুপ্রকাশকে বললে, 'ভাই একসেট্ খদ্দরের পোষাক কিনতে হবে, আমি এই পোষাকে পাটনার রাস্তায় বেরোতে পারবো না।'

সুপ্রকাশ বললে, 'এ আবার কি কথা, দুদিন আছ, চলো কলকাতায় গিয়ে দেখা যাবে।'

'না ভাই এখানেই বেশী দরকার!'

'বেশ ঝোঁক যখন চেপেছে বিকেলে বেরিয়ে খদ্দরের দোকান খোঁজা যাবে, না পাওয়া গেলে সাধুবাবাদের কাছে গেরুয়া কাপড়, চাদর চেয়ে নেওয়া যাবে।' হাসতে লাগলো সুপ্রকাশ তার পিঠে চাপড় মেরে।

সুনীল বললে, 'রামুদাকে তার ছেলেকে খবর দিয়েছি সকালেই, কাল বেলা দশটার মধ্যে কোর্টে পৌছতে হবে, সাহেবী পোষাকে আমি যেতে পারবো না ভাই।'

'বড় ফ্যাসাদে ফেললি, আজ আবার রবিবার।' নীচে সাধুদের গুলতানী শোনা গেল, তড়াক করে বিছানা ছেড়ে সুপ্রকাশ বললে, 'আমি আসছি দেখি সাধুবাবাদের শরণ নিয়ে কিছু সমস্যা মেটানো যায় কি না।' সে চলে গেল নীচে।

সামান্য সময়ের মধ্যেই সে ফিরে এলো, বললে, 'যাক্ বাবা, উঠলো বাই তো কটক

যাই! নিশ্চিন্ত থাকো, পাশেই খদ্দরের আড়ৎ, আজ সন্ধ্যাতে লোক এসে মাপ নিয়ে যাবে সাধুবাবাদের কৃপায় কাল দশটার মধ্যে পোষাকের আশ্বাস পাওয়া গেছে। বিলাত ফেরৎ আধা-সাহেবের খদ্দরপ্রীতি শুনে সকলে খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছে, তারা নয়ন সার্থক করবেন।

'কিন্তু আমি ভাবছি শাসক প্রভুদের নয়ন যদি রক্তবর্ণ ধারণ করে আমার কি হবে? ছাপোষা মানুষ চাকুরী সম্বল, সেটি গেলে উপবাস।'

ঠাট্টার সুরে সুনীল বললে, 'ওঃ উনি ছাপোষা মানুষ, তাও যদি না মায়ের হোটেলে দু'বেলা চলতো। ভেবে দেখ ফণীজেঠুক!'

'ওঁর কথা ছাড়ো, প্রফেসর আমার মত বক্তৃতাবাজ নয়, ওঁকে জেলে আটকালে সরকারের ট্যাক খালি হয়, বিশেষ ক্লাশ কয়েদী মাসিক ঘর-খরচ, মাছ মাংস মাখন বরাদ্দ। আমার বেলায় সশ্রম 'সি' ক্লাশ বরাদ্দ লেপসী, পরণে ডোরাকাটা ফতুয়া ইজের, হাতে কলাইয়ের থালাবাটি কম্বল ঘরখরচ হরিমটর! তফাৎ অনেক ভায়া দু'জনের। মোটকথা, যদি বিপদ দেখি, তোমাকে চিনতে পারবো না, বলবো জানি না কে রাস্তায় আলাপ।'

হো হো করে হেসে উঠলো সুনীল, বললে, 'এতসব ভেতরের খবর জানলি কি করে?'

'জানতে হয় ভায়া', আমায় এখানে বাস করতে হয়েছে, বুলভার নেই, মেমসাহেবও ছিল না আমার কপালে!

হাসতে হাসতে সুনীল বললে, 'ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছে!'

'সুপ্রকাশ হেসে বললে 'পেছনে লেগো না সব ফাঁস করে দেবো। এখন দয়া করে একটু বিশ্রাম করো।'

· · ·

ভাল করে ফরসা হয়নি, রামুদা ঘরের দরজায় এসে বসে। ভোরের আলো ফুটতে সুপ্রকাশ তাকে দেখে, 'রাম রাম জয়রাম!'

রামু হাসলো, বললে, 'দাদাভাই?'

'সকাল হয়নি সাহেবের। তুমি কি রাত্রেই হাঁটা দিলে নাকি?'

'না দাদা, আজকাল তিনটে নাগাদ এমনি ঘুম ভেঙে যায়, তুমি এসেছ দেখে বড় আনন্দ হলো।' রামুর একগাল হাসি। 'তোমার ছেলে?'

'ও তো খেয়েদেয়ে দশটায় কোর্টে আসবে সাইকেলে।'

'কি করছে ?' সুপ্রকাশ সুধালো।

'মুহুরী।'

'পয়সাকড়ি আমদানী ?'

হেসে বললে রামু, 'বাবার নামে তরে গেল, সবাই বলে শচীনবাবুর চেলা।'

সুনীল এসে দাঁড়ালো সামনে। 'রামুদা কেমন আছ ?'

রামু চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে গালে মাথায় হাত বুলিয়ে কেঁদে ফেললো। সুনীলের কম্পিত হাত তার কাঁধে পড়তে, রামু সুনীলের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে বললে, 'দেব্‌তার মত চলে গেলেন বাবা, মায়ের কাছে। মুখে হাসি, কষ্টের কোন নিশানা নেই। তুমি কেমন আছ দাদাভাই ? শুনলাম দেওকী ব্যাপারী গোলমাল করছে। আমি আগেই বাবাকে বলেছিলুম, বেটা বড় শয়তান, একটা উকিলের মতলবে নাচছে। রটিয়েছে তুমি দেশে ফিরবে না, ওখানে বিয়ে করেছ এইসব কথা; তুমি আসবে না, ছ'কড়া-ন'কড়ায় বিক্রি করবে।'

একটু হেসে সুনীল বললে, 'তোমার ছেলে কোথায়, আসবে তো ? ওই আমার মুরুব্বি পাটনা কোর্টে।'

'দশটায় পৌঁছে যাবে, কিছু ভেবো না দাদাভাই। মুখ ধোয়া সারো চা এনেদি।' রামু নেমে বাইরের দিকে গেল, সুনীল সুপ্রকাশ মুখ ধুতে কোঁয়ার পাড়ে। ভাগ্যে গামছা এনেছে, চা খেয়ে, হাওয়া খাওয়ার নামে মাঠের দিকে, ঘটি নিয়ে খাঁটি বিহারী ব'নে যাবে ঠিক করে রেখেছে। দেখতে দেখতে কেট্‌লি আর ভাঁড় হাতে রামু এসে গেল। চা খাওয়া শেষ করার আগেই, খদ্দরের ফিকে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী আর পাজামা নিয়ে এসে গেল খদ্দরের লোক। বললে হিন্দিতে, 'পোরে দেখে নিন ছোট বড় আছে কি না, ঠিক করে দেবো।' পাঞ্জাবী প্রায় চাঁপা ফুলের রঙ, ফরসা সুনীলের গায়ে চমৎকার মানিয়েছে। সামান্য ঠিক করতে হবে। পাজামা ঠিক হয়েছে; পাঞ্জাবী হাতে নিয়ে দোকানদার বললে, 'এক ঘণ্টার মধ্যে আমি ঠিক করে এনে দিচ্ছি।' সে চলে গেল। সুনীল খুশী হয়ে বললে, 'ভাবনা মিটলো।' সুপ্রকাশ একটু হেসে বললে, 'চলো এরপর বড় বাইরে শেষ করে আসি।' রামু বললে, 'আমি সঙ্গে যাবো ?'

'না দাদা তুমি ঘরে থাকো আমরা আসছি।'

ভোজন পর্ব শেষ করে নবরূপে তারা অফিস রুমে গেল মহেশ্বরানন্দজীকে প্রণাম করতে।

সুনীলকে দেখার জন্যে সাধুদের ভিড় জমে গ্যাছে। তাদের মধ্যে একজন ভেতর থেকে পাট করা ফিকে গৈরিক একটা চাদর এনে সুনীলের কাঁধে ফেলে দিয়ে বললে,

'পোষাক সম্পূর্ণ হলো বাবা। যাও কাজে যাও, আমরা তোমার মঙ্গল কামনা করি ঠাকুরের কাছে।

সকলকে হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরোল, সকলে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। রাস্তায় সুপ্রকাশ বললে, 'ঘরের চটি পরে এলি ভুলে ?'

'না রে ভারবি জুতো এ পোষাকে চলে না, চটিই মানায়, চল !'

টাঙ্গা ডেকে সুনীল, সুপ্রকাশ, রামু উঠলো। কাছারি পৌঁছে বার লাইব্রেরীর সামনে বটতলায় তারা নামতেই কানাঘুসা হয়ে অনেক লোক সুনীলদের চারপাশে জমা হয়ে গেল। শচীনবাবুর ব্যাটা এসেছে বিলাত ফেরৎ। দেখার জন্যে লোকের ভিড় কিন্তু চেনা যাচ্ছে না কোন্‌টি—

মুহুরীদের চট বেছানো আসন থেকে ছুটে এলো রামুর ছেলে জানকীনন্দন ; বেশ লম্বা চওড়া হয়ে গ্যাছে, গোঁফ পাকানো চকচকে ফরসা রঙ। খেলার সাথীকে সুনীল চিনতে পারেনি, সে কিন্তু সোজা সুনীলের সামনে এসে একগাল হেসে বললে, 'চাচা রাম রাম !'

সুনীল গলার আওয়াজে বুঝে জড়িয়ে ধরলো তাকে, 'কি চেহারা করেছিস ?

সুপ্রকাশের দিকে হেসে রাম রাম জানালো জানকী, সুনীলের আপাদমস্তক দেখে বললে, 'চাচা এ কি পোষাক, স্বদেশীতে নাম লিখিয়েছ, বিলেত থেকে এসে ?'

তার কাঁধে হাত রেখেই বললে সুনীল, 'তুই কেমন আছিস, বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছিস, রোজগারপাতি কেমন ?'

'দাদুর আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। তুমি মিশনে উঠেছো আমাদের গাঁয়ে যাবে না ?'

'এবারে নয়। শোন, বাবার বন্ধু উকিল, কি যেন নাম তার জানিস ?'

'জানি কি গো আমি তো তাঁরই মুহুরী।'

'বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমাদের ভাড়াটিয়া দেওকীনন্দন একপয়সাও ভাড়া পাঠায়নি, এটর্নী অফিসের চিঠিগুলোর কোন উত্তর দেয়নি। শশুরজেঠু বলেছেন, ওর নামে উচ্ছেদের মামলা করতে হবে। কাগজপত্তর এনেছি, আজ কাজ শেষ করে কলকাতা ফিরতে পারবো ?'

'কেন হবে না চাচা, এ কেসের সব তো জানা উকিলবাবুর। বেটা বড় বদমাস, টাকার গরম, মনে করে যা খুশী করবো। পেছনে একটা উস্‌কানিদার আছে। কলকাতা অফিসে নাকি জেনেছে তুমি বিলাতে সাদি করেছ, আর ফিরবে না। সম্পত্তিটা সস্তায় বাগিয়ে নেওয়া যাবে।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন-একটা সতরঞ্চি এনে বটের ছায়ায় পেতে বললে, 'বঠিয়ে বাবুজী' তারা বসলো।

ইংরাজ বাহাদুর এই একটা শুভকার্য সারা দেশে করেছে কাছারি আইন আদালতে বট অশ্বথ গাছ লাগিয়ে। এই গরম দেশে কাছারিগামীদের রক্ষা করেছে সুনীলের মনে হলো বটছায়ায় বসে। জানকী কাগজ-পত্তর দেখতে লাগলো, একটি লোক ভাঁড়ে চা দিল সকলকে। সুনীল বুঝলে জানকী খুব পপুলার হয়ে উঠেছে, লেখাপড়াতেও ভাল ছিল। সুপ্রকাশ চারিদিক চাইতে চাইতে সিগারেট টানছে। জানকী দলিল-পত্তর সব লিষ্ট করে সুনীলের হাতে দিয়ে বললে, 'তুমি কি যাবে উকিলবাবুর কাছে ?'

'চলো, দেখা করা উচিত !' দুজনে বার-লাইব্রেরীতে ঢুকে গেল। প্রায় আধঘণ্টা বাদে তারা হাসিমুখে ফিরে এসে বসলো বটছায়ায়। ওকালতনামা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সই করিয়ে নিয়ে জানকী বললে, 'চাচা যদি থাকে কাছে, স্ট্যাম্প খরচা দিয়ে যেতে পারো, বাকি ও বেটার কাছে আদায় হলে দিও।'

সুনীল বললে, 'হিসাব করে বলো দিয়ে দিচ্ছি, টাকা এনেছি। আবার চা এসে গেল, লোকের ভিড় কমেনি, শচীনবাবুর বিলাত ফেরৎ ব্যাটা দেখতে তায় খদ্দর পরা। দেওকী-নন্দনের প্রতি নানা বিশেষণ প্রয়োগ করতে ছাড়লো না অনেকেই।

জানকী বললে, 'তোমার এটাচি সমেত কাগজপত্তর আমাকে দাও, উকিল দপ্তরে দেবো না আমার কাছে রাখবো। তুমি কিছু ভেবো না চাচা, কিছু বুঝবেও না। বেটাকে উচ্ছেদ করে ছাড়বো, বড় জোর দেরী হতে পারে। তবে ভাড়ার টাকা হয়তো নোটিশ পেলেই জমা দিয়ে দেবে। তোমার কোন চিন্তা নেই। বাবা তো পুঁটলি বেঁধে এসেছে, দাদাভাইয়ের সঙ্গে যাবে।'

'সে কি রামুদা, আমি বাবার মত মাইনে দেবো কি করে ?'

রামু রেগে বললে, 'তোমার কাছে কে মাইনে নিচ্ছে ? বাবা থাকলে কথা আলাদা !'

জানকী হেসে বললে, 'ওকে নিয়ে যাও চাচা। নয়তো, নিজেও ক্ষেপবে আমাদের বাড়ী সুদ্ধ ক্ষেপাবে !'

সুনীল হেসে বললে, 'ঠিক আছে !'

সুনীল, সুপ্রকাশ জানকীর হাত ধরে, বিদায় নিলো।

॥ ৪ ॥

বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী সুনীল স্টিউডিও এবং স্টাডি শোবার ঘরের পাশে সাজিয়ে নিয়েছে, পাটনা থেকে ফিরে এসে। পারীতে আঁকা ভাল ছবিগুলো সুন্দরভাবে চারিদিকের দেওয়ালে সাজিয়েছে। নৈসর্গিক দৃশ্য, গীতার, মণিকার, ক্রিস্টিনার, নানা

ভঙ্গির নগ্ন ও পোষাক পরা নানা মতের যেসব ছবি সে শিক্ষাকালীন এঁকেছে, তার তারিখ অনুযায়ী ঝুলিয়েছে, নিজের অঙ্কনধারার ক্রমবিকাশের নির্দশন হিসাবে আত্ম-সমালোচনার জন্যে। ঘরের একদিকে একটা টেবিলে তুলি, রঙ পেনসিল, স্কেল, নানা সাইজের ডিসপ্লেট ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় আঁকার সরঞ্জাম, একটা টুল বিশ্রামের জন্যে, তিনটে ইজেলের সামনে। এই দিকটা ঘরের একের-তিনভাগ জুড়ে। সাজাবার সময় সুপ্রকাশ খুব সাহায্য করেছিল তার ছুটির দিনে।

অন্য একভাগে একটা তক্তাপোষ গদি ফরাস তাকিয়া দেওয়া। দেওয়ালের ধারে বইয়ের আলমারী একটা ইজিচেয়ার, ছোট একটা টেবিল দুটো চেয়ার যেগুলো ছিল না, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেটে কেনা।

এ ঘরের তিনটে দরোজা, একটা শোবার ঘর থেকে, সেটাই সব সময়ে খোলা। বাবার ঘরের থেকে একটা দরোজা যেটা এখন বৈঠকখানার মত ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণের বারান্দার দিকের দরোজা। দরোজা সব বন্ধ থাকে কাজের সময় ছাড়া। বিলিতী তালা দেওয়া। সুনীল না থাকলে এ-ঘরে প্রবেশ নিষেধ, রামুদাকে সাবধান করা আছে।

সুনীল আবার নিয়মিত কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। একটা ছবিতে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। সুপ্রকাশ তক্তাপোষে শুয়ে বই নিয়ে। রবিবার পুরো দিনরাত্রি সে এখানেই থাকে, তাছাড়া ছুটির দিন। না এলে সুনীল রাগারাগি করে।

বই পড়তে পড়তে সুপ্রকাশ বললে, 'সুনীল খবর পেলুম সুলেখা ব্রাহ্ম স্কুলে চাকরী পেয়েছে, জেল থেকে বেরিয়েই। এই নিয়ে মা-বেটিতে খুব রাগারাগি; মায়ের মতে কন্যার বিবাহ এতে বাধা পাবে, ফণীবাবুর মতে মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত, বাধা দেওয়ার কি আছে! আচ্ছা সুনীল, তোর মনে কি সুলেখা সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই আর?'

'দোহাই ধর্ম চুপ করো আমায় ভুলতে দাও! ছবিটা শেষ করি।' সুনীল বললে চেঁচিয়ে।

'এমন চিবোবার মত মুখরোচক বস্তু গলাধঃকরণ করবো! হোপলেশ, সারা সপ্তাহ তো মানস-প্রেয়সীদের নিয়ে কাটাও, একটা রবিবার আসবো তাও তোমার রঙবাজী আর হাঁড়িমুখ দেখতে? আমি আসা ছেড়ে দেবো বলে দিচ্ছি!'

সুনীল তুলি ধুতে ধুতে হাঁকলে, 'রামুদা, শিগগি দু'কাপ চা আনো, সুপ্রকাশ রেগে গ্যাছে, (তুলি রেখে, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে) আমি পাত্র হিসাবে হোপফুল ভাই, তোমার মিসেস ব্যানার্জী কি বলেন?'

গম্ভীরভাবে সুপ্রকাশ বললে, 'দেখ সুনীল অতীত তোমার অতলে যাক, বর্তমানে আমাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করো।'

মস্ত একটা হাই তুলে হাতে তুড়ি দিয়ে সুনীল বললে, 'কেন বাঁচাতে যাবো?'

'তুমি না কথা দিয়েছিলে মিসেস ব্যানার্জীকে, একদিন ওঁর বাড়ী যাবে?'

'তা, গেলেই হবে একদিন।'

'একদিন নয় আজ সন্ধ্যায়।' জোর দিয়ে বললে সুপ্রকাশ। ভুরু কুঁচকে চিন্তিত স্বরে সুনীল বললে, 'আমাকে আপ্যায়িত করতে ওঁদের এত গরজ কেন, ছবির সখ আছে?'

'বিবাহযোগ্যা কন্যা বাড়ীতে থাকলে সবারি গরজ থাকে দেখনি, বিশেষ করে তোমার মত অবিভাবকহীন অর্থবান শিক্ষিত পাত্র। এ আর নতুন কি।'

সুনীল হেসে বললে, 'আমার চরিত্র নিয়ে, মডেল নিয়ে যেসব প্রচার আছে তা কি ওঁরা জানেন না?'

'না না, ও নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে বিদেশের কথা!' সুপ্রকাশ বললে।

সুনীল প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা পাটনা পর্যন্ত প্রচার হলো এত গরজ কার হলো কি তার লাভ আমি ভেবে পাই না!'

'ছেড়ে দে! এগুলো একক্লাশ লোকের স্বভাব, পরচর্চায় আনন্দ।'

'দেখো সুপ্রকাশ, তুমি বলদের বিয়ে দেওয়ার মতলব ছাড়ো, আমি বিয়ে করবো না, আর আমার বর্তমান একশো চল্লিশ টাকা আয়ে বিয়ে করা চলেও না; ছবি যে আমার বিক্রি হবে সে আশাও কম তোমার কবিতার মত।'

'আরে আমি বলদের বিয়ের চেষ্টা করছি সোনার হরিণের সঙ্গে, ভাবিস কেন?'

'ওতো আরোই অচল ভুলো না পেছনে রাবণ রাজা আছে।'

'চল তবে আমার মুখ রাখতে একবার যাবি, স্পষ্ট জানিয়ে দিবি বিবাহ করিব না মনস্থ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন মহাশয়া!'

সুনীল বললে, 'বন্ধুবর আপনি বহু পূর্বেই অবগত আছেন আমি কাহারো মুখে মুখে অপ্রিয় ভাষণে অনভ্যস্ত।'

রামুদা চায়ের সঙ্গে এক বার্তা নিয়ে এলো, 'দাদাভাই সেই সাহেব, অমিত না অসিত রায় এসেছেন।'

'এখানে নিয়ে এসো।' সুনীল বললে, সুপ্রকাশ বললে রবিবার জমবে ভাল।

পরনে সাহেবী পোশাক, জার্মান ক্রপকরা চুল, গোঁফ-দাড়ি কামনো শ্যামলা সাহেব মুখে আর্মিনেভী স্টোর্সের লম্বা চুরুট গটগটিয়ে ঘরে ঢুকে বললে, 'হ্যালো আর্টিস্ট এণ্ড

পোয়েট, অমন বুলডগের মত মুখ করে কি ভাবছ ?' সুপ্রকাশের দিকে চেয়ে বললে, 'সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রিয়ার কুঞ্চিত কুন্তলের স্বপ্নে বিভোর নাকি ?'

হেসে বললে সুনীল, 'ভুল হলো সাহেব, কবি এখন বলদ, সোনার হরিণ নিয়ে ব্যস্ত আর আমি আত্মরক্ষায়। বসো বসো চা খাও।'

চেয়ারে বসে অসিত বললে, 'বলদ হরিণ ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না!'

জোরে হেসে বললে, 'অনেক ইতিবিত্ত চা-টা খাও, সুপ্রকাশ শুনিয়ে দেবে নারীঘটিত তোমার ভালই লাগবে!'

'ধ্যুৎ ওতে আর আগ্রহ নেই।'

আড়চোখে সুপ্রকাশের দিকে চেয়ে নিয়ে সুনীল বললে, 'তোমার বন্যা কোথায় ?'

'ও ডিয়ার, যথার্থ শিলংয়ে।'

'কবে ফিরছেন ?'

'আমার জানা নেই।' সুনীল ব্যস্ত হয়ে বললে, 'সেকি বন্যা শুকিয়ে গেল নাকি ?'

'আমার কাছে শুকিয়েছে অন্যের কাছে হয়তো আসছে।' মুখে একটা শব্দ করে হাত ঝাঁকালো অসিত। সুনীল বললে, 'জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করতে তুমি পারদর্শী।'

অসিত বললে, 'তুমি একটি ক্লাসিক্যাল ফুল। মেয়েদের ভুলতে "ভারমৎ" খেতে হয় আর আঁকতে হয়, এমন রক্তমাংসে গড়া ছবি যা বর্তমান যুগে অচল। ফ্যাসিস্ট ইতালিতে জন্মালে তোমায় গুলী করে মারতো।'

সুপ্রকাশ বললে, 'আমি প্রতিবাদ করছি, প্রথমত সুনীল কোন কারণেই মদ্যপান করে না, দ্বিতীয়ত সুনীলের ছবিতে রক্ত-মাস ছাড়া আরো কিছু থাকে যা সকলের বোধগম্য নয়। তৃতীয়তঃ ইটালিতে যখন জন্মায়নি, তখন জন্মালে কি হ'তে পারতো সে নিয়ে গবেষণা নিষ্প্রয়োজন। চা-বিস্কুট খাও যেটা বেশী প্রয়োজন অসিত।'

দুজনের দিকে চেয়ে হেসে বললে অসিত, 'বিনা খরচায় একটু জ্ঞান দিতে গেলুম, আবেগ নষ্ট করে দিলে! আধুনিক অমর বাণীগুলো মনে করি দাঁড়াও। হ্যাঁ শোন— 'We wish to destroy the Museums the libraris to fight Moralism, faminism and all opportunistic and utilitarion meannesses. জানো কোথায় আছে ? ফিউচারিজম-এর ম্যানিফেস্টোতে, মার্লিনেট্রির লেখা শিল্পীজগতের বৈপ্লবিক বাণী। আরো অনেক কথা মনে থাকছে না মেমারী কমে গ্যাছে।'

সুপ্রকাশ বললে, 'ডুবিয়েছে সুনীল সেই দশ-বিশটা হাত-পা না আঁকলে গতিশীল জীবের চিত্রে সত্য ভাষণ হবে না।'

শিল্প বিপ্লব নয় অসিত, রাজনৈতিক মতলববাজী ফ্যাসিস্টদের। ম্যানিফেস্টো শোন।'

সুনীল উঠে গিয়ে আলমারী থেকে একটা ছোট চৌকো চটি বই নিয়ে এলো, বললে 'পড়ো ন'নম্বর প্যারা।'

অসিত তার হাত থেকে বইটা নিয়ে বললে, 'এই তো সেই ম্যানিফেস্টো ইংরাজী অনুবাদ। পড়ছি—We wish to glorify war the only health giver of the world—Militarism, Patriotism, the distructive arm of the Anarchist the beautiful idias that kill the contempt of woman.'

পড়া থামিয়ে দিয়ে সুনীল বললে, 'রাজনীতি, আর শিল্প কেমন ককটেল অসিত? ইটালি আবিশিনিয়া দখল করলো, ইটালির ছোকরারা এই ফিউচারিজমের বুলিতে মাতাল, মুশোলিনির তাঁবেদার হয়ে দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দ্যাখে। একথা আমার নয় ইটালি ফেরৎ অনেক লোকের আশঙ্কার কথা। যা কিছু মূল্যবোধ শিল্পে কলায়, সাহিত্যে তাকে ধ্বংস করো। আর একটু মজার কথা শোন,—'To admire an old Picture is to pour our sensitiveness into a funeral urn, insted of casting it forward in voilent gushes at creation and action.'

অসিত বললে, 'যাক সুনীল আর শোনার দরকার নেই, সময় কাটাতে চালু কথা বলেছি আমি, কিছু না ভেবেই; দুনিয়ায় ইজম-এর ভিড় তোমার ইজম-এ বিতরাগ?'

সুনীল বললে, 'পশ্চিমে এত রকমের ইজম দেখেছি, ইজমে শ্রদ্ধা থাকলেও আস্থা নেই। ওগুলো আমাদের মত অল্পবুদ্ধির লোকদের না ভাবাই ভাল বিশেষ করে তুলির লোকদের, কবিদের।'

অসিত বললে, 'থাক্, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, তোমাদের মিওনো পরিবেশে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করে আমি সুখী, তোমরা দুটি কপোত-কপোতী বড়ই নির্জনতা বিলাসী নৈরাশ্যবাদী, মানে 'সরো-ইজম প্রচার করছো!' জোরে হেসে, উঠে পড়লো অসিত।

'অনেক ধন্যবাদ আমাদের মনে রেখেছ! তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এখুনি বিদায় নেবে আর এককাপ চা—' সুনীল বললে। অসিত পা বাড়িয়ে বললে, 'আর নয়। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, রবিবার ছাড়া তাঁকে মেলে না, 'আমি আসি ভাই।' অসিত বেরিয়ে গেল। সুপ্রকাশ বললে, 'অসিতটা জমায় ভাল যে দিন আসে একটা কিছু ভেঁজে নিয়ে আসে তাক্ লাগাতে।'

আজ মধ্যাহ্ন ভোজের পর শোবার ঘরে ঢুকলেই চারটে পর্যন্ত গড়াবে বিছানায়। রবিবার বিশ্রাম, সুনীলের সঙ্গে কড়ার করা আছে।

গড়াতে গড়াতে সুপ্রকাশ বললে, 'তোর চারটে ছবি বেছে রাখবি, দু'একদিনেই জমা দিতে হবে প্রদর্শনী অফিসে, কানে ঢুকছে?'

'কি হবে দিয়ে ?' সুনীল হেলায় চোখ বুজে বললে।

'কি হবে মানে ? কি জন্যে এঁকেছিস ?'

'নিজের গরজে !' সুনীল বললে।

সুপ্রকাশ বললে: 'বাজে বুদ্ধি, আঁকা, লেখা, লোকের আনন্দের জন্যে।'

'ভাল ছবি কোন পেন্টার বিক্রি করতে চায় না, ঝড়তি পড়তি ছবিই প্রদর্শনীতে বিক্রয় হয়। আমার ভাল ছবি প্রদর্শনীতে দেবো, কেউ কিনতে চাইলে তুই গদগদ হয়ে বিক্রি করে দিবি, আমার ভাল ছবি পরের হাতে চলে যাবে ? ওতে আমি নেই সুপ্রকাশ !'

সুপ্রকাশ একটু চুপ থেকে বললে, 'ঠিক আছে তোর ছবির তলায় নট-ফর-সেল কাগজ এঁটে দেবো। প্রদর্শনীতে রিওয়ার্ড তো পেতে পারিস।'

'রিওয়ার্ড-এর কথা ভেবে পেন্টার ছবি আঁকে না।'

সুপ্রকাশ বললে, 'যাকগে ওসব কথা, ছবির ভাল মন্দ বিচার হবে সুনীল, কলকাতার লোক তোর ছবি প্রথম দেখার সুযোগ পাবে।'

সুনীল প্রশ্ন করলে, 'কতদিন রাখবে ওরা ?'

'ভাবিস না এক মাসের বেশী নয়, স্ট্যাম্প দিয়ে রসিদ দেবে, তাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বে ভয় নেই বাবা ভয় নেই।'

'আজ রাত্রেই বেছে রাখবো, কাল এক সময়ে নিয়ে যাবি।' দুজনে পাশ ফিরে চোখ বুজলো। একটু বাদে সুনীল বললে, 'বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবি তো ?'

'যাবো।' পাশ ফিরে শুলো সুপ্রকাশ। মনে মনে হাসছে মিসেস ব্যানার্জীর বাড়ী সন্ধ্যায় যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গ্যাছে। যাক একটু বিশ্রাম হোক পরে দেখা যাবে। সুপ্রকাশ ঘুমিয়ে পড়লো।

সুনীল খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে উঠে পড়লো। কোন কিছু মাথায় এলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। ছবির কথা ভাবতে ভাবতে দুটো ছবি ঠিক করে নিয়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ছবি দুটো খুলে আঁকার ঘরে টেবিলে রাখলো। দুটো ছবি স্থান কাল পাত্র হিসাবে মানান সই হবে তার মতে। এ ছবির স্কেচ কলকাতায় করা, পারীতে ভালভাবে তৈয়ারী করা শিক্ষা পাওয়ার পর।

সুপ্রকাশ উঠেছে, রামুদা পট ভর্তি চা দিয়ে গ্যাছে। সুপ্রকাশ ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, 'বিশ্রাম না করে বাছাই শুরু করে দিলি, এই করে অসুখে পড়বি, স্বাস্থ্যের আইন মানা উচিত কাজ করতে হলে।'

সুনীল তক্তাপোষের দিকে গিয়ে চা ঢালতে ঢালতে বললে, 'মাথায় প্রদর্শনী চাপিয়ে

বিশ্রাম নেওয়া যায় না, এই নে দুটো ছবি রেডি, পরে আর দুটো পাবি।' ইজলে ছবি দুটো সেঁটে বললে, 'দেখ তো কেমন লাগছে?'

'লাগছে ভাল ত:ব আধুনিক তোদের ছবির ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকার না থাকলে গভীরে প্রবেশ শক্ত, তুই একটু বলে দে!'

সুনীল প্রথম ছবিটা দেখিয়ে বললে, 'সূর্য অস্ত গ্যাছে, এখানে রঙয়ের একটু আধুনিক চেষ্টা হয়েছে, ধূসর গোধূলি, দূরে গ্রামের চিহ্ন, গরুর পাল ইত্যাদি, আদিগন্ত কালচে সবুজ মাঠ ফসল। সামনে আসল ছবি, বড় গাছের ধোঁয়াটে ছায়ার তলায় রাখাল, পায়ের কাছে বাঁশী গড়াচ্ছে রাখাল ক্লান্ত, আগ্রহ ভরা মুখে চোখে প্রত্যাশা, অভিমান উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে।'

সুপ্রকাশ আড়চোখে চেয়ে বললে, 'এ রাখালটি কে হে?'

'যুগ যুগান্তের পরিচিত রাখালকে চিনতে পারলে না, লজ্জার কথা! দ্বিতীয় ছবিটি শোন, প্রথম ছবিটির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই ভারতীয় পটভূমিতে, এতে অঙ্কন কৌশলের চেষ্টা হয়েছে, দ্বিতীয় ছবিতে কিছু নতুনত্বের চেষ্টা হয়েছে। পারী যাওয়ার আগে এই পানিদারের স্কেচ করেছিলুম তিনটের সময় রাস্তা ধোয়ার কাজ দেখে। কর্পোরেশনের এই পানিদার লোকটার শরীর পেশীবহুল, কাঁধ বুক হাত খুব সুন্দর লেগেছিল। তখন আমার এনাটেমির কোন জ্ঞান ছিল না, পারীতে গিয়ে শিক্ষার পর এই ছবিটা যত্ন করে এঁকেছিলুম মনের স্বপ্ন মিশিয়ে।'

সুপ্রকাশ হেসে বললে, 'ঠিক আছে এখন এই দুটো জমা দেবো, তবে তোমার মডেল মার্কা ছবি না দেখলে পারী মার্কা হবে না, লোকের মন ভিজবে না সুনীল।'

'ঠিক আছে বেছে দেবো, চা খাও।'

চা খেতে খেতে সুপ্রকাশ বললে, 'এখন আমায় রক্ষা করো একবার মিসেস ব্যানার্জীর বাড়ী সেরে আসি, আজ গঙ্গা নয় সোজা আদি গঙ্গার ধারে কালীঘাটে আমার মানত সারবে চলো ভাই।'

'তাই চলো, তোমার মানত সারো কিন্তু আমায় হাঁড়িকাঠে ফেলো না।'

'ও ফেলতে হয় না, যার কপালে আছে আপনি মাথা গলিয়ে দেয়। যাও পোষাক পালটে এসো দেরী করো না।'

সাজানো মিসেস ব্যানার্জীর ড্রইংরুম। সারা ঘর সোফা কোচ বেঁটে টেবিল, দেওয়ালে আয়না ব্র্যাকেট, তাতে নানা দর্শনীয় বস্তু বুদ্ধমূর্তি ফুলদানি পুতুল, দেওয়ালের গায়ে

ঝোলানো বড় বড় ছবি রেনেসাঁস যুগের বিলিতী ছাপাই। সুনীল গায়ে খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবী, কাঁধে মৃগাচাদর। সুপ্রকাশ সাদা ধুতি পাঞ্জাবী বঙ্গলক্ষ্মী মিলের প্রায় খদ্দর। এ ঘরে দুজনেই বেমানান। সুপ্রকাশের অবশ্য ঘরোয়া ভাব। কারণ সম্পর্কে মাসীর বাড়ী, কিন্তু সুনীল যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে।

সুনীল সুপ্রকাশকে ঠেলা মেরে বললে, 'দেখ আজকাল ঘরে বুদ্ধমূর্তি রাখা একটা চালু ফ্যাসান হয়েছে।'

'তাতে তোমার কি ক্ষতি বাপু ?'

'আমার ভয় হচ্ছে, ওটা তো ফ্যাসান হয়ে উঠছে। শেষে নির্বাণ প্রাপ্তি না সার্বজনীন হয়ে পড়ে।'

'তা হবে না ভয় নেই। এখন তুমি একটু চুপ করে বসো।'

'কিছু মনে করবেন না সুনীলবাবু, সুপ্রকাশ কোন টাইম দেয়নি, আমি বাজারে দেরী করে ফেলেছি।' ঘরে প্রবেশ করে বললেন ভদ্রমহিলা। দেখে বোঝা যায় বিধবা তবে সাদা পোষাকেও বেশ পরিপাটি। দুজনে উঠে দাঁড়ালো, সুনীল হাতজোড় করে নমস্কার করলো। তিনি বললেন, 'বসো বাবা, সুনীলকুমার যে আসবে আমি আশাই করিনি, বড় আনন্দ হল।'

সহজ ঘরোয়া কথা বলার ভঙ্গি দেখে সুনীলের ভাল লাগলো। সে বললে, 'সুপ্রকাশকে বলেছিলুম বটে, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি, মাপ করবেন।'

সুপ্রকাশ বললে, 'শিল্পী লোক, খেয়াল থাকে না।'

'কবে ফিরেছো প্যারিস থেকে ?' সুনীলের দিকে চেয়ে বললেন।

সুপ্রকাশ উত্তর দিল, 'পুরো একমাসও হয়নি।'

'এরি মধ্যে স্যুট ছেড়ে খদ্দর ধরেছো ? তোমরা একটু বসো আমি ভেতর থেকে আসছি।'

একটু পরে কন্যাকে নিয়ে মিসেস ব্যানার্জী এসে পরিচয় করালেন, 'আমার মেয়ে রেবা, বি-এ পড়ছে। রেবা, ইনি সুনীল মুখার্জী, প্যারিস ফেরৎ আর্টিস্ট।' সুপ্রকাশ রাগের ভান করে বললে, 'কই আমার সঙ্গে চেনা পরিচয় হলো না ?' মাতা ও কন্যা দুজনেই তার দিকে চেয়ে হাসলো। 'তোমরা গল্প করো।' বলে মিসেস ব্যানার্জী চলে গেলেন। সুপ্রকাশ রেবার দিকে চেয়ে বললে, 'কি মহাশয়া, প্যারীর পুরস্কার পাওয়া শিল্পীকে আনলুম কিনা ? বড় যে ঠাট্টা করতে ! এখন প্রাণ ভরে দেখে নাও।'

রেবা কৃত্রিম ক্রোধে বললে, 'তুমি অত্যন্ত অসভ্য সুপ্রকাশদা।'

'দেখছিস খদ্দর পরে কেমন কার্তিক ঠাকুরটি, স্যুট পরলে কি হবে ভেবে নে !'

সুনীল রেগে কটমটিয়ে চাইলো সুপ্রকাশের দিকে, সেই সঙ্গে চুরি করে দেখে নিলে মাথা নীচু করা রেবাকে, মনে মনে ভাবলে মেয়েটি রূপে, স্বভাবে ভালই মনে হচ্ছে।

ভিতর থেকে একজন বেয়ারা, ঘরে ভাজা নিমকী আর ওমলেট এনে সামনে দিল। রেবা বললে, 'আপনারা খান আমি চা করে আনি, চা না কফি কি খাবেন?'

সুনীল বললে, 'কফি।' তার স্বচ্ছ টানা চোখের দিকে নজর করল।

সহজ গলায় রেবা তার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি কফি নিজে করে নেবেন?'

'আমি করতে জানি না মিস্ ব্যানার্জী।' লজ্জিতভাবে সুনীল বললে।

একটু হেসে সোজা সুনীলের দিকে চেয়ে বললে রেবা, 'ঠিক আছে, ক'চামচ চিনি দেবো সুনীলবাবু?'

সুপ্রকাশ হেসে বললে, 'ওকে কেন জিজ্ঞেস করছো রেবা, তুমি আন্দাজে দাও।'

সুনীল রেবার মুখ, চোখ, অবয়ব লক্ষ্য করে ভাবছে, আঁকা যায়। খুশী মনে খাওয়া শেষ করে কফি খেল। প্যারী থেকে আসার পর এত ভাল স্বাদ সে পায়নি। সে বললে, 'কফির জন্যে অনেক ধন্যবাদ মিস ব্যানার্জী।'

রেবা তার দিকে চেয়ে হাসলো পরে সুপ্রকাশকে বললে, 'প্রকাশদা, তোমার লেখা অনেকদিন দেখিনি।'

'আমি কি লেখক, যখন মর্জি লিখি।'

সুনীলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে রেবা, 'আপনার ছবি কোন কাগজে দেবেন?'

সুপ্রকাশ বললে, 'আগামী সপ্তাহে প্রদর্শনীতে দেখতে পাবে। মাসীমাকে বলে দিও, আমরা আজ আসি, অনেক রাত হয়ে গেল রেবা!'

রেবা তাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, 'আবার এসো কিন্তু।'

॥ ৫ ॥

সুনীল স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছে। সারা সকাল সারা দুপুর ছবিটা নিয়ে খাটছে: রেনেসাঁসের ছাপ, অঙ্কনকৌশলে প্রকাশ পেয়েছে, বক্তব্য পরিষ্কার, কিছু বলতে চায় গল্পছলে। এরকম ছবি অনেক দিন আঁকেনি সে। এ ছবিতে আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা একটা মুখে আর একটা মুখে অবজ্ঞা প্রত্যাখ্যান। কোন অঙ্কনকৌশল দেখানো নয়, দর্শকের মনে সোজা চলে যাওয়া। ছবিটা করতে হবে মনোহারী। বিচারের দিকে নয়, বিজ্ঞপ্তি হৃদয়ের দিকে।

'কি রে যাবি না একজিবিশনে, এখনও ছবি নিয়ে?' বলে ঘরে এলো সুপ্রকাশ।

সুনীলের পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ আটকে গেল। হাতে সরু তুলি নিয়ে মুখের ওপর চলছে কেরামতি।

সুনীল বললে, 'চুপ করে দাঁড়া।' কিছু পরে সরে দাঁড়িয়ে তুলি রেখে বললে, 'এই ছাখ। ছবি এলো কি না জানি না।' মমতাভরা চোখে চেয়ে রইল দূরে দাঁড়িয়ে সুনীল।

সুপ্রকাশ দেখলো, সুন্দরী তরুণী হাতের মুদ্রায় পরিবর্জন, মুখের ভাবে, অবজ্ঞা প্রত্যাখ্যান চলে যাবে ভঙ্গিতে পদক্ষেপ; অপর দিকে এক সুন্দর যুবক, দু'হাতের মুঠোয় একটা লাল পদ্ম, আবেদনের ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে দু'হাত বাড়িয়ে, চোখে মুখে প্রার্থনা। আর চারিদিক কাজল ধূসর আবছা প্রকৃতি, নীল সবুজের আভাসবিহীন বেদনামলিন।

সুপ্রকাশ ম্লান স্বরে বললে, 'এ ছবি কেন আঁকলি, তোকে তো কেউ বর্জন করে না গ্রহণের জন্যে লালায়িত।'

'সেই কারণেই বন্ধু, বড় একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছে জীবন।'

সুপ্রকাশ হেসে বললে, 'পাগল আর কাকে বলে! শোন তোকে একটা ভাল খবর দি, গতকাল রেবার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গ্যাছে, ছেলে ভাল সরকারী চাকুরী করে, ওপরতলার লোক, প্রথমে রেবার অমত ছিল, মত হয়েছে, আগামী মাসের দশ তারিখে বিয়ের দিন স্থির। এটা তোকে প্রায় বর্জনেরই সামিল। আমার প্রশ্নে রেবা উত্তর দিল, ওঁকে আমার খুবই ভাল লেগেছে? শিল্পী হিসাবে ওঁর ছবি দেখে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ঘরসংসার করা এঁদের সঙ্গে খুব শক্ত; আমি বইয়ে পড়েছি বন্ধুদের কাছে শুনেছি, স্রষ্টাগোষ্ঠী প্রায়ই খামখেয়ালী হয়ে থাকেন।'

সুনীল খুব জোরে হেসে উঠলো। বললে, 'চমৎকার সুপ্রকাশ, রেবা সত্যি বুদ্ধিমতী, ঠিকই বলেছে। আমি একটা জীবন্ত উদাহরণ জেনেছি পারীতে।'

সুপ্রকাশ চিন্তিত ভাবে বললে, 'তুই যা বাথরুম সেরে আয়, দেরী হয়ে যাবে বেরোতে।' সুনীল হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

সুপ্রকাশ একটা বই নিয়ে চেয়ারে বসলো। তার মনটা ছটফট করে উঠলো। আবাল্য বন্ধু এই অসহায় জীবনের প্রতি তার প্রগাঢ় মমত্ববোধ। যার আত্মরক্ষার ইচ্ছা নেই, সে কি করবে জীবন সংগ্রামে? ইদানীং সে বেশ চিন্তিত সুনীলের জন্যে, দিনকে দিন সুনীল নির্লিপ্ত, নির্বিকার, ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে। রেবাকে নিয়ে সুপ্রকাশের আশা ছিল, সুনীলের মনটাকে যদি বাগাতে পারে, সে আশাও গেল। যার জন্যে এত ভাবনা সে কিন্তু অবিচল মনে হলো! মডেল নিয়ে কেচ্ছা রটনা কে করলো? এ সম্বন্ধে সুনীল

তো তাকে সব কথাই বলেছে, কিছু গোপন করেনি। এর জন্যে লজ্জায় সে তার প্রিয়জনদের কাছে যেতেও লজ্জা পাচ্ছে। বাবার মৃত্যুতে যে আঘাত পেয়েছে, এই আঘাতও তার চেয়ে কিছু কম নয়। খাওয়ায় পরায় এমনকি দাড়ি কামানোতেও বিতৃষ্ণা এককথায় জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা গাঢ় হয়ে উঠছে। কি করে, কি ভাবে সুনীলকে স্বাভাবিক করে তুলবে, সুপ্রকাশের এই চিন্তা আজকাল।

রামুদা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। গায়ে টোয়ালে ঢাকা দিয়ে সুনীল চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে ক্লান্তভাবে বসলো। 'সারা দিন ছবি আঁকলি, একজিবিশনে যাবি কি করে?' সুপ্রকাশ বললে।

'কেন, ওখানে কোদাল চালাতে হবে না কি? হেসে বললে সুনীল।

'তোর সবেতে বাড়াবাড়ি—এরোটিক, এবনর্মাল, ফুল।' সুপ্রকাশ রেগে বললে।

'অকারণে এত গালাগালি দিলি ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, নিয়মিত যা করি মানে, আমার স্বধর্ম পালন করেছি মাত্র।' সুনীল চা ঢেলে এককাপ তাকে দিলে, সুপ্রকাশ বললে 'বেশ করেছ, আমার মস্তক খরিদ করিয়াছ এখন চা খেয়ে চলো গড়ের মাঠে মানে, ময়দানে।

চা বিস্কুট খেতে খেতে সুনীল বললে, 'মাঠ ময়দান কি বললি?'

'ছবির লড়াইয়ের ময়দান, একজিবিশন? সুপ্রকাশ হেসে বললে।

'এটা কি কথা, লড়াই-ফড়াই কেন? আমি তো হার মানতে সদাই প্রস্তুত সুপ্রকাশ!'

'আচ্ছা বাবা তাই হবে, যা চাইবে তাই হবে'খন।'

রাস্তায় বেরিয়ে সুনীল হেঁটে যাবে স্থির করে। কিন্তু সুপ্রকাশ আপত্তি জানায়, সুনীলের জন্যেই একটা ফিটন ধরে নেয়। একজিবিশন গেটে, মিউজিয়মের সামনে নেমে পড়ে। বার আনা ভাড়া দিয়ে ভেতরের দিকে এগোয়, তখন বেশ ভীড় হয়ে গ্যাছে। সুনীল সুপ্রকাশ অফিসঘর থেকে জানলো তাদের ছবি প্রথম সারির সামনে। সুপ্রকাশ বললে, 'ভাল জায়গায় দিয়েছে।' ছবির সামনে দাঁড়ালো দুজনে।

একজন দর্শক 'পানিদার' দেখে সঙ্গীকে বললে, 'সুন্দর জীবন্তচিত্র, দেখ তো কার আঁকা?' সঙ্গী কাছে গিয়ে বললে, 'নামটা বুঝতে পাচ্ছি না স্যার। কি যেন সোনীল বাঙালী নয়।' সুনীল সুপ্রকাশের দিকে চেয়ে হাসলো। দুজনে সরে গেল। খুব ভীড়, সুনীল সুপ্রকাশকে টেনে নিয়ে বাইরে গাড়ীবারান্দার নীচে একটা বেঞ্চিতে বসলো। সুপ্রকাশ সিগারেট ধরালো।

ভেতরে যাওয়ার সিঁড়ির গোড়ায় একটা সেভ্রলে মোটর এসে দাঁড়ালো। সুনীলের নজরে এলো একজন সুটপরা ভদ্রলোক, সুলেখা আর একটি ছেলে চেনা যাচ্ছে না তবে

মনে হচ্ছে মণ্টু। কি যেন কথাবার্তা বলে ভদ্রলোক ফিরে গাড়ীতে এসে ব্যাক করে বড় রাস্তায় চলে গ্যালেন। সুলেখা ও ছেলেটি ভেতরে ঢুকলো। একটু পরেই ছেলেটি একা বেরিয়ে এলো, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ ঘাড় মুছলো যেন হাওয়ার জন্যে রাস্তায় নেমে পায়চারি শুরু করলো। সুনীল সুপ্রকাশকে বললে, 'আমি ওই ছোকরার সঙ্গে কথা বলে আসি পরে এসে বলবো।' সুনীল এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তোমার নাম কি ভাই?'

'অজিত বোস।' ছেলেটি নাম বলে, বিস্মিত মুখে সুনীলের দিকে চাইলো।

'তোমার ডাকনাম কি মণ্টু?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?' তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সুনীল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'মণ্টু মণ্টু আমায় চিনতে পারছো না মণ্টু?'

তার দিকে ভাল করে চেয়ে মণ্টু বললে, 'সুনেদা না?'

'হ্যা রে আমি।'

'কি করে বুঝবো, দাড়ি-গোঁফ কি চেহারা করেচ সুনেদা? তোমার ছবি খুঁজচে দিদি, ভেতরে যা ভীড়, তোমার খবর পাই না, কবে ফিরেচ দেশে? আজ কাগজে তোমার ছবির বিশেষ প্রশংসিত চিত্র হিসেবে আলোচনা পড়ে দেখতে এলো দিদি জোর করে।'

'ওই যে ভদ্রলোক তোমাদের পৌছে দিয়ে গেলেন, উনি কে?'

'আমার ভাবী জামাইবাবু, মা দিদির সঙ্গে ওঁর বিবাহ মনে স্থির করে রেখেচেন। তুমি কোথায় আচ সুনেদা? মা তোমার জন্যে বড় ছটফট করেন মাঝে মাঝে।'

মণ্টুকে জড়িয়ে আদর করে সুনীল বললে, 'পরে বলবো, আমি এখন আসি মণ্টু জরুরী কাজ আছে।' মণ্টুকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সুনীল ছুটে বেরিয়ে গেল, সুপ্রকাশকে ইশারা করে গেট দিয়ে। একটা কালীঘাটগামী বাসে উঠে পড়লো দুজনে। সুপ্রকাশ হতভম্ব বেকুফের মত বাসে বসে বললে, 'কি হলো সুনীল, কি হলো?' হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলে হাঁপাতে লাগলো সুনীল, সুপ্রকাশ তার কাঁধে হাত রাখলো।

একজিবিশন হলে সুলেখা চারিদিক ঘুরে সুনীলের ছবি দেখতে না পেয়ে অফিসে খবর নিয়ে এসে দাঁড়ালো প্রথম ও দ্বিতীয় ছবির সামনে; নাম পড়লো সো-নীল। আবার অফিসে খবর নিয়ে জানতে পারলো সুনীল মুখার্জীর ছবি প্রথম ও দ্বিতীয়টি এবং not for sale লেখা।

সুলেখা ভীড়ের মধ্যেও অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখছে, মণ্টু গম্ভীরভাবে এসে বললে, 'দিদি, দিদি, শিল্পী মহাশয় স্বয়ং হাজির হয়েছিলেন।'

'যা মিচে কথা বলিসনি।'

'না দিদি সত্যি কথা!'

আনন্দে উত্তেজনায় সুলেখার মুখ ঝলসে উঠলো, সে মণ্টুর হাত ধরে বললে, 'কোথায় লুকিয়ে বল শিগগির!'

মণ্টু ম্লান মুখে বললে, 'আমায় বললে, তোমার ডাক নাম মণ্টু? আমি 'হ্যাঁ' বলতে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, মণ্টু মণ্টু তুমি আমায় চিনতে পারছো না? কি করে চিনবো বল, দাড়ি-গোঁফ, ময়লা খদ্দরের জামা পায়জামা তাও পকেটটা ছেঁড়া, রোগা হয়ে গেছে; দেখলে তুইও চিনতে পারবি কি না সন্দেহ! সেই সুনেদা আর প্যারিস ফেরৎ আর এক সুনেদা! কিন্তু মার কথা, তোমার কথা, অমরদার কথা শুনলো, তারপর ছুটে বাসে উঠে গ্যাল আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে, বললে, 'আসি মণ্টু পরে জানাবো আজ আসি, জরুরী একটা কাজ আছে ভাই।' কথাশেষে দিদির দিকে নজর পড়তে মণ্টু ভয় পেয়ে বললে, 'তুমি কাঁপচো কেন, পড়ে যাবে বেঞ্চিতে বসে যাও।'

বসে সুলেখা ধরা গলায় বললে, 'ভীড়ে শরীরটা আমার খুব খারাপ লাগচে মণ্টু, একটা ট্যাক্সী ধর বাড়ী যাবো।' মণ্টু গেটের কাছেই ট্যাক্সী পেয়ে গেল সর্দারজীর। গাড়ীতে উঠে সুলেখা সিটে এলিয়ে চোখ বুজলো, মণ্টু বললে, 'হেদুয়া সর্দারজী।' সুলেখা বাড়ীর গেটে নেমে ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট মণ্টুর হাতে দিয়ে, বাড়ীর মধ্যে চলে গেল একেবারে নিজের ঘরে। মণ্টু ভাড়া মিটিয়ে সোজা বাড়ীতে মায়ের কাছে গেল সুনেদার খবর দিতে।

আনন্দময়ী তাকে দেখে বললেন, 'আর সব কোথায়?'

'দিদির ভীড়ে খুব শরীর খারাপ লাগছে ঘরে গ্যাছে, অমরদা ফিরপোতে। দিদির শরীর খারাপ লাগায় আমরা ট্যাক্সীতে এসেচি। জানো মা, সুনেদার সঙ্গে দেখা হলো।'

'সেকি তাকে ধরে আনলি না, কোথায় আচে, কবে এসেচে? কি কাণ্ড বাবা!' এই সময় ফণীবাবু বাড়ী ঢুকলেন, তাঁকে দেখে আনন্দময়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওগো আজ মণ্টু সুনীলকে দেখেচে! তুমি জানো না, ও ফিরেচে?'

'আমি জানি সুনীল ফিরেচে, এটর্নী অফিসে শুকর বললে পাটনা গ্যাচে মামলা করতে, বললে জমা টাকা সব উড়িয়ে এসেচে, এখন একতলার ভাড়া একশো চল্লিশ টাকা সম্বল, তুমি কষ্ট পাবে তাই বলিনি, আমার মনে হয় সেও লজ্জায় এখানে দেখা করেনি!'

রাত্রের খাবার সময় সকলে আজকাল একসঙ্গে খাওয়ার রীতি চালু হয়েছে, এখন

পুরানো বামুনঠাকুর আবার বহাল হয়েছে নয়তো আনন্দময়ীর ওপর বড় চাপ পড়ছিল। ঠাকুর থালা থালা ভাত দেওয়ার সময় আনন্দময়ী বললেন 'আমাকে দিও না খেতে ইচ্ছে নেই, শুধু দুধ খাবো কামিনী।'

মণ্টু বললে, 'কেন খাবে না মা ?

ফণীবাবু নিবিড়ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'বড় বেটা প্রবলেম !'

'আনন্দময়ী রাগতভাবে বললেন, 'তোমার সব সময় ইয়ারকি ! তুমি কি গো ? ছেলেটা একশো চল্লিশ টাকায় দিন কাটাচ্চে জেনে একদিনও খবর নিতে মন চায়নি, মায়াদয়া শুধু দেশের লোকের ওপর, নিজের ছেলের পাতে ভাত না জুটুক, অবাক তোমাদের দেশপ্রেম।'

সুলেখা গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছে চোখ লাল জবাফুলের মত। মায়ের কথায় হাসি পেলো ভেবে, যার চিঠি দেখে, ছবি দেখে রাগ কটুকথা, তার মনের বাসনার কথা জেনেও, তারই দরদে এতো ? যে মামণির মনে ব্যথা লাগার ভয়ে নিজেকে সরিয়ে রেখেচে, পালিয়ে বেড়াচ্চে তার খবর পাবার এতো আগ্রহ ? সে এ বাড়ীতে পা দিলেই সুলেখা কন্যার ভবিষ্যত জল হয়ে যাবে, সে ভয় ভুলে গ্যালেন দয়াময়ী।

ফণীবাবু স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'দেখ আনন্দ, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো স্বভাব তোমার গেল না ! আমায় ভাবতে হবে, জানতে হবে, কেন এই অঘটনটা ঘটলো। সুনীল-মাস্টারকে আমি যা বুঝেচি, সে বড় অভিমানী, সেণ্টিমেণ্ট, আত্মসম্মান-বোধ তার প্রবল। শচীন বলতো, সবাই ওকে বুঝতে পারে না, চাপা স্বভাব। মন এত নরম যে, শত্রু-মিত্র বিচারহীন। আমাদের প্রতি এত কঠোর ব্যবহার, অবজ্ঞা হঠাৎ কেন ? এটা ভাল করে বুঝে নিয়ে তবেই ওকে সাহায্য করতে যাওয়া উচিত, নয় তো বিপরীত ফল হবে। শঙ্কর বললে, তার নামে প্রচলিত গুরুতর অপবাদ শুনেও তার মুখ থেকে কোন প্রতিবাদ বা সাফাই বাক্য বেরোয়নি। তার বন্ধু সুপ্রকাশ অবশ্য চ্যালেঞ্জ করেছিল এই বলে যে, আমি আর ফণীবাবুর পরিবার ছাড়া কলকাতায় আর কেউ সুনীলকে চেনে না। এ ক্ষেত্রে আপনাদের আইনপাড়ার লোক ফ্রান্সে বা পারী সহরে তাকে চিনে ফেললো মডেলের সঙ্গে ঘুরতে, কি করে ? শঙ্কর মনে করে কোথাও গোলমাল আছে, বিচার তার একতরফা হয়ে গেছে। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ সুনীলের খরচ করার অভ্যাস হতেই পারে। তুমি ভেবো না আনন্দ, সুনীল আত্মসংযমী আমার শচীনের মতই বিশ্বাস আছে। আর এটাও জেনো হাইকোর্টপাড়ার গালগল্প একটা সময় কাটানোর মুখরোচক অভ্যাস, আইনের দুনিয়ার ঢিলেঢালা পদ্ধতির অনুষঙ্গ।' সবাই যেন নিশ্চিন্ত হলো, খাওয়া শেষে উঠে পড়লো।

সুনীল একটা বড় ক্যানভাস জুড়ে আইন-অমান্য আন্দোলনের পটভূমিতে ছবি আঁকা শুরু করেছে। পারীতে রীতার প্রশ্নে, তুমি কি দেশের স্বাধীনতা চাও না সোনীল, তাকে সে সময় নাড়া দিয়েছিল। দেশে ফিরে সাপ্তাহিক মাসিক খুঁজে, সেই সময়ের আঁকা চিত্র দেখে সে একটা ছবি মনে খাড়া করেছে; সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সঙ্গে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের অহিংস সংগ্রাম। একটি স্মারকচিত্র। কম্পোজিশন ঠিক হয়ে গ্যাছে, মোটা ব্রাশ, তুলি লাল কালো সবুজ খাঁকি গৈরিক রঙে ছবি হবে বড়; সার্বজনীন একভাবোধ স্পষ্ট, তিরিশের আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছ'দিন ধরে এঁকে যাচ্ছে, আজ চলছে মুখের মিশ্রিত অভিব্যক্তি, হিংসা, অনুশোচনা, সমবেদনা, মুখে দৃঢ়তা, ব্যথা; চোখে ক্ষমা অহিংসা। পুলিশ ও সত্যাগ্রহীর নানা মুখে এই মিশ্রভাব ফোটাতে ভালই লাগছে সুনীলের, প্রতিটি মুখ বেশ আদরের হয়ে উঠছে, এরা যেন আত্মীয় আপনজন। শিল্পীরা এ সময়ে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, আত্মমগ্ন।

সুপ্রকাশ পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলো। একদৃষ্টে ছবির দিকে চেয়ে রইলো, বগলে সংবাদপত্র, মুখ হাসি হাসি।

সুনীলের খেয়াল হতে ফিরে বললে, 'তুই এসেছিস, তোকে চাইছিলুম। কেমন লাগছে ছবিটা?'

'ভালই তো লাগছে। মেয়ে-পুরুষের ভিড়, মুখের বিভিন্ন ভাব, ঠিকই হয়েছে সে সময়ের ইতিহাস ছবিতে। এ ছবি আঁকার ইচ্ছা জাগলো কেন ভায়া?'

'পারীতে রীতার ঠাট্টার প্রশ্ন, আমি দেশের স্বাধীনতা চাই কি না?'

'উহুঁ আরো কিছু গূঢ় কারণ আছে!' হেসে বললে সুপ্রকাশ।

'কি সেই গোপন কথা?' সুনীল প্রশ্ন করলে।

'এখন থাক পরে প্রকাশ্য, এখন তোর নতুন দুটো ছবির সংবাদপত্রের মতামত বগলে এনেছি পড়ে দেখ।'

'এখন তুই বল না, একটু পরে সময়মত দেখে নেবো।'

'তোমার দ্বিতীয় কিস্তির দেওয়া, মণিকা রীতাকে নিয়ে দু' কায়দায় আঁকা। কেউ বলছেন অশ্লীল, কেউ বলছেন ফরাসী আমদানী, কেউ বলছেন অপূর্ব, কেউ বলছেন অভূতপূর্ব। কিন্তু সুনীল একজিবিশন এমন জমে উঠেছে, যেন রথের মেলা। আর কত ভীড় তোমার নগ্নিকা যুগলী সন্দর্শনে, একজন মদনমোহিনী, একজন মদনজারিণী।'

হো হো করে হেসে উঠলো সুনীল। এমন হাসলো যে রামু ছুটে এলো। তাকে দেখে সুপ্রকাশ বললে, 'দাও রামুদা চা দাও, নয়তো দাদাভাই (নিজ ঘরে) ক্ষেপে যাবে।'

সুনীল সুপ্রকাশকে হাসতে হাসতে থাবড়া মেরে বললে, 'বেশ নাম দিয়েছিস, মদন-মোহিনী, স্বপ্নচারিণী'। 'কবি না হলে এত রস কে পাবে?'

'তুই যে ঝঞ্ঝাট করেছিস বিক্রয় নাই বলে, নয়তো এই মওকায় রোজগার হয়ে যেত; আর যদি রাজামহারাজাদের নজরে ধরে যেত তো আখির বন গিয়া। কি করবো তুই একটা গর্দভ, ইডিয়ট, স্টুপিড়া।'

'দেখ্ সুপ্রকাশ, তুই সব সময়ে তিনটে করে গাল দিবি না; একটা দে, দুটো দে, চারটে দে আপত্তি নেই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, এর পর গুনে গুনে দেবো। শোন ছবি দুটো বিক্রি করবি?'

'উঁহু কদাচ নয়। ও দুটো উৎসর্গ করে রেখেছি আমার প্রেয়সীকে।'

'তোর প্রেয়সী? পাওয়ার যার অনাস্থা, প্রেয়সী তার কপালে নেই খোঁজাই সার! যদিও বা জোটে, তুমি চলন্ত বাসে পালাবে!'

রামু চায়ের পট আর বিস্কুট দিয়ে গেল। খেতে খেতে সুপ্রকাশ বললে, 'চল একবার ভীড় দেখে আসবি।'

'ঈশ্বর রক্ষা করুন, আমি আর ওদিকে পা বাড়াচ্ছি না, তুই যা, যদি কোন চান্স মেলে তোর একটা গতি হয়ে যাবে।'

সুপ্রকাশ কপালে হাত ঠেকিয়ে বললে, 'জায়গা জোড়া হয়ে আছে পূর্বেই।'

চা শেষ করে সুপ্রকাশ বললে, 'মনে আছে রেবার বিয়ের নিমন্ত্রণ সোমবার, মানে পরশু, মাসিমা বিশেষ করে তোমার কথা বলেছেন সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে।'

'ভাল মনে করিয়ে দিলি, রামুদাকে বলে রাখি কাল পাঞ্জাবী পাজামা চাদর কেচে ইস্ত্রি করে রাখতে আর পরশু সকালে একটা নাপিত ধরে আনতে। বিয়েবাড়ী বলে কথা, আর রেবার সম্মানে যেতেই হবে সুপ্রকাশ!'

সুপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ আমি তাড়াতাড়ি বিদায় নেবো চলি!'

সুনীল তার দিকে চেয়ে হেসে, 'হুজুরে হাজির নাকি?' সুপ্রকাশ মাথা নেড়ে হেসে বেরিয়ে গেল। সুনীল আবার ছবির দিকে এগোল।

* * * *

সুলেখা সারা সপ্তাহ ইস্কুল করে রবিবার দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস করে নিয়েছে। আজ কিন্তু ঘুমোনো চলবে না। কাগজে সুনীলের দুটো নতুন ছবি নিয়ে বাংলা ইংরেজী দুটো কাগজে দু'রকম সমালোচনা তাকে আগ্রহী করে তুলেছে দেখার জন্যে। রবিবার ছাড়া দেখা যাবে না, তাই সকালে মণ্টুকে জপিয়ে রেখেছে যাবার জন্যে সঙ্গে। মণ্টু এখন দিদির সুখ বাধ্যবাদ। কলেজের ছাত্র, হাত খরচের বাড়তি খরচা দিদি জোগায়,

অতএব দিদির টুকটাক্ সেবা করতেই হয়। ঠিক হয়েছে বেলা দুটোর মধ্যেই তারা বেরিয়ে যাবে, ট্রামে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না ; এক ঘণ্টা একজিবিশন দেখে তারা সময়মত বাড়ী ফিরতে পারবে। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে মণ্টুকে তুলে দিয়ে নিজে শাড়ী বদলাতে গেল সুলেখা। আজ সে সিল্কের শাড়ীটা পরবে যার রঙটা সুনীলের পছন্দ ছিল, যেটা সে যত্ন করে তুলে রাখে, একটু সেণ্ট দিয়ে নিতে হবে নয়তো ন্যাপথালিনের গন্ধ ছাড়বে অনেকদিন ব্যবহার হয়নি। জামা মানিয়ে বের করেছে। চুল ঠিকমত বাঁধতে হবে, মুখে রঙচঙ চলবে না, হেজলিন স্নো আর একটু পাউডার। স্কুলে চাকরী নেওয়ার পর থেকে সে সাজা ছেড়ে দিয়েছে, তাই বা কেন ? জেল যাওয়ার পর থেকে শুধু লাল পাড় শাড়ী, পুরোহাতা ব্লাউজ খদ্দরের তার বেশীর ভাগ দিনের পোষাক। আজ কেন জানি, সেভাবে যেতে মন চাইছে না। প্রসাধন শেষ করে সুলেখা বাইরে এলো। মা ঘুমোচ্ছেন, বলা আছে। মণ্টু প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে বললে, 'দিদি তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে !'

'চল তাড়াতাড়ি।' খুশী মনে বললে সুলেখা।

একজিবিশনের গেটে সুলেখা ঘড়ি দেখলে তিনটে পাঁচ, বললে, 'মণ্টু বাইরে একটু বোস বড় ভীড় রে !' ক্রমে ভীড় বাড়ছে। সুলেখা বললে, 'চল মণ্টু ভেতরে।'

'আমি কি করতে যাবো, এখানে বসছি, যদি সুনেদাকে আজ দেখতে পাই, ধরে রেখে দেবো।' সুলেখা ভেতরে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখলে সুনীলের ছবির সামনে লম্বা লাইন। শুধু পুরুষমানুষের ভীড় মেয়ে তো দেখাই যাচ্ছে না। লাইনে এগোতে এগোতে ছবি যখন তার দৃষ্টির নাগালে এলো, সে প্রথমে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারলো না, ক্রমে কাছে যেতে সে চমকে গেল,—নগ্ন নারীচিত্র, নগ্নরূপ তার অসহ্য লাগলো। দ্বিতীয় ছবি, কুৎসিত কদর্য ভঙ্গি অশ্লীল অসভ্য !

মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে এলো লাইন থেকে, নাক, মুখ চোখ মাথা গরম হয়ে উঠলো, দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তার আর ছবি দেখার বাসনা রইলো না, সমগ্র চেতনা জুড়ে কি এক বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। আশাহীন সব হারানো অনুভূতি ! সে বেরিয়ে অশান্ত কণ্ঠে মণ্টুকে বললে, 'বাড়ী চল ট্যাক্সী ডাক।'

মণ্টু অবাক চোখে বললে, 'ট্রামেই তো যাওয়া যাবে দিদি !'

'না না ট্যাক্সী ডাক !' মনে মনে বিড়বিড় করে বললে, অসভ্য জানোয়ার হয়ে গ্যাচে সুনীল, নির্লজ্জ বেহায়া !

ট্যাক্সীতে হেলান দিয়ে শুতে, মণ্টু বললে, 'আজও দিদি তোমার শরীর খারাপ লাগচে, মুখ চোখ লাল হয়ে গ্যাচে ?'

সুলেখা জড়িত গলায় বললে, 'বড় ভীড় ভেতরে হাওয়া বাতাস নেই।'

চোখ বুজলো সে, ভেসে উঠলো ম্যাডনার মত নির্মল সৌন্দর্য, সুনীলের আঁকা মীতার ছবি। ভুলতে পারছে না, অথচ একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা অনুভব করছে! সুনীলের ওপর রাগ ক্ষোভ মন ছেয়ে যাচ্ছে। চোখে রুমাল চেপে ধরলো।

বাড়ীতে এসে ঢুকতেই বাইরের ঘরে অমরবাবু আনন্দময়ীর মুখোমুখি হলো সুলেখা, প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়ালো।

অমরবাবু তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'আজও একজিবিশনে গিয়েছিলে? আমি আসি রবিবার করে তোমাদের সঙ্গে গল্পসল্প করে কাটাবো অথচ আমাকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করো না। যে ছবি দেখতে ছুটে গিয়েছিলে তা কোন ভদ্র-বাড়ীর মহিলার পক্ষে দাঁড়িয়ে দেখা অসম্ভব, আমাকে জানালে আমি আগেই বলে দিতুম বারণ করতুম। কাগজে কাগজে কি কুৎসা করেছে ওই সো-নীল সম্বন্ধে ও নাকি বাঙালী, প্যারিস ফেরৎ ভ্যাগাবণ্ড!'

সুলেখা আর থাকতে পারলো না, দৃঢ়ভাবে বললে, 'কি সব বলচেন যা তা? ওই ভ্যাগাবণ্ডের আগের দুটো ছবি কমিটিতে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে নির্বাচিত।'

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি বললেন, 'দেখ সুলেখা অমর যখন বলচে, তোমার মেনে নেওয়া উচিত, এ নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়, বিশেষ করে ভবিষ্যত ভেবে!'

দপ করে জ্বলে উঠলো সুলেখা, সে মায়ের দিকে চেয়ে বললে, 'শোন মা! অনেক সহ্য করেছি, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গ্যাচে, আমি আর নাবালিকা নই খুকী নই, যে যা বলবে নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে! অসভ্য ভাষায় একজন গুণী শিল্পীকে ভ্যাগাবণ্ড বলতে যাঁর বাধে না, তাঁর কথা মেনে নিতে হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে? আমার ভবিষ্যত তোমাদের কারুরই ভাবার প্রয়োজন আচে মনে করি না, আমি চললুম।' কম্পিত পদক্ষেপে সুলেখা চলে গেল নিজের ঘরে, খিল তুলে দিল ভেতর থেকে।

রাগে অপমানে মুখ লাল করে অমরবাবু বললেন, 'মিসেস বোস, আপনার খাতিরে আমি এখানে আসি, কিন্তু সুলেখার এই অপমানসূচক ব্যবহার আর সহ্য করতে পাচ্ছি না, আমি একজন হায়ার ব্যাঙ্কের অফিসার। মান-মর্যাদা বলে কিছু আছে, সামান্য বি-এ পাশ মেয়ের কাছে আর্টের উপদেশ নিতে চাই না। কিছু মনে করবে না, আমি আসি, নমস্কার!' স্তব্ধ হয়ে আনন্দময়ী কোন কথা না বলে চলে গেলেন ভেতরে।

॥ ৭ ॥

বিছানায় কড়িকাঠের দিকে চেয়ে সুনীল আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে। দুপুরে আজ কাজ করতে ইচ্ছা গেল না। নিরন্ন সংগ্রামের ছবি প্রায় শেষ, কেবল অল্পস্বল্প

স্নেহস্পর্শ লাগতে পারে। বেশ বড় ছবি হয়েছে, হালকা ফ্রেমে ঝুলিয়েছে দূর থেকে ভাল করে দেখার জন্যে। ছবিটা এঁকে মনে তৃপ্তি পেয়েছে, পরিশ্রম করেছে দিনে রাতে ; শেষ করার তাগিদ যখন আসে, কোথা থেকে শক্তি আসে বুঝতে পারে না, পরে ঘন্টার হিসাবে, ধরা পড়ে কতটা কাজ করেছে। কাজের শেষে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে ডুবে যায়।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সুপ্রকাশের কণ্ঠ শোনা গেল একটা কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ঘরে এলো। 'আশার প্রদীপ জ্বালি, ছিনু আমি পথ চেয়ে : নিভিল সে দীপ-শিখা : উতলা ফাগুন বায়ে : সরম মিনতি ভরা : ভীরু মোর আঁখি তারা : কাহারে খুঁজিয়া ফেরে বরগার ধারে ধারে ?' জোরে হাসলো সুপ্রকাশ।

সুনীল জবাব দিলে, 'টিকটিকি, টিকটিকি : ভয় যদি গায়ে পড়ে।'

'মানে মানে ?' সুপ্রকাশ বললে বিছানায় বসে। সুনীল বললে উঠ বসে।

'মানে কি সব কথার থাকে কবিদের ?'

'বিয়ে, যাবে না ?'

'কার ?'

'রেবার, তোমার নয়।'

'যেতেই হবে, জামা জুতো ঠিক করেই রেখেছি।'

'শুয়ে গড়িয়ে যেতে চাও না কি ?'

সুপ্রকাশ বললে, 'না হে রথেই যাবো।'

সুনীল উঠে পড়লো বললে, 'রাজবেশ, আনুষঙ্গ সেরে আসি তুই বোস।'

কিছুক্ষণ পরে ইভনিং ইন পারীর মৃদুগন্ধে হুঁস হলো সুপ্রকাশের, বললে চোখ বুজে, 'কি বাবা প্রসাধন হলো।' ফিরে দেখলে, চাঁপা রঙের পাঞ্জাবী পরে চুল ঠিক করে সুনীল দাঁড়িয়ে, কি সুন্দর লাগছে তাকে, আজ পরিষ্কার দাড়ি কামানো, মনে হলো চেহারার যত্ন নিয়েছে অনেকদিন পরে। গায়ে পাঞ্জাবী পাজামা বিদ্যাসাগরী লাল চটি।

তার দিকে চেয়ে বললে সুপ্রকাশ 'আরে অভিসারে চললে, যা মানিয়েছে ভাই।'

'কার অভিসারে ?'

'তোর প্রেয়সীর।' ব্যগ্র কণ্ঠে সুপ্রকাশ বললে।

'অভিসারে গেলে তার মৃত্যু হবে!'

ব্যগ্র কণ্ঠে সুপ্রকাশ বললে 'কেন ?'

'আমার আঁখি আঘাতে সে যে লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে পড়বে।'

'তাই বুঝি প্রাণের মায়া ছেড়ে চলন্ত বাসে উঠেছিলি ?' হেসে উঠলো সুপ্রকাশ।

রাস্তায় বেরিয়ে সুপ্রকাশকে ঠেলা দিয়ে বললে, 'কোন্ রথে ?'

হাত বাড়িয়ে সুপ্রকাশ বললে, 'ওই যে ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দকারী যন্ত্ররথ।' হাত দেখে ট্যাক্সী থামলো, তারা উঠে বসলো, কড়কড় কড়কড় গিয়ারের শব্দে গাড়ী গতি নিলে দক্ষিণ দিকে। সুনীলের কাঁধে হাত রেখে সুপ্রকাশ বললে, 'তোর তাকে দেখতে ইচ্ছে করে না, কত বছর কেটে গেল আমায় কেন লুকোস? কাজে অকাজে, রাত্রে দিবসে, স্বপ্নে জাগরণে প্রতি মুহূর্তে তুই প্রেয়সীকে খুঁজে বেড়াবি অথচ বাস্তব মানবি না।'

'কি করে বুঝলি?' সুনীল বললে তার দিকে চেয়ে।

'এ কথা কি আমার কাছে তুই গোপন করতে পারবি? তোর ছবি, তোর বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ, তোর আনন্দ-বেদনা সব আমার এত চেনা! আচ্ছা বল তো, তোর এই নতুন ছবিটা কেন আঁকলি কোথায় তোর প্রেরণা? মেনে নিতে ভয়, স্বীকার করতে লজ্জা!'

'যা ওটা তো ইতিহাস।' জোরে বললে সুনীল।

সুপ্রকাশ হেসে বললে, 'ইতিহাস অন্যের কাছে, তোমার কাছে ইতিকথা অর্থশূন্য; আসল কথা তোমার অবচেতন মনে।'

সুপ্রকাশের একটা হাত চেপে ধরে সুনীল আবেগ ভরে বললে, 'থাম থাম সুপ্রকাশ, আমায় উলঙ্গ করিস নি!'

'ঠিক আছে ও কথা থাক, একটা খবর দিয়ে রাখি, মাসিমার কাছে শুনেছি, ফণীবাবুর বাড়ী এ বিবাহে নিমন্ত্রিত পরিচয়সূত্রে। আমার অনুরোধ নিজেকে স্বাভাবিক রাখবে।'

'আমায় নামিয়ে দে, আমি যাবো না।'

'ভয় পেয়ে গেলি, আরে আমাদের বসার জায়গা পুরুষ মহলে। ওরা সব এখনও কলকাতার সাবেকি চালে চলে। মেয়েদের সঙ্গে ওঠাবসা চালু নেই সামাজিক কাজে, আমরা আত্মগোপন করতে পারবো অনেক জায়গা।'

সুনীল বললে, 'বড় মুস্কিল হলো, রেবার জন্যে একটা ছবি এনেছি, তোর হাতেও বই, দেওয়ার ব্যবস্থা কি করে হবে?'

'চিন্তা নেই, পাঠিয়ে দেবো ওর দাদার হাতে।' সুপ্রকাশ একটু থেমে আবার বললে, 'দেখতে ইচ্ছে করে কি না বল সুনীল, আমার জানার জন্যে আন্তরিক আগ্রহ কিছুদিন যাবৎ।' ট্যাক্সী পৌঁছে গেল গেটের সামনে। ওরা দু'জনে নামলো, ট্যাক্সীর ভাড়া দিতে গেল সুপ্রকাশ। তাকে থামিয়ে বিয়েবাড়ীর একজন হলুদ রঙের চাদর গায়ে, হাতের থলি থেকে টাকা বার করে ট্যাক্সীর ভাড়া দিল, বললে, 'আপনারা ভেতরে যান।'

যেতে যেতে সুনীল বললে, 'এটা কি রকম হলো?'

'কলকাতার সাবেকি রীতি পথ খরচ দেওয়ার, নিমন্ত্রিতদের।'

বাগানওয়ালা বাড়ীটা আজ আরো সুন্দর হয়েছে আলোকাভরণে; গেটের মাথায়

রোশন চৌকীর বসন্তবাহারের সুর সানাইয়ে বেজে চলেছে। বনেদী কলকাতার পরিবারে নিমন্ত্রণে রীতিভেদ আছে, এক পুরুষ, দু' পুরুষ, তিন পুরুষ পিতৃমাতৃপক্ষ, তাছাড়া কুটুম্ব বন্ধু, যার যেমন সামর্থ্য অনুযায়ী। রেবার বিয়েতে মিসেস ব্যানার্জী তিন থাক রীতি নিয়েছেন, বাড়ীতে এখন শেষ বিয়ে তার হাতে। একটি কন্যা, জাঁকজমক করতে কার না মন চায়। বাগানে গাছ—পামগাছের ভেতরে টুনি বাল্ব, জায়গায় জায়গায় গ্যাসের ঝাড়, বসার জন্যে চেয়ার পাতা আলো আঁধারিতে। আকাশে সেদিন চাঁদের আলো। তাদের দেখে রেবার দাদা এসে বললে, 'দেরী কেন কৈফিয়ৎ চাই।'

আঙুল বাড়িয়ে সুনীলকে দেখিয়ে বললে সুপ্রকাশ, 'ইনি আমার কৈফিয়ৎ।'

বাচ্চা বাচ্চা দুটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে, একজন বেলফুলের মালা, একজন একটি করে রক্ত গোলাপ দিয়ে চলে গেল। তারা এগোল বাড়ীর দিকে। চক মেলানো বাড়ীর উঠানে সাবেকি চাঁদোয়া দেওয়া বরের আসন, আসর পাতা বসার জায়গা বরযাত্রী, কনেযাত্রীদের। গোলাপজল ছেটানো হচ্ছে। বেলফুল, গোলাপজল, আতরের সব গন্ধের সংমিশ্রণে একটা মাদকতার সৃষ্টি করে সঙ্গে সানাইয়ের সুর, নানা কণ্ঠের কলরব যা বিবাহ আসরের আবহাওয়ায় আকর্ষী বিশেষত্ব। পাটনায় এরকম সামাজিক সংস্পর্শের অভিজ্ঞতা সুনীলের আগে হয়নি। সুপ্রকাশ সুনীল চারিদিকে ফুল দেবদারু পাতায় সাজানো আসরে গিয়ে বসলো। সাজানো সিংহাসনে বর বসে আছে, খুব গম্ভীর। একটু বসে থাকার পর হাতে সরবৎ, পান সিগারেট দেওয়া শুরু হলো সকলকে।

সুনীল নিম্নস্বরে বললে, 'দেখ সুপ্রকাশ, আমার যেন কেমন লাগছে, এই রোমান্টিক আবহাওয়া যেন উত্তেজনার সৃষ্টি করে।' সুপ্রকাশ বললে, 'উত্তেজনার উপশম হয় কিসে?' সুনীল বললে, 'এই ভিড় আর উৎসব থেকে সরে গিয়ে নির্জনে বসা, অথচ দূরে থেকে উপভোগ করা।'

'তাই চলো।'

বাগানে খুঁজে পেতে একটা জায়গা বাছলো। বড় বড় পামগাছের সার ঘেরা বিয়েবাড়ীর চেয়ার পাতা। মনে হচ্ছে অন্য কোন দল জায়গাটায় বসে গ্যাছে। এখান থেকে বরের আসর ভেতরে কিছু অংশ দেখা যায়, অথচ কুঞ্জের মত ঘেরা চাঁদ মাথার ওপর পূবের গায়েই দোল খাচ্ছে, পাম গাছের পাতার ওপরে রুপালী আভা। দুজনে আরাম করে বসলো। সুপ্রকাশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'এইবারে আমার প্রশ্নটার উত্তর দাও তো ভাই। দেখতে ইচ্ছা করে কি না?'

সুনীল নিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত ভাবে বললে, 'নিশ্চয় ইচ্ছা করে! কিন্তু কৈশোরের সেই মধুর স্বপ্ন অমূল্য স্মৃতি, দীর্ঘ দিনের রঙের প্রলেপে রঙীন; বাস্তবের ধাক্কায় সেটা যদি

কুৎসিত-কদর্য রূপ নেয়, আমি কি নিয়ে বাঁচবো। কৈশোরের সেই স্বপ্ন আমি খোয়াতে পারবো না, আমার শিল্পীজীবনও লোপ পাবে।'

সুপ্রকাশ বললে, 'তুই পুরোদস্তুর ইরোটিক, এটা তোর রোগ, এ যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা।'

'যুগ আমি মানি না।'

'দুঃখ পাবে সুনীল।'

'দুঃখের সঙ্গে যে আনন্দ সেটাকে তুমি আমল দিচ্ছ না সুপ্রকাশ! সেটাই আমার শিল্পের প্রেরণা হয়ে থাকবে।' সুপ্রকাশ বললে, 'কতদিন এই জাল বুনবে?'

'যতদিন বোনা যায়, যেদিন শেষ হবে শিকার এসে জালে পড়বে।' বললে সুনীল।

সুপ্রকাশ বললে, 'যদি না পড়ে শিকার?'

'ক্ষতি নেই আক্ষেপও নেই।' হেসে বললে সুনীল।

সুপ্রকাশ বললে, 'না খেয়ে উপবাসে তোমার মৃত্যু হবে!'

'হোক, জাল আমার থাকবে।' জোর দিয়ে বললে সুনীল। সুপ্রকাশ বললে, 'মূর্খতা।' সুনীল বললে, 'উদরসর্বস্ব।' দুজনে হাসলো। সুনীল বললে, 'সত্যি কথা বলতে কি সুপ্রকাশ কাব্য ছেড়ে বলি—আজ আমার মনে কিসের যেন একটা অভাববোধ উঁকি মারছে!' সুপ্রকাশ বললে, 'যাক্ অভাব যখন বোধের আওতায় এসেছে ওটা সুলক্ষণ। ওই সিংহাসনে তুমি বসতে পারতে একটু চেষ্টা করলে। অভাববোধটা অবচেতনার ক্ষুধা যার ইন্ধন জোগায় এই বেলফুল মালা উৎসব গন্ধ, এই নব মিলনের ইঙ্গিত।'

'তুমিও তো অবিবাহিত যুবক, শুধু আমার ওপর চাপাও কেন, নিজের কথাও ভাব!' সুনীল চটে বললে।

রেবার দাদা পাম কুঞ্জে তাদের দেখে বললে, 'দুজনেই ভাবুক লোক, ভেতরে পোষালো না, কি খাবেন, চা না সরবৎ, না লিমনেড।'

'চা হলেই আমরা খুশী, তবে এখন দরকার নেই।'

'সে কি হয়, আমি আনচি।' একটু পরে নিজে দু' হাতে দু' কাপ চা এনে দিলে। একটিন ৫৫৫ সিগারেট-দেশলাই টিপয়ে রেখে চলে যাচ্ছিলো, সুপ্রকাশ বললে, 'একটা কাজ করতে হবে, এই দুটো মাসীমার হাতে দিয়ে দাও রেবার জন্যে।'

'আপনারা যাবেন না ভেতরে?'

'না-না, কি করতে আমাদের ইয়ে—তুমি দিয়ে দাও মাসীমাকে।' আচ্ছা বলে চলে গেলে রেবার দাদা।

সুপ্রকাশ প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা সুনীল রেবার বিয়েতে তোর মনে কি কোন—'

'না ভাই সত্যি আমি ওর সুখী জীবন কামনা করি আন্তরিকভাবে, ও ঠিক করেছে।' চারিদিক চাইতে চাইতে সুনীল সুপ্রকাশের দিকে চেয়ে বললে, 'বিয়েবাড়ীর একটা মাদকতা আছে না?'

'থাকতে পারে।' মুচকি হেসে বললে সুপ্রকাশ। সুনীল বললে, 'তোর কাছে নেই?' সুপ্রকাশ জোরে বললে 'না।' তাকে লক্ষ্য করে সুনীল বললে, 'তুই একটা কি? এই মন নিয়ে কি করে কবিতা লিখিস?'

'কাগজে কলমে!'

'ছাই।'

'তোর মত সবাই বিকৃত মস্তিষ্ক হবে তার কোন মানে আছে?'

'কি বলছিস সুপ্রকাশ? বিকৃত আর স্বাভাবিকের মাপকাঠি কোথায়?'

'তুমি আগে বলেছ যে সব কথা, তার সঙ্গে এখন মিল হচ্ছে না, আমি হলপ করে বলতে পারি রেবার বিয়ে তোমার মনে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে তাকে মেনে নাও যেহেতু এটা জীবনের অঙ্গ!' সুনীল আবার তর্ক তুললো, 'প্রয়োজনকে যদি কেউ অস্বীকার করে?' সুপ্রকাশ বললে, 'করতে পারে না, আজকে তোমার কথায় তোমার মনের রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে!' সুনীল চিন্তিতভাবে চাইল ঘাসের দিকে। সুপ্রকাশ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে 'তুই একটু বোস আমি খবর নিয়ে আসি ভেতরে।'

সুনীল যেন আত্মসমীক্ষায় মেতে গেল। রিক্তশূন্য জীবন। এ জীবন তো সুপ্রকাশের নয়। উৎসবের মাঝে আপন দৈন্য প্রকাশ পেল অথচ সে ভেবে এসেছে, সৃষ্টির মাঝে সে নিজেকে পরিপূর্ণ করে নিতে পারবে। কিন্তু আজ এ প্রশ্ন মনে কেন আসছে, সৃষ্টি সে তো কল্পনা, জীবন বাস্তব। এদের কোথায় মিলন? প্রশ্ন আরো জেগেছে, জীবনের দাম বেশী না শিল্প সৃষ্টির, স্বপ্নের না বাস্তবের।

কতক্ষণ সে এইভাবে মনের সঙ্গে যুজছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজে সে সচেতন হলো, চেয়ে দেখলে সামনে। বিশ্বাস করতে পারলো না চোখকে,—যৌবন-ভারে নুয়ে পড়া তিলোত্তমা, চোখ রগড়ে নিয়ে আবার দেখলো, এর সঙ্গে কারুর মিল হচ্ছে না, কিশোরী সুলেখা, না রীতা, না মণিকা, না মারিয়া, না ক্রিস্টিনা, কে এই লাবণ্যময়ী শ্যামলী কালো কাজল চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

সুনীল উঠে এক পা এগিয়ে, এতদিনের অনুশীলনের দক্ষতায় চাইলো, মুখ দিয়ে বেরোল অস্পষ্ট স্বর, 'তুমি!'

আর একটা কম্পিত স্বর কানে এলো এই মুহূর্তে, 'তুমি!'

পামগাছের পাশে দাঁড়িয়ে সুলেখা, মুখের একদিকে চাঁদের আলোয় ভরা, অন্য দিকে আলোছায়া। তিলোত্তমার দেহসৌষ্ঠবে লেপটে জড়ানো সিল্কের শাড়ী চেনা প্রিয় রঙ সুনীলের। সুনীল যেন স্বপ্ন দেখছে, সুলেখা নিশ্চল নিথর। বুকের স্পন্দন বুঝি বা থেমে যাবে সুনীলের।

কাতর কণ্ঠে যেন বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না সেইভাবে বললে সুনীল, 'তুমি, সুলেখা তুমি? আমি যে এইমাত্র তোমার প্রতীক্ষা করেছিলুম মনে-প্রাণে!'

প্রতীক্ষা শব্দে যেন ক্ষিপ্ত করে তুললো সুলেখাকে, চমকে উঠলো, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, রক্তের চিহ্ন নেই মোমের পুতুল; আস্তে আস্তে তার মুখে ফুটে উঠলো নির্মম বিদ্রূপ, কাঁচের মত স্বচ্ছ চোখে সুনীলের দিকে চেয়ে বললে, 'প্রতীক্ষা! মিথ্যে কথা!'

ছটফট করে বললে সুনীল, 'না না মিথ্যে নয় মিথ্যে নয় সুলেখা।' তার কথাগুলো কান্নার মত লাগলো।

সুলেখার মুখে ফুটে উঠলো একটা নিষ্ঠুর হাসি সে সুনীলের চোখের ওপর চোখ রেখেই বললে, 'তোমার অভিনয় শোনাবার একজন তো পর হয়ে গেল, আরো কত শত করে রেখেচো দেশে-বিদেশে, কত সুন্দরীর জন্যে প্রতীক্ষা করবে?'

'সুলেখা তোমার মুখ থেকে এই কথা আমার স্বপ্নাতীত কল্পনার অতীত।' সুনীল নিজের মুখ দু'হাতের মধ্যে গুঁজে নিল।

সুলেখা ঠাট্টার সুরে বললে, 'চমৎকার অভিনয় করো সুনীল, অন্যত্র কাজে লাগবে।'

আর্তস্বরে সুনীল বললে, 'আমায় বিশ্বাস করো সুলেখা, আমায় বিশ্বাস করো।'

'অসম্ভব!' সুলেখা যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

সুনীল আকুল ভাবে দু'হাত বাড়িয়ে বললে, 'যেও না যেও না সুলেখা, যেও না!'

তার হাত সরিয়ে দিয়ে বললে সুলেখা, 'পথ ছাড়ো যাও, আমি তোমায় ঘৃণা করি।'

সুনীল সরে দাঁড়ালো, বললে, 'তাই হোক ঘৃণাই ভাল, সেই ভাল!'

সুলেখা ঝড়ের মত চলে গেল। সুনীল চেয়ার চেপে ধরে কাঁপতে লাগলো।

সুপ্রকাশ এসে সেই অবস্থায় দেখে অস্থিরভাবে বললে, 'সুনীল, সুনীল কি হোল তোর?'

ভাঙাগলায় সুনীল বললে, 'সে এসেছিল সুপ্রকাশ, কত যুগ পর তাকে আমি দেখেছি।'

সুপ্রকাশ বললে, 'কে?'

'প্রেয়সী!'

'তারপর?'

আর্তকণ্ঠে সুনীল বললে, 'আমায় ফিরিয়ে দিলে, মিথ্যাবাদী বললে, বললে তোমায় ঘৃণা করি!' বলেই পাগলের মত চেয়ে রইলো।

সুপ্রকাশ সমবেদনার স্বরে বললে, 'তুই তো এই চেয়েছিলি?'

উদ্‌ভ্রান্তের মত সুনীল বললে, 'কল্পনায় চেয়েছিলুম কিন্তু তা যে এত অসহনীয়, নির্মম হবে ভাবিনি।'

চুপ করে থেকে আবার বললে, 'সুপ্রকাশ সে আমায় বিশ্বাস করে না, গত পাঁচ বছর কত নিষ্ঠুর আঘাত আমি নিজেকে দিয়েছি, অন্যকে দিয়েছি, তার বিশ্বাস রক্ষার জন্যে, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করেছি নিজেকে, যৌবনের মর্যাদা মাড়িয়ে এসেছি তার মুখ চেয়ে একথা যদি সে জানতো সুপ্রকাশ। আমি কি করি আমি কি করি? আমি সইতে পারছি না তুই জানিস ভাই আমার জীবন-যন্ত্রণা। আমি মিথ্যাবাদী ঘৃণ্য মূল্যহীন নভিনেতা! সুপ্রকাশের কাঁধে মাথা রাখলো, 'অসহ্য যন্ত্রণা সুপ্রকাশ।'

সুপ্রকাশ তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'চল বাড়ী যাই, এখানে খাওয়ার দরকার নেই, আমি সব দেখা করে এসেছি, চল বাড়ীতে কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।'

গেট থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সীতে উঠলো তারা। সুনীল বললে বেদনাহত কণ্ঠে, 'সুপ্রকাশ আমার মাথাটা কেমন যেন করছে!' সুপ্রকাশ তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলো। সুনীলের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে চলেছে। সে ধরা গলায় বললে, 'আমায় ছেড়ে যাসনি সুপ্রকাশ, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকবি ভাই!'

'আচ্ছা।' সুপ্রকাশের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো প্রিয় বন্ধুর সরল মনে নির্মম আঘাতের পরিমাণ দেখে। তার দুঃখ ও রাগ গভীর হয়ে উঠলো। ছুটে গিয়ে এখুনি যদি বলতে পারতো, মূর্খ দাম্ভিকা বিচারহীনা নারী তুমি কি করেছো তা তোমার ধারণাতীত! সুনীল মুখার্জীকে আমি শৈশব থেকে চিনি, আমার চেয়ে কেউ চেনে না তাকে; শৈশব থেকে কোনদিন কোন কারণে মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি, এর জন্যে শাস্তি ভোগ করেছে হাসি মুখে।

॥ ৮ ॥

বুধবারের ভোরে একটা বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে সুলেখা জেগে উঠেছে। সোমবারে রেবার বিবাহ রাত্রের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া সারা মন ছেয়ে আছে। মঙ্গলবার স্কুলে গিয়ে একটা ক্লাশ নিয়ে শরীর মনের অবস্থার জন্যে ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। মনে খালি প্রশ্ন একটাই, কেন সে এত মমতাহীন নির্মম ব্যবহার করলো সুনীলের সঙ্গে? রাগের মাথায় যে সব শব্দ সে ব্যবহার করলো তা তো অভিমানের নয়। শৈশব

থেকে তাদের হাজারবার ঝগড়া মারামারি হয়েছে, কিন্তু এমন উন্মত্ত মোংরামী কোনদিন হয়নি। একজিবিশনে সেদিন তার পালিয়ে যাওয়ার আশাভঙ্গ, দ্বিতীয় দিনে নগ্ন নারী-চিত্র দেখে মন বিষিয়ে ওঠা, বহুদিনের অদর্শনে মনের আকুতি, রেবার বিবাহের পরিবেশ এতে সুনীলের কি এমন দোষের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে পেল তার চরিত্রের? শিল্পী হিসাবে সুনীল যা ধর্ম তাই করেচে নগ্নচিত্রে; রাখালের ছবিতে যা প্রকাশ করেছে তা মিথ্যা তার কি প্রমাণ সে পেয়েচে? সে কি জানে না মায়ের মনোভাব বুঝে সে নিজেকে সরিয়ে রেখেচে, যে মামণির কোল ছাড়া বুড়ো বয়স পর্যন্ত তার শান্তি হতো না, তাঁকেও সরিয়ে রেখে নিঃসঙ্গ জীবন চালিয়ে যাচ্ছে কলকাতায় ফিরেও। বাবা নেই, বিয়ে করেনি, পারীতে সুযোগ তো ছিল। বেদনাতুর মনে কত অতীত স্মৃতি সুলেখাকে নাড়া দিচ্ছে দিবারাত্র, বারেবারে কানে বাজছে চিরদিনের চাপা স্বভাবের সুনীলের চিৎকার, 'যেও না সুলেখা যেও না।'

আনন্দময়ীর ডাক শুনলে, 'হ্যাঁ রে সুলেখা, কি হলো, এত বেলা হলো মুখ ধোয়া নেই, চা খাওয়া নেই, শুয়ে আচিস এখনও?'

'এই যে যাই।' উঠে গেল সুলেখা।

প্রাতঃকৃত্য সেরে চা জলখাবার খেয়ে চিঠির বাক্সে একটা চিঠিতে তার নাম দেখে, সেটা নিয়ে ঘরে এলো। খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করলো, পড়তে লাগলো—কল্যাণীয়াসু, আমার নাম সুপ্রকাশ। আপনি আমায় শচীনকাকুর অসুখের সময় দেখিয়াছেন। সুনীল আমার বাল্যবন্ধু তাহার বর্তমান স্বাস্থ্য লইয়া শঙ্কিত হইয়াছি। রেবার বিবাহ-সভায় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাকে লইয়া তাহার বাড়ীতে ফিরি। তাহার তখন প্রায় উন্মাদের মত অবস্থা। রাত্রে জ্বর হয়, সকালে বাড়ীর ডাক্তারবাবুকে খবর দি। তিনি প্রশ্ন করেন জ্বর লইয়া বিবাহবাড়ী গিয়াছিল কি না? রাত্রে কত জ্বর উঠিয়াছিল? প্রলাপ বকিবার সময় ঘুমের ঘোর ছিল কি না? তিনি কোন কারণ না বলিয়া বলিলেন, বড় ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। আমি একজন বড় ডাক্তার দেখাইয়াছি। তিনি ঘুমের ঔষধ ও বিশ্রামের উপদেশ দিয়া বলিলেন, পরে দেখিয়া বলিব কি কারণ, মাথার ব্যাপার হইলে ভাবনার, অন্য কিছু হইলে চিন্তা নেই; তবে একটা কথা রুগী খুবই দুর্বল, খাওয়া-দাওয়া ও সেবা প্রয়োজন, স্বাস্থ্য ভাল নয়। তিনি খাদ্য তালিকা ও ঔষধ দিয়া গিয়াছেন। এখন সমস্যা এই যে সুনীলের বর্তমান আয় খুবই কম, আমি একটি কলেজে সামান্য মাহিনা পাই। সুনীলের ডাক্তার খরচ ও যত্ন লইতে হইলে আমাদের আয়ে কুলাইবে না; সেইজন্য আপনার পিতাকে সকল বিষয় জানানো কর্তব্য মনে করিতেছি, তিনি সুনীলের আত্মীয়-সমতুল্য। সুনীলকে সেই রাত্রে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করায় যাহা জানিয়াছি

তাহার মূল কথা, আপনার ব্যবহারে ও কথায় সে মর্মান্তিক আঘাত পায়। কিছুদিন যাবৎ তাহার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না, তাহার উপর আপনার মিথ্যা অপবাদ ও কটূক্তি তাহার ভাঙিয়া পড়ার কারণ বলিয়া আমি মনে করি। যে জীবনে কোনদিন মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত নয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি সত্য বলার জন্য স্কুল জীবনে শাস্তি গ্রহণ করিত হাসি মুখে, তাহাকে আপনি তাহার মুখের উপর মিথ্যাবাদী বলিয়া আঘাত দিয়াছেন। প্রতীক্ষার ছবি লইয়া তার শিল্পী চেতনায় আঘাত দিয়াছেন, যে মানুষ শিল্প সাধনা একমাত্র জীবনের অবলম্বন করিয়াছে। আপনার মত শিক্ষিতা মহিলার এই মূর্খের মত ব্যবহারে আমি দুঃখিত। কোন নারী সম্বন্ধে যাহার আগ্রহ নাই, তাহাকে আপনি বহু নারীবিলাসী বলিয়াছেন। আমার মাসতুতো বোন রেবাকে লইয়াও কটাক্ষ করিয়াছেন। আপনার এইসব কিছু না জানিয়া একতরফা অভিযোগ অশিক্ষিতা রমণীর মত, অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাহাই হোক এই পত্রে আপনাকে জানাইলাম, আমি ফণীজেঠুর নিকট আগামী কল্য যাইতে বাধ্য হইতেছি, ক্ষমা করিবেন। ইতি সুপ্রকাশ।

চিঠি পড়ার পর সুলেখা কান্নায় ভেঙে পড়লো। আত্মগ্লানি, অনুশোচনায় ভরে উঠলো মন। ঠিক করলো বাবাকে বলে রাখবে সুপ্রকাশের চিঠির কথা। প্রয়োজনে কোন সত্যই গোপন করবে না। সঙ্কোচ ভয় সব যেন লোপ পেয়ে গেল চিঠিতে। এ সময় সুপ্রকাশকে সাহায্য করা দরকার, নইলে সুনীলের ক্ষতি হতে পারে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। স্কুলের কাপড় জামা নিয়ে স্নানের ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাপড় জামা পরে বেরিয়ে এলো। 'ঠাকুর ভাত দাও' হেঁকে খাবার ঘরে গেল। ভাত দিতে নাকে মুখে গুঁজে, ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়লো। হাত মুখ ধুয়ে বাক্স থেকে যা টাকা ছিল নিয়ে, ব্যাগে ভরে চেঁচিয়ে বললে, 'মা বেরোচ্ছি।'

'এসো।' আনন্দময়ী সাড়া দিলেন।

হেদোর ধারে কালীঘাটের বাসে উঠে বসলো। বাস যখন রসা রোডের পরিচিত মোড়ে এলো, সে নেমে পড়লো, সামনের ছোট রাস্তা দিয়ে পশ্চিমে যেতে হয় হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের দিকে। সুনীলের বাড়ীর গেটে এসে থমকে দাঁড়ালো, এতক্ষণ যে উত্তেজনা নিয়ে এসেছে তা যেন লোপ পেল। ভয় দ্বিধা লজ্জা যেন তাকে পেয়ে বসলো; দাঁড়িয়ে মনটাকে শক্ত করলো, কাপড় ঠিক করলো চুল গুছিয়ে নিল। গেট খুলে ভেতরে গেল সিঁড়ির দিকে। জুতো টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো, উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলো কাউকে দেখা যায় কিনা; বাইরের ঘরে ঢুকলো, দূরে রামুদাকে দেখতে পেয়ে হাতের ইসারায় ডাকলো।

রামু সামনে এসে, 'দিদিমণি!' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

সুলেখা বললে, 'দাদাভাই কেমন?'

মাথা নেড়ে রামু বললে, 'না না।'

'সুপ্রকাশবাবু আছেন?'

'আপনি ভেতরে যান না।'

সুলেখা মাথা নেড়ে বললে, 'ওঁকে ডেকে দাও!' সুপ্রকাশ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে, নমস্কার করলে সুলেখা।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, 'আসুন।' সুলেখার ঠোঁট কেঁপে উঠলো, সামলে নিয়ে বললে, 'বারান্দায় চলুন।' বারান্দায় গিয়ে একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বললে 'একটু বসুন!' সে লক্ষ্য করেছে সুলেখার পা কাঁপছিল। সুলেখা বসে পড়লো।

ঘর থেকে সুনীলের আওয়াজ এলো, সুপ্রকাশ বললে 'আপনি যাবেন না দেখতে?'

'আজ নয় পরে!' কান্নায় গলাভাঙা চোখে যেন জলও রয়েছে। সুপ্রকাশ সুনীলের কাছে চলে গেল। ফিরে এলো রামুকে চায়ের কথা বলে।

'কি জন্যে ডাকছিল সুপ্রকাশদা?'

'ও কিছু নয় ঘুমের ঘোরে আমার নাম করে কখনও আরো অনেকের নাম করে চেঁচিয়ে ওঠে।'

সুলেখা হাতব্যাগ খুলে একটা খাম সুপ্রকাশের হাতে দিয়ে বললে, 'আমার বাড়ীতে যা ছিল এনেছি, এতে পাঁচশো আছে তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে যাওয়া হয়নি আজ সকালে আপনার চিঠি পেয়েছি আপনি ঠিকই লিখেছেন, আমি মূর্খ নির্বোধ আমায় ক্ষমা করুন!' কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো সুলেখা ঝর ঝর করে চোখের জল গড়াতে লাগলো, সে সুপ্রকাশের দিকে দু'হাত জোড় করে বললে, 'আপনাকে আমার অনেক ধন্যবাদ এই চিঠির জন্যে। আপনি যা প্রয়োজন সব করুন ওঁর মঙ্গলের জন্যে আমি নিজে বাবাকে বলবো আপনিও যাবেন কাল।'

রামু চা দিয়ে গেল, সুপ্রকাশ বললে, 'চা খান, ভুলে যান চিঠির কথা, ভুল হওয়া মানুষের স্বাভাবিক, চা খান।'

'আমি আপনাকে সুপ্রকাশদা বলেছি, আপনি আমায় আপনি বলবেন না।'

'ঠিক আছে চা খাও সুলেখা।' সস্নেহে বললো সুপ্রকাশ।

চা খাওয়া হতে সুপ্রকাশ বললে, 'তুমি একবার সুনীলকে দেখতে যাবে না?' একটু

বিধাগ্রস্তভাবে বললে সুলেখা, 'আজকে নয় এ-পোশাকে যাবো না, ওর কষ্ট হবে যদি চোখ চায়, আজ যাক। কেমন আছে আজ?'

'এমনি ভাল, জ্বর ছেড়ে গ্যাছে কিন্তু কিছু খাচ্ছে না অথচ খাওয়া দরকার ডাক্তারবাবুর মতে। এমনকি ঘুমের মিক্‌চারটাও জোর করে খাওয়াতে হচ্ছে যেন না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা, আর ঘুমের ঘোরে চেঁচানো, 'মামণি, সুলেখা, সুপ্রকাশ, শুধু নাম ধরে ডাকা যেন কত দরকার।'

চোখে আঁচল দিয়ে সুলেখা বললে, 'ছোটবেলা থেকে এই রাগ হলে মুখবন্ধ সাড়াশব্দ নেই, মুখটেপা, খাওয়া বন্ধ। বাবাকে আজ নিজেই বলবো, মা ছাড়া কেউ বাগাতে পারবে না, আপনি আজ সামলান কাল সকালেই ওঁরা এসে যাবেন শুনে, আমি আজ আসি।'

'এসো!' সুপ্রকাশ সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

সুপ্রকাশ বিশ্বাস করতে পারছে না বাঙালী মেয়ে এতটা আত্মনির্ভর সাহসী হয়ে উঠেছে; সুলেখা সত্যি অনন্যা, তার কথাবার্তা জড়তাশূন্য, আচার ব্যবহার তার খুব ভাল লাগলো। সুপ্রকাশ ফিরে গিয়ে সুনীলের মাথায় হাত বোলাতে লাগলো। তার মনটা সাহসে ভরে উঠেছে দুশ্চিন্তা অনেক কমে গেল সুলেখাকে দেখে। অনেক দিনের রোগভোগের মত সুনীলের মুখের চেহারা শুষ্ক হয়ে গ্যাছে! একটুক্ষণ পরে সুনীল নড়ে উঠলো, চাইলো সুপ্রকাশের দিকে, ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'তুই কতদিন একা একা সারাক্ষণ বসে থাকবি সুপ্রকাশ, অসুস্থ হয়ে পড়বি যে ভাই। আমি ভাল আছি যা শুয়ে পড় একটু।' সুনীলের স্বাভাবিক কথা শুনে আনন্দে সুপ্রকাশ বললে, 'ঠিক আছে তোকে ভাবতে হবে না তুই ঘুমো, ডাক্তারবাবু বলেছেন, যত ঘুমোবি তত ভাল।'

রুগ্ন হাসি হেসে সুনীল বললে, 'আমি এখুনি ঘুমিয়ে পড়বো তুই যদি একটা কাজ করিস।'

'কি, বল?'

'আমার এটাচীতে একটা ছবি আছে যদি এনে দিস।'

আঁতকে উঠলো সুপ্রকাশ, বললে, 'না ভাই ছবিফবি ডাক্তারবাবুর নিষেধ এখন।'

'কে তোর ডাক্তারবাবু! ভারী!' রেগে বললে সুনীল পাশ ফিরে। সুপ্রকাশ চুপ করে রইলো। ঔষধের ঝোঁকে দেখতে দেখতে সুনীল আবার গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল। সুপ্রকাশ উঠে পাশের ইজিচেয়ারে হাত-পা এলিয়ে চোখ বুজলো।

* * * *

সুলেখা স্কুল থেকে যে সময়ে ফেরে সেই সময়ে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে

ঢুকলো। স্কুলে কোন ক্লাশ নেয়নি শরীর খারাপের অজুহাতে। কামিনী চা জলখাবার দিয়ে গেল। সে ঠিক করেছে জলখাবার খেয়ে ঘণ্টা দুই শুয়ে সে বাবার কাছে যাবে চিঠি নিয়ে। খাওয়া শেষে যখন সে বিছানায় চোখ বুজেছে খানিক পরেই মণ্টু বাড়ী এলো হাতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নিয়ে। বারান্দায় চেঁচিয়ে বললে, 'মা মা সুনেদার খুব অসুখ কাগজে বেরিয়েছে, ডাক্তার বলেছে তার 'মেণ্টেলডিরেঞ্জমেণ্ট' হওয়ার আশঙ্কা আছে।'

আনন্দময়ী কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন। সুলেখা উঠে পড়লো, এ রোগের নাম তো সুপ্রকাশ বলেনি! সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ফ্যাকাশে মুখে আনন্দময়ী পড়ে গেলেন, 'যদি তার আত্মীয় স্বজন কেউ থাকেন, ঠিকানার দরকার লাগে নীচে দেওয়া হল।'

আনন্দময়ী কেঁদে ফেললেন, 'কি করবো উনিও বাড়ী নেই কি করবো সুলেখা।' হতাশ জলেভরা চোখে চেয়ে রইলেন সুলেখার দিকে। মণ্টু বললে, 'আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি ঠিকানা দেখে।' আনন্দময়ী বললেন, 'কি করি সুলেখা তুই বল কি করি।'

সুলেখা ধীরকণ্ঠে বললে, 'বাবা একটু বাদেই এসে যাবে মা, শুধু গেলেই তো হবে না, চিকিৎসা সেবা সব ব্যবস্থা করতে হবে। বাবা এলে সব ঠিক করা যাবে তুমি বসো মা।' আনন্দময়ী চোখে আঁচল চেপে মেঝেতে বসে পড়লেন, সুলেখা মণ্টু দুদিকে গায়ে হাত দিয়ে বসলো। কামিনী, বিশু, ঠাকুর সবাই এসে দাঁড়ালো বারান্দায়।

ফণীবাবু বাড়ী ফিরে বারান্দায় সবাইকে দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার তোমরা…'

আনন্দময়ী তার আওয়াজ পেয়ে জোরে কেঁদে বললেন, 'সুনের খুব অসুক কাগচে লিখেচে, কি হবে গো?'

ফণীবাবু বললেন, 'আমি জানি, কলেজে কাগজ দেখে আমি খবর নিতে গেছলুম। ডাক্তার, সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এখন একটু ভাল। সুনীলকে ঘুমোতে দেখে এসেছি, তোমরা চিন্তা করো না।'

'আমি যাবো, আমি যাবো।' কান্না ভাঙা গলায় বললেন আনন্দময়ী।

'খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও পরে যুক্তি করা যাবে।' বলে ফণীবাবু চলে গেলেন জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুতে।

ফণীবাবু, আনন্দময়ী, সুলেখা লাইব্রেরী ঘরে। সুনীলের ওখানে আনন্দময়ীর যাওয়া নিয়ে আলোচনায় স্থির হল, কাল সকালে আনন্দময়ী যাবেন মণ্টুর সঙ্গে, ফণীবাবু কলেজে একটা ক্লাশ সেরে, সুলেখাকে স্কুল থেকে নিয়ে, বাড়ীতে সব ঘরে চাবি দিয়ে।

রান্নাঘর বারান্দায় কামিনী বিও থাকবে, ঠাকুর বাসায় যেমন যায় যাবে। ফণীবাবু বললেন, 'আনন্দ তুমি শোওগে যাও আমি সুলেখার সঙ্গে একটু আলোচনা করে যাবো।' আনন্দময়ী উঠে গেলেন। ডিভানে হেলান দিয়ে ফণীবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'সুলেখা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, লজ্জা না করে উত্তর দিও। এখন যথেষ্ট বড় হয়েচ, লজ্জা করার কারণ নেই। সুনীলের ঘরে খাটের সামনে বেশ বড় একটা তোমার ছবি দেখলুম। সুপ্রকাশের কাছে শুনলুম আরো দশ বারোখানা তোমার ছবি সে এঁকেছে। সুপ্রকাশ বললে, এ সব ছবি সে বাইরে রাখে না, বাক্সর মধ্যে রাখে। সুপ্রকাশ বললে, 'সে অসুস্থ অবস্থায় ঘুমের ঘোরে তোমার নাম ধরে ডাকচে, উত্তেজিত রাগতভাবে অনেক কথা বলেচে বোজা যায়নি! আমার একটা প্রশ্ন, পারী থেকে ফেরার পর তোমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয়েছিল কি না? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সুনীল ও তোমার মধ্যে কোন প্রণয়সুলভ দুর্বলতা আচে কি না?'

নিম্ন স্বরে মাথা নীচু করে সুলেখা বললে, 'আছে।' সুপ্রকাশের চিঠি বাবার হাতে দিয়ে বললে, 'ওর অসুখের জন্যে আমি দায়ী!' বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে আঁচল চাপা দিল মুখে।

চিঠি শেষ করে ফণীবাবু বললেন, 'আমাকে বলনি কেন মা?'

'মায়ের মনে কষ্ট হবে বলে আমরা এড়িয়ে চলছিলুম। নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্তরও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার কোন দোষ নেই, সব কিছুর জন্যে আমি দায়ী। আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়লো, ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করো, আমার জমা টাকা যা আছে কাল তোমাকে দেবো।'

'সে চিন্তা করো না মা, তুমি যাও শোওগে।'

॥ ৯ ॥

সুনীল শুয়ে; সুপ্রকাশ মাথায় আইস্-ব্যাগ চেপে রেখেছে; গত ক'দিন দিবারাত্রি ভাবনা, পরিশ্রমের ছাপ, বিষাদের কালি তার মুখে, মাঝে মাঝে মাথাও ঢুলে পড়ছে। ঘরের আবহাওয়া নিস্তব্ধ। হঠাৎ সুনীল চাইলো সুপ্রকাশের দিকে, জোরে হেসে উঠলো, অস্ফুট কণ্ঠে কি সব বললে শেষটা শোনা গেল,—অভি—নয়, অ—ভি—ন—য়, আবার চোখ বুজে গেল। সুপ্রকাশ তার কপালে হাত রাখলো অসহায় চোখে চেয়ে। সুনীল আবার নিদ্রার ঘোরে ডুবে গেল।......

আনন্দময়ী ঘরে ঢুকলেন, সন্তর্পণে বিছানার কাছে গ্যালেন, দূরে মণ্টু দাঁড়িয়ে রইলো। সুপ্রকাশকে ইঙ্গিতে ডেকে বিছানার থেকে দূরে সরে দাঁড়ালেন। সুপ্রকাশ

উঠে এলো, চোখে তার বিস্ময়ের দৃষ্টি, লাবণ্যময়ী মাতৃমূর্তি অপরিচিতা কিন্তু কোথায় যেন মিল, চেনা মুখ, এই কি সেই সুনীলের মামণি? নিম্নস্বরে তিনি শুধালেন, 'কেমন আছে?'

'জানি না।' উত্তর দিল সুপ্রকাশ।

'ডাক্তার?'

'আসবার সময় হয়েছে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসতে পারেন।' ক্লান্তস্বরে সুপ্রকাশ বললে।

'তুমি একটু বিশ্রাম করো বাবা, আমি বসছি।'

আনন্দময়ী আস্তে খাটে উঠে বালিশ সরিয়ে কোলে তোয়ালে নিয়ে আইস-ব্যাগসমেত মাথাটা কোলে তুলে নিলেন; সুপ্রকাশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'যাও বাবা একটু বিশ্রাম করো, ভয় নেই আমি আছি।' করুণাময়ী মূর্তি দেখে সুপ্রকাশ সাহস পেলো, পাশের ছোট তক্তাপোষে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো, দেখতে দেখতে তার চোখ জুড়ে গেল, চেতনাশূন্য ঘুম!

'জীবনে মিথ্যা বলিনি তুই মিথ্যাবাদী পাজি, মামণি মামণি তুমি মুখপুড়ীটাকে মারো মামণি, আমায় গালাগালি দিয়েছে, ওকে না মারলে আমি খাবো না বলে দিলুম। তুই মিথ্যুক, পাজি!' সুনীল তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বরে বলে গেল। আবার চুপ।

আনন্দময়ীর চোখ জলে ভরে এলো, বহুদিনের ভুলে যাওয়া স্মৃতি তার হৃদয় মুচড়ে দিলে যেন। সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'সুনে সুনে, কি বলছিস সুনে।'

সুনীল বললে, 'সুপ্রকাশ মাথায় বড় যন্ত্রণা, মাথাটা কেমন করছে ভাই!'

আইস-ব্যাগটা ভাল করে চেপে ধরলেন আনন্দময়ী। সুনীল শান্ত হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়লো। রামু এককাপ চা এনে বললে 'মা একটু চা খান।'

আনন্দময়ী হাত নেড়ে বললেন, 'মণ্টুকে দাও বাবা।'

কিছু বাদে সুনীল আবার নড়ে উঠলো। আনন্দময়ী তার দিকে চেয়ে কপালে হাত রেখে বললেন, 'সুনে সুনে, সোনা, চেয়ে ছাখ আমি! চেয়ে ছাখ!' সুনীলের তন্দ্রাঘোর ফিকে হয়ে এলো, হাত তুলে কপালে রাখা হাতটা ধরলো ছেড়ে দিল, আবার চোখ বুজলো। বিড় বিড় করে কি সব বললে।

আনন্দময়ী ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন, 'সুনে সুনীল, সোনা, চেয়ে ছাখ আমি!'

ফিকে হয়ে এলো তন্দ্রা, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চাপা স্বরে বললে, 'সুলেখা? তুমি?'

হাতুড়ির ঘা পড়লো আনন্দময়ীর হৃদয়ে, সুনীলের গালে হাত বুলিয়ে বললেন, 'চেয়ে ছাখ আমি মামণি এসেছি সোনা!'

সত্যি তুমি এসেছো, মা না না সুপ্রকাশ সুপ্রকাশ মাথাটা আমার কেমন—' আইসব্যাগ সরিয়ে দিয়ে তার মাথাটা বুকে চেপে বললেন, 'দেখ খুলে চিনতে পারিস কিনা ?'

গরম কোমল মায়া স্পর্শ চেতনা এনে দিল সুনীলের। দু'হাতে জড়িয়ে স্বাভাবিক গলায় বলে উঠলো, 'তুমি এসেছো ?'

তার কপালে চুমু খেয়ে বুকের মধ্যে নিয়ে 'এই ভাখ আমি কি না !'

আকুল আকুতি ভরা কণ্ঠে সুনীল বললে, 'আঃ ! কতদিন পরে, মামণি, মা মা আমায় ঘুমোতে দাও ছেড়ে যেও না মামণি, ওই সুপ্রকাশটা আমায় ওষু…'আনন্দময়ীর কোলে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়লো।

ডাক্তার এলেন। সুপ্রকাশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছে ?'

'শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে।'

'উনি কে ?' প্রশ্ন করলেন, সুপ্রকাশ উত্তর দিল, 'সুনীলের মামণি।'

'বিকারে ওঁকেই চাইছিল না ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'চলো একবার আমি দেখি' ডাক্তারবাবু ঘরের ভেতরে এগিয়ে গেলেন ; আনন্দময়ী উঠে দাঁড়ালেন।

ডাক্তারবাবু সুনীলকে পরীক্ষা করে প্রেসার দেখে বুক নাড়ী দেখে বললেন, 'অনেক ভাল স্বাভাবিকের দিকে। ঔষধ লিখে, দিচ্ছি দিনে রাতে তিনবার দেবেন, উত্তেজনা দেখলেই ঘুমের ওষুধ, আইসব্যাগ খাবার হালকা সবকিছু।'

সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে সুপ্রকাশ ফিস্ দিতে গেল। তিনি বললেন, 'দরকার নেই প্রোঃ বোসের সঙ্গে কথা হয়েছে।' তিনি চলে গেলেন, সুপ্রকাশ উঠে গেল।

তাকে দেখে আনন্দময়ী বললেন, 'কি বললেন ?'

'ভালই কাকীমা, চিন্তার কারণ নেই।'

'তুমি আমায় কাকীমা বললে কেন ?'

'ফণীকাকু শচীনকাকু আমার মৃত পিতার চেয়ে অনেক ছোট।'

'ও' হেসে আনন্দময়ী বললেন, 'তোমাদের দেশ কোথায় ?'

'জানি না কাকিমা, আমরা তিন পুরুষ পটলডাঙ্গায়। দেশ খুব সম্ভব পূর্ববঙ্গে হবে।'

'তুমি যা সুনীলের করেছো নিজের ভাইও পারে না, বেঁচে থাকো বাবা !'

সুপ্রকাশ রামুদার কাছে খবর নিয়ে এসে বললে, 'কাকীমা এই সময়ে চারটি ভাত মুখে দিয়ে নিন, সুনীল ঘুমোচ্ছে, আমি এখানে আছি।'

আনন্দময়ী খাবার ঘরে দেখলেন টেবিলে কাঁচের বাসন বেশ সুন্দরভাবে সাজানো, জায়গায় জায়গায় সব খাবার সাজানো, বড় চামচ দেওয়া নিজেদের তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা।

তিনি হেসে বললেন, 'বিলেত ফেরৎ সুনীল বুঝি চালু করেচে?'

রামু বললে, 'না ম', বাবুর সময় থেকে কলকাতায় তিনি চালু করেন, বলতেন এতে বাড়ীর লোকের অনেক সুবিধা।'

সেই সময়ে ফণীবাবু সুলেখা এসে পৌঁছল, তারা সুনীলকে দেখে খাবার ঘরে এলেন। সুপ্রকাশের সঙ্গে।

সুপ্রকাশ বললে, 'একটু মুখে দিন সবাই।'

ফণীবাবু সুলেখা বললে, 'আমরা ভাত খেয়ে বেরিয়েছি।'

আনন্দময়ী বললেন, 'আমায় একটু চা দাও অন্য কিছু নয়।'

সুপ্রকাশ বললে, 'একটু ফল মিষ্টি যদি না খান আমি দুঃখ পাবো।'

আনন্দময়ী চুপ করে রইলেন, ফণীবাবু চারিদিক দেখতে দেখতে বললেন, 'সুনীল এখন কেমন?'

সুপ্রকাশ হেসে বললে, 'খুব ভাল।'

'খুব ভাল হবে না? আজ জীবন্ত অষুদ মিলে গ্যাচে, এরপর আপনি সেরে যাবে সুপ্রকাশ।'

সুপ্রকাশ হাতজোড় করে আনন্দময়ীকে ফল মিষ্টি খাইয়ে ছাড়লো, রামু চার কাপ চা সকলের হাতে দিল।

চা খেয়ে ফণীবাবু আনন্দময়ী সুলেখা সারা বাড়ী ঘুরে দেখলো। তারপর সবাই সুনীলের ঘরে গেল। ফণীবাবু আনন্দময়ীকে দেখালেন সুলেখার ছবি দেয়ালে। কত জীবন্ত দেখেচো? কত বড় লাইফ সাইজ! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আনন্দময়ী চেয়ে রইলেন, চার-পাঁচ বছর আগের সুলেখা যেন দাঁড়িয়ে আছে। সুপ্রকাশ বললে, আরো ছবি দেখবেন সুলেখার? সব ডেট দেওয়া আছে, পারীতে আঁকা বিভিন্ন দেহভঙ্গিমা।

সুপ্রকাশ জানে রীতার শরীরে শাড়ী পরিয়েছে দুজনের অবয়ব এক সাইজের হওয়ায়, অসুবিধা নেই কল্পনার জোর থাকলে। আনন্দময়ী ছবিগুলো দেখলেন।

ফণীবাবু সুলেখা স্টুডিও ঘরে গিয়ে বড় ছবিটার সামনে দাঁড়ালো। ফণীবাবু বললেন, 'ওই ছবিটা সুপ্রকাশ বললে, ছ'দিন, দিনরাত পরিশ্রম করে শেষ করে রেবার বিয়েতে গেচলো ক্লান্ত শরীরে। তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েচে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে।'

সুলেখা বললে, 'ঝগড়া করেনি, ওর গলায় ছিল বিনীত স্বর, আমার গলায় তীব্র অশিষ্ট দোষারোপ আমারই দোষ বাবা।' অপরাধের কথা যেন ভুলতে পাচ্ছে না সুলেখা।

ফণীবাবু বললেন, 'এত ছবি একদিনে দেখা যাবে না সুলেখা, আমি ফেরার পথে একবার ডাক্তারের ওখান হয়ে যাবো চলো মাকে বলে যাই।

'আমি এখানে থাকবো বাবা?'

'থাকো।' তিনি সুনীলের ঘরে গেলেন।

আনন্দময়ী সুনীলের মাথা কোলে নিয়ে বসে আছেন; তিনি কপালে মুখে হাত বুলিয়ে ডাকলেন 'সুনে।'

চোখ খুলে যেন আতঙ্কে বলে উঠলো, 'যেও না মামণি যেও না।'

'যাবো কোথায়, আমি তোর কাচে থাকতে এসেচি বাবা।' আনন্দময়ী তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন। সুপ্রকাশ একটা ডিসে কাটা আপেল, বেদানা, আঙুর, লেবু, বাদাম কিসমিস, খেজুর সাজিয়ে আনন্দময়ীকে বললে, 'ও কদিন কিছুই খায়নি, দেখুন যদি পারেন খাইয়ে দিন কাকীমা।'

'সুনে! ও সুনে! একটু খাও বাবা।'

'ভাল লাগছে না।' মাথা নাড়লো সুনীল। আনন্দময়ী তার মাথাটা তুলে ধরে আপেল মুখে চেপে ধরলেন। তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সুনীল। ছোট ছেলের মত তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বললেন আনন্দময়ী, 'খাও বাবা কতদিন আমার হাতে খাওনি, না খেলে আমি যে কষ্ট পাবো!' তার মুখে আপেল চেপে ধরলেন একটা একটা ফালি। সুনীল খেয়ে চললো, তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে। সুপ্রকাশ হাসিমুখে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে খেয়ে চললো সুনীল। ডিস শেষ করে আনন্দময়ী জলের গেলাস মুখে ধরলেন, অনেকটা জলও খেলো সুনীল। চেয়ারে বসে ফণীবাবু দেখতে লাগলেন। ওদিকে স্টুডিওতে সুলেখা একমনে একটার পর একটা ছবি দেখে চলেছে। সুপ্রকাশ উঁকি মেরে লক্ষ্য করে, ওঘর থেকে এটাচী নিয়ে এসে বললে, 'দেখ সুনীলের গোপন শিল্পকলা।' তক্তাপোষে বসে এটাচী খুলে ছবি তুলে দেখতে লাগলো। তার মন মোচড় দিয়ে উঠলো।

এক কাপ চা এনে দিয়ে সুপ্রকাশ বললে, 'এ সব পারীতে আঁকা।'

সে চলে গেল সুনীলের ঘরে। আনন্দময়ী বেড প্যান, গামছা জল রাখতে বললেন খাটের তলায়। সুনীলকে জড়িয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সুনীল কোন শব্দ না করে শুয়ে রইলো। ছেলে মায়ের বুকে গভীর নিদ্রায় যেন হারিয়ে গেল। সুপ্রকাশের ওষুধ খাওয়ানোর কথা মনেই রইলো না।

ফণীবাবু বললেন, 'চলো আমরা বৈঠকখানায় বসি।' তিনি তাকিয়ায় গড়িয়ে গেলেন বললেন, 'সুপ্রকাশ এ কদিন তোমার চাকরীর কি অবস্থা হলো?'

'যাওয়া হয়নি।' হেসে বললে সুপ্রকাশ।

'বেশী দিন তো এরকম চলবে না।'

'ভেবেছি এক মাসের ছুটি নেবো বিনা বেতনে।'

'না তার দরকার হবে না, আমরা তো রয়েছি। আমি আজ রাত্রে একবার ডাক্তারের কাছে যাবো। উনি যদি বলেন, সুনীলকে হেদোর বাড়ীতে এম্বুলেন্সে নিয়ে যাবো। দু' জায়গায় সামাল দেওয়া শক্ত হবে। তোমার কলেজ, আমার কলেজ, সুলেখার স্কুল, মণ্টুর কলেজ, একা তোমার কাকীমা সকলের ভরসা!'

'ঠিক বলেছেন, আপনি যা ভাল মনে করেন করুন আমার আপত্তি নেই।'

ফণীবাবু চমকে উঠে বললেন, 'মণ্টু কোথায় দেখচি না?'

সুপ্রকাশ বললে, 'কাছেই চিড়িয়াখানা, ও একটু ঘুরে আসতে গ্যাছে আমাকে বলে।'

'তুমি একটু গড়িয়ে নাও সুপ্রকাশ। তোমার অনেক ধকল গেল, আর চিন্তা করো না, একটু ঘুমোও, আমিও গড়িয়ে রাত্রে ডাক্তারের ওখানে যাবো। সুপ্রকাশ বললে, 'আমি সামনের গেটটা দিয়ে আসি।' উঁকি মেরে দেখলে সুলেখা একমনে ছবি দেখে চলেছে। সাড়া না দিয়ে সে বৈঠকখানায় এসে শুয়ে পড়লো। রামুকে বলে, 'মণ্টুবাবু এলে গেট খুলে দেবে সিঁড়ির।'

॥ ১০ ॥

চেনা চেনা গন্ধ, কণ্ঠ, শব্দ, সুনীল কি স্বপ্ন দেখছে কৈশোরের? ময়লা তোলা গাড়ীর শব্দ, ঝাড়ুদার পানিদারের শব্দ, জলে ধোয়া সোঁদা গন্ধ, তালে বাঁধা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ যেন কত যুগ পরে আবার শুনতে পাচ্ছে। ভোরে শিশুদের ইস্কুলে যাওয়ার হাসি, কাকলি সব যেন ভেসে আসছে চৈতন্য উন্মেষের কুয়াশায়! সুনীল নিশ্চিন্ত হলো মামণির গলা শুনে 'কামিনী দেকে আয়, দাদাবাবু উটেচে কি না।'

কদিন ধরে ঘুমিয়ে আর স্বপ্ন দেখে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। ভাল করে চোখ খুললো, চারিদিক দেখলো, আবার দেখলো মনটা নেচে উঠলো, বিছানায় হাত বোলালো, শুঁকলো, এ তো মামণির বিছানা, পাশে বালিশে হাত বোলালো শুঁকলো মামণির গন্ধ। বালিশ বিছানা আঁকড়ে ধরে আবার শুয়ে পড়লো, মাথা ঘসতে লাগলো। দুর্বল শরীরে আবার এলিয়ে পড়লো। কড়িকাঠে টিকটিকি দুটো ছোটাছুটি করছে, বারান্দা চড়ুই জোড়া চিক্‌চিক্ ঘরে আসছে আবার ঘুরপাক খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দরজা দিয়ে,

চিরকালই এমনি করে আসে যায় সব বাসার গরমে। মামণির ঘর, কি ভালই না লাগছে সেও এই ঘরে ফিরে এলো স্বপ্ন নয় সত্যি। 'আঃ' করে হালকা একটা নিশ্বাস নিল। আর তার কিছু করার নেই, কিছু ভাবার নেই, কোন দায়িত্ব নেই, ভাবনা নেই, ভুল করার ভয় নেই, কোথাও কৈফিয়ৎ দেবার নেই, দোষখণ্ডনের দায়িত্ব নেই, অপরিচয়ের অস্বস্তি নেই, মামণি আছে নির্ভাবনা সব সামলে নেবে, মা-মামণি।

সুলেখা! মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা যন্ত্রণা, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'নেই না না সেই সুলেখা নেই!' মাথাটা আবার ধরে উঠলো, চোখ বুজে বালিশে মুখ গুঁজলো।

ট্রেতে চা খাবার নিয়ে আনন্দময়ী ঘরে ঢুকলেন। কামিনী জলের বালতি, বেডপ্যান, গামলা তোয়ালে দাঁত মাজন সাবান এনে ঘরের কোণে নর্দমার ধারে রাখলো। আনন্দময়ী গিয়ে সুনীলের মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকলেন, 'সুনে ওঠ অনেক বেলা হয়েছে বাবা, চা খেয়ে নে মুখ ধুয়ে।'

সুনীল চিৎ হয়ে চোখ খুললো, বললে, 'মামণি আমায় ফিরিয়ে এনেছো আর তাড়িয়ে দেবে না তো?'

তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন আনন্দময়ী, 'কি যে সব বলিস পাগল ছেলে!' সুনীল উঠে বসলো। 'দাদাবাবুর দাঁত মাজন গামলা দে জল দে এইখানেই (বিছানায় তোয়ালে বিছিয়ে) বললেন আনন্দময়ী, 'এইখানেই মুখ ধুয়ে নে আমি গামলা ধরচি।' সুনীল দাঁত মেজে কামিনীর দেওয়া জলে সাবধানে মুখ ধুলো, চোখ মুখ ধুলো। গামলায় এ সব করা ভাল অভ্যাস হয়ে গেছে পাল্লীতে। কলের জলে, জল ছিটিয়ে মুখ ধোয়া ভুলে গেছে। তার হাতে তোয়ালে নিয়ে আনন্দময়ী বললেন, 'আগে তো এককাপ চা খাবি সুনে?'

'হ্যাঁ মা।' চায়ের কাপ হাতে দিলেন।

সুনীল একদৃষ্টে আনন্দময়ীর দিকে চেয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলো। হেসে আনন্দময়ী বললেন, 'কি দেখছিস সুনীল এমন করে?'

ম্লান হেসে সুনীল বলল, 'কতদিন তোমায় দেখিনি মামণি, কতদিন। তুমি বেশ রোগা হয়ে গ্যাছ তাই মুখটা সুলেখা সুলেখার মত লাগছে! রোগা হয়ে গ্যালে কেন মামণি, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল?'

'না তো।'

'তবে?'

'কি জানি।'

'মামণি তুমি আমায় গোপন করছো, এরপর আমিও আমার কোন কথা বলবো না।' অভিমানী স্বরে সুনীল বললে।

আনন্দময়ী যেন প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'এই ক'বছর নানা ব্যাপারে চিন্তায় চিন্তায় কাটাতে হয়েছে, ওঁর চিন্তা, তোর চিন্তা, সুলেখার চিন্তা, সংসার চিন্তা!'

'আর?'

'আর কি?' হেসে বললেন।

'আমার ওপর রাগ, ঘেন্না?'

'মোটেই নয়।'

হাত বাড়িয়ে সুনীল বললে, 'আমায় ছুঁয়ে বল!'

'তুই এত দুষ্টু! ঘেন্না রাগ হবে কেন?'

'ছুঁয়ে বল!' এক চড় মেরে তার হাত ধরে বললেন, 'ঘেন্না রাগ কোনটাই হয়নি, ছেলেরা ভুল করলে মা বকে, মারে, সেটা কি ঘেন্না রাগ?'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে, আনন্দময়ীকে জড়িয়ে ধরে সুনীল বললে, 'মা মা মামণি।'

'ছাড় ছাড়! খাবার খেয়ে নে, নিজে খাবি না আমি খাইয়ে দেবো?'

একগাল হেসে সুনীল বললে, 'আমি আস্তে আস্তে খেয়ে নেবো তুমি কাজে যাও।' তিনি উঠে গ্যালেন।

চোখ বুজে শুয়ে আছে সুনীল, মণ্টু এসে ঘরে ঢুকলো ডাকলো, 'সুনেদা!'

চোখ খুলে সুনীল বললে, 'এসো এসো তোমায় তো দেখতেই পাচ্ছি না!'

'কি করে পাবে বলো, আমাদের মত সাধারণ বস্তু কি তোমাদের চোখে পড়ে?'

'কথা মানলুম কিন্তু অসাধারণ হলেই উত্তম দ্রষ্টব্য হবে এটা কোন্ কেতাবে পড়েছ মণ্টু?' একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে সুনীল, 'বসো, কয়েকটা খবর জানতে চাই।' মণ্টু বসলো, সুনীল প্রশ্ন করলে, 'তুমি কি পড়ছো?'

'সেকেণ্ড ইয়ার বিজ্ঞান।'

'ওরে বাবা তোমায় সমীহ করে চলতে হবে, আমি মাত্র ম্যাট্রিক, রোলিং রোলিং!'

'যাও ঠাট্টা করো না আর দিদি যে ইংলিস অনার্স নিয়ে বি-এ, তাহলে তুমি তাকে নাম ধরে ডাকবে না, খাতির করবে!'

'নিশ্চয়, আমায় এখন ডাকতে দেখেছো? যাক দ্বিতীয় খবর চাই, আমি ছিলুম কালীঘাটের কেঁঙালী, হঠাৎ কি করে রাতারাতি হেতুয়ার কলকাত্তিয়া বাবু হয়ে পড়লুম, এ সম্বন্ধে তোমার কোন সংবাদ জানা আছে?'

'সম্পূর্ণ নিজস্ব সংবাদ, ডাক্তারবাবু ও প্রোফেসরবাবু ষড়যন্ত্র করিয়া এ্যাম্বুলেন্স সাহায্যে

আপনাকে মাদক প্রয়োগে নিদ্রিত করিয়া, কেম্বিশের বোলায় উঠাইয়া, আপনার পরমাত্মীয়া আনন্দময়ী দেবীর মাধ্যমে অপহরণ করিয়াছেন, কালীঘাট রাজপ্রাসাদ হইতে। সেখানের মন্ত্রী সুপ্রকাশ ও সেনাপতি রামচন্দ্রের বিনা বাধায়; তাঁহারা অহিংস ছিলেন বিনা রক্তপাতে ইহা ঘটিয়াছে, এক্ষণে সর্বত্র শান্তি স্থাপন হইয়াছে দাদা। এইবার বিদায় দিন, আমার বিদ্যামন্দিরে হাজিরা দিতে হইবে।' সুনীল খুব হাসতে লাগলো মণ্টুর বাক্‌চাতুরী দেখে। আজকাল ছেলেরা অনেক স্মার্ট হয়েছে আমরা এ বয়সে বোকা বোকা ছিলুম।

ডাক্তারের উপদেশমত, আনন্দময়ীর তত্ত্বাবধানে দুপুরে খাওয়া সেরে যে ঘুমিয়েছিল ওষুধ খেয়ে সুনীল, সন্ধ্যার পর ঘুম থেকে উঠলো। টেবিলে দেওয়া চা জুড়িয়ে জল; সেইটে তুলে খেতে যাচ্ছিলো, বারান্দা থেকে শোনা গেল, 'ওটা খেও না গরম চা এনে দিচ্ছি।' কে যে বললো ঘুমের ঘোরে বোঝা গেল না, কাপ রেখে বসে রইলো।

একটু পরে পুরোনো দেখা শাড়ীর রঙ চোখে পড়তে চিনে নিলো; চোখ মুখ কপাল শক্ত হয়ে উঠলো, সুলেখাকে কাপ হাতে আসতে দেখে পেছন ফিরে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললে, 'তুমি কেন এলে, কামিনী ছিল না!'

চা নামিয়ে দিল। কিছু বলতে পারলো না তড়িৎগতিতে বেদনার্ত সুলেখা ফিরতে গিয়ে কাপড়ে পা আটকে হোঁচট খেলো, মুখে একটা শব্দ করে পাটা টিপে নিয়ে চলে গেল। শান্তিপুরী শাড়ী সে বহুদিন পরেনি, খদ্দরের একটু খাটো শাড়ী পরে। সুনীল ফিরে দেখছিল কোন সাড়াশব্দ করেনি। সুলেখা রান্নাঘরে গিয়ে বললে ভাঙা গলায়, 'মা, তুমি যাও চা দিয়ে এসেছি খাবে কি না জানি না। মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে, সাড়া না দিয়ে।'

অবাক হয়ে আনন্দময়ী বললেন, 'সেকি রে! আচ্ছা আমি জলখাবার নিয়ে এখুনি যাচ্ছি।' আনন্দময়ী দু'বারই চা দিতে পাঠিয়েছিলেন সুলেখাকে। কাল রাত্রে কর্তার কাছে সব শুনে, তাঁর মনের বাধা কাটিয়ে নিয়েছেন। মনের ইচ্ছা ওরা সুখী হোক কিন্তু এ আবার কি? ভাবতে ভাবতে জলখাবার নিয়ে তিনি গেলেন; দেখলেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে সুনীল বসে আছে, চা যেমনকে তেমনি পড়ে। তিনি বললেন, 'চাটা খেলি না আবার জুড়িয়ে যাবে।'

'তুমি যা দেবে খাবো মামণি, তুমি না পারলে কামিনীকে পাঠিও, কিন্তু আর কাউকে দিয়ে নয়।' সুনীল এমন স্বরে বললে যেন ছোটবেলার কোঁদলের সুর।

একটু হেসে আনন্দময়ী বললেন, 'আচ্ছা বাবা, এখন খাবারটা তো খাও।'

'খাচ্ছি, চা করে দিতে হবে।'

'দেবো! খাও বাছা!' চলে গেলেন। একটু পরে গরম চা নিয়ে এলেন। হেসে বললেন, 'বিলেতে লিলি আন্টি তোর আবদারগুলো সইতো?'

'হুঁ বয়ে গ্যাছে তাঁকে আবদার করতে। ভালবাসতো খুব কিন্তু ওখানে ঘড়ি ধরে খানাপিনা, সময়ে খাবে তো খাও নয়তো টেবিলে ঢাকা দেওয়া রইলো, যখন খুশী নিজে খাবে। দেখো মামণি ওরা একেবারে আলাদা। সহানুভূতি ভালবাসা স্নেহ সব আছে কিন্তু কোথায় যেন আমাদের সঙ্গে ফারাক। ভাল না খারাপ বলতে পারবো না তবে তফাৎ। আমরা অভাবে পড়লে মানিয়ে নিই, ওরা উন্মত্ত হয়ে যায়। যে করেই হোক অভাব পূরণের রাস্তা খোঁজে। মানুষ যে আত্ম-সংযমের মধ্যে দিয়েও সুখ শান্তি পেতে পারে ওরা বিশ্বাস করে না। খরচ হৈ হৈ নেশাভাঙ এই ওদের আনন্দ। পয়সার কম পড়লে জানোয়ারের মত খাটুনি তাতেই গর্ববোধ। গ্রামে কিছুটা আত্মতুষ্টি আছে, শহরে ওসবের বালাই নেই।'

এক মনে সুনীলের কথা শুনতে শুনতে আনন্দময়ীর আশঙ্কা কেটে যাচ্ছে সুনীলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে; একদিনে কত সুস্থভাবে কথা বলচে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই হেঁটে বারান্দায় যেতে পারবি।'

'বল না এখুনি যাচ্ছি।'

'না না আজ নয় কাল, আমি নাপিত ডাকতে বলবো কাল সকালে। আমার অসহ্য লাগে ওই দাড়িগোঁফ চুল।'

'জানো মামণি, একবার সময়ের অভাবে প্যারীতে আদ হাতের ওপর দাড়ি বেড়ে গেছলো সেলুনে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সময়, অর্থ দুইই খুব বেশী লাগে। ওখানে সবাই নিজেরা সেভ করে নেয়। নয়তো যারা দাড়ি রাখে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। আমার কিন্তু বড় কুটকুট করতো কাজ করার সময় চুলকোতুম, এ দেখে আমার বন্ধু মডেল রীতা একদিন তার ব্যাগে দাড়ি কামানোর সাজসরঞ্জাম এনে ফোয়ারার ধারে বসিয়ে দাড়িগোঁফ পরিষ্কার সেভ করে দিয়েছিল নাপিতের মত ভালভাবে। ও আমাকে ডাকতো ইয়োগী বলে, ওরা যোগীকে ইয়োগী বলে, ব্রাহ্মণ ভারতীয়দের সবাই যোগী, খুব সম্মানের চোখে দেখে। তার ওপর আমি মদ সিগারেট খাই না আমাকে সবাই খুব ভালবাসতো মামণি।' বিস্ময়ের চোখে চেয়ে রইলেন সুনীলের দিকে আনন্দময়ী। 'আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানো' মামণি, এদের জাতি ধর্ম দেশ ছোট বড় নারী পুরুষ ভেদাভেদ নেই, সকলেই মানুষ সমান মূল্য, আমাদের দেশে হরিজনদের মন্দির প্রবেশ নিয়ে আজও গান্ধীজীকে অনশন করতে হচ্ছে। দুনিয়ার কোথাও তুমি এমনটি পাবে কিনা জানি না ফরাসীদেশে নেই।'

সুনীল ছটফট করছে দেখে আনন্দময়ী বললেন, 'আর নয় সুনীল অনেক কথা বলেছ।' তার কাঁধ ধরে শুইয়ে দিয়ে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগলেন। শান্ত হয়ে সুনীল চোখ বুজলো; ঘুমিয়ে পড়তে আনন্দময়ী চলে গেলেন।

আনন্দময়ী রান্নাঘরের দিকে যেতেই কামিনী বললে, 'তুমি যাও মা, দিদিমণি খুব কাঁদছে বিছানায় শুয়ে।'

ফুঁপিয়ে কাঁদছে সুলেখা বালিশে মুখ চেপে। তার গায়ে হাত রেখে আনন্দময়ী বললেন, 'কি হয়েছে মা বল এত কান্নার কি হলো?' কোন উত্তর না দিয়ে সুলেখা ডুকরে কেঁদে উঠলো। 'কেন এত ভয় পাচ্ছিস, সুনীলের সঙ্গে তোর ঝগড়া কি প্রথম হলো? তোর হাতে চা খায়নি বলে এতো কান্না! তোরা আমায় পাগল করে দিবি।'

সুলেখা রাগত সুরে বললে, 'মা তোমার জন্তে আমাকে ও ভুলে গেল, তোমার মনে আঘাত দেবে না বলে নিষ্ঠুরভাবে যত আঘাত আমাকে দিয়ে যাচ্ছে। আজ আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম ওর মুখ থেকে একটু আহা বেরোল না।' অথচ আমার কিছু হলে ও কি না ব্যস্ত হতো। আমি ওর কাছে যাবো না মা, আমায় যেতে বলো না।' কান্নায় যেন ভেঙে পড়লো সুলেখা।

'আমার বুদ্ধির দোষ সকলকে অসুখী করলুম। শচীন ঠাকুরপোকে দুঃখ দিয়েছি, তোকে সুনীলকে দুঃখ দিলুম হয়তো কর্তাকেও দুঃখ দিলুম আমার ভুলে, এ আমি সামলাবো কি করে!' শেষের দিকে গলা ভেঙে গেল আনন্দময়ীর, সুলেখার পাশে শুয়ে পড়লেন। ভয়ে বললেন আনন্দময়ী সুলেখার গায়ে হাত রেখে, 'আমি ওর মন জানি সুলেখা, আমি ওর অভিমান জানি। রাগ অভিমান ওর স্থায়ী হয় না, দপ করে জলে দপ করে নেভে।' সুলেখার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোর বোকা মাকে ক্ষমা কর সুলেখা, আমি তোকে নিজে নিয়ে যাবো ওর কাছে দেখি ও কি করে তোকে।'

'না মা এসব তুমি করো না, যেচে মান কেঁদে সোহাগ হয় না। বেশ আছি, দূরে দূরে আমায় থাকতে দাও।' দৃঢ়ভাবে বললে সুলেখা।

আনন্দময়ী বললেন, 'তুইও তো কম মেয়ে নয় মা, যা ভাল বুঝিস কর, আমি আর মাথা গলাবো না, আমার কাছে তুইও যা সুনীলও তাই।'

'মোটেই নয়, তোমার কাচে সুনীল যা আমি তার সিকির সিকিও নয়, আমি যে মেয়ে।' তাকে একটা আদরের চড় মারলেন। মায়ের পরিবর্তন দেখে সুলেখা অবাক হয়ে গেছে। আনন্দময়ী উঠে গেলেন! সুলেখা একটি ফরাসী নভেলের ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে।

দিন বারো কেটে গ্যাছে। সুনীল বেশ সুস্থ স্বাভাবিক হয়েছে, শরীরে বল পেয়েছে মামণির যত্নে। মাঝে ফণীবাবু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছলেন। ভাল করে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, 'একদম ফিট, মাস্টার পেণ্টার, দেখেশুনে একটা বিয়ে করে ফ্যালো। সব ব্যাধি নিরাময় হয়ে যাবে আর হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না ম্যাসিয়। মাঝে সুপ্রকাশ প্রায়ই খবর নিয়েছে। সন্ধ্যার পর ফণীজেঠুর লাইব্রেরীঘরে নিয়মিত পড়াশুনা আলোচনা করেছে সুনীল। ফরাসী দেশের নানা গল্প তাদের বিশ্বপ্রেমিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করার সময় ফণীজেঠুর জ্ঞানের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন জেলে গিয়ে তাঁর প্রচুর লাভ হয়েছে, বই পড়ার অফুরন্ত সুযোগ দিনে রাতে। সুপ্রকাশ যেদিন আসে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা তর্কাতর্কি জমে ভাল। ফণীবাবু এত উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ, ছোট বড় বিচার করেন না, সমানে সমানে আলোচনা চালান সুপ্রকাশের সঙ্গে। ফণীজেঠুর মুক্ত মন, দৈবের চেয়ে কর্মে বিশ্বাসী।

বহুদিন পরে মামণির যত্নে আদরে খাওয়া পরা সকল বিষয়ে নিয়মাধীন থেকে তাঁর কাছে শুয়ে আদর খেয়ে মনের সব গ্লানি মুছে গ্যাছে। মুখের লাবণ্য ফিরে পেয়েছে একটু মোটাও হয়েছে, মণ্টুর মুখে শুনছে এতদিনে সুনেদা সুনেদা লাগছে, আনন্দময়ী তাকে ধমক দিচ্ছেন, 'বলতে নেই।'

গত বারো দিনে দুবার মাত্র সুলেখাকে দেখেছে। দেখার চেষ্টা অবশ্য করেনি। যদিও বুঝতে পারে কামিনীর কণ্ঠে, 'ঠাকুর দিদিমণিকে ভাত দাও।' ন'টার মধ্যে স্কুলে বেরিয়ে যায়, পাঁচটায় ফেরে; নিঃশব্দে বেরোয়, ফেরে। কামিনীর গলায় শুধু বোঝা যায়, বেরোল কি ফিরলো। রবিবারে বেরোয় ফেরে কিন্তু সময় ধরা যায় না। বারান্দায় তার শাড়ীগুলো শুকোতে দেখেছে, খদ্দরের সঙ্গে রঙীন শাড়ীও থাকে, তবে কমদিন। তার প্রিয় রঙের শাড়ীটা একদিনও চোখে পড়েনি। মামণির ঘর থেকে বাইরের কোন নজর মেলে না, ভাবছে মামণিকে বলবে আর কতদিন জেঠুবাবু লাইব্রেরীতে শোবেন, আমায় এবার দোতলায় শুতে দাও, আমি তো ভালই আছি। দোতলায় গেলে সে রাস্তায় আসা যাওয়া দেখতে পাবে। কতদিন থাকবো এখানে বললেই জেঠু বলেন, তাড়া কিসের যাবে'খন, মামণিও মুখ ভার করেন।

সময়ের একটা বড় গুণ স্মরণীয় ঘটনার তীব্রতা কমিয়ে দেয়। সময়ের আড়ালে অনেক কিছু রূপ, রস, গন্ধ, বেদনা বিরাগ ফ্যাকাশে হয়ে আসে, নয়তো জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতো। রামুদার কথা মনে পড়লো, কাল রবিবার সুপ্রকাশকে নিয়ে বিকেলে খবর নিতে যাওয়া দরকার, তার তো কিছুই ব্যবস্থা করে আসা হয়নি।

গোলদীঘিতে ট্রামে উঠে বসলো সুপ্রকাশ, সুনীল ; সুনীল বললে, 'মাসীমার অবস্থা তো ভাল দেখলুম না সুপ্রকাশ।'

'এর চেয়ে খারাপ হয়েছিল এখন একটু ভাল।'

'কত বয়স হলো?'

'প্রায় নব্বুই হতে চললো।'

'কে দেখাশোনা করে?'

'মাসী আর দীনু।'

'আগে তো কিছু বলিসনি!'

'ভালই চলছিল, হঠাৎ পড়ে গিয়ে!'

'ডাক্তার কি বলেন?'

'হার্টে কিছু নেই যতদিন চলে, তোর অসুখের খবরও দিইনি।'

'বুঝলুম ওর কথায়। তোর বিয়ের ইচ্ছে জানিয়েছিস?'

'ক্ষেপেছ! হার্টফেল করবে।'

'বড় মুস্কিল!' চিন্তিতভাবে সুনীল বললে।

সুপ্রকাশ বললে, 'জীবন মানেই মুস্কিল ছেড়ে দে, তোর কেমন চলছে বল।'

'খুব খারাপ, আড়ালে আড়ালে যায় মোর পানে নাহি চায়, কি করি বল তো আজ দশদিন হয়ে গেল আমার রাগ জলবৎ তরলং আর ওদিকে জমাট বরফ!'

'তোমারও যেমন বাড়াবাড়ি, চা খাব না! চা দিতে তো এসেছিল, চায়ের সঙ্গে কোন বা টা-ও মিলে যেতো এখন বুড়ো আঙুল চোষ, ইডিয়েট!'

'আবার গালমন্দ আরম্ভ করলি?'

'কি করবো তোর জ্বালায়।' চুপচাপ দু'জনে রইলো।

দুপুরের রাস্তা ফাঁকা, প্রাণভরে ট্রাম দৌড়চ্ছে। ধর্মতলায় নেমে কালীঘাটের ট্রামে চাপলো, কণ্ডাক্টার ছয় পয়সার টিকিটের আদখানা ছিঁড়ে নিলে। ট্রাম ছুটলো গড়ের মাঠের গা ঘেঁসে। সুনীলের মন ভরে উঠলো, মাঠ ময়দান গাছ ঘাস আকাশ চার্চ ভিক্টোরিয়া, বহুদিনের অদর্শনে প্রিয় মিলন মুহূর্ত।

'একেবারে বোবা হয়ে গেলি যে!'

'তুমি চোখ বুজে কবিতা ভাবো, আমি চোখ খুলে কবিতা আঁকি।' হেসে বললে সুনীল, আবার বললে 'তুমি দুঃখ করে বল, প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য অন্ধ কারাগারে চিরন্তন বন্দী করে রেখেছ আমারে। আপশোস করো বসে বসে, আর আমি নির্মম নির্মাতাকে

ধন্যবাদ জানাই নীল আকাশের দিকে চেয়ে, সবুজ ঘাসের দিকে চেয়ে, কি বল কবি? তুমি বিধাতার দেনা শোধ করবে, আমি দানগ্রহণ করবো।'

'খুব একটা ল্যাং ঝাড়লে ভায়া বুদ্ধদেবকে ধার করে। আচ্ছা তোলা রইলো।'

তাদের নামার স্টপ এসে গেল তারা নেমে পড়লো।

সুনীলের বাড়ীর দোতলার গেটে নাড়া দিতে হাসিমুখে রামু এসে গেট খোলার সময় বললে, 'বুড়ো কি খেল না খেল, মরলো না বাঁচলো খবর নেই।'

'না খেলে এমন নধর দেহটি আছে কি করে?' সুপ্রকাশ বললে।

'হ্যাঁ বাবা! লক্ষীঠাকরুণ যার সহায়, খালি হাঁড়ি চালে ভরে যায়।'

'ঠাকরুণের ঠিকানা জানাও দাদা, আমরাও চালের জোগাড় করি।' বললে সুপ্রকাশ।

'সেটি হচ্ছে না মন্ত্রগুপ্তির নিষেধ আছে।' বললে রামু।

'আচ্ছা চলো, চাল চাই না, চা দেবে চলো।' সুনীল বললে।

'দাদাভাই রেখে গ্যাছ কিছু? যাবার সময় ডাকাতের মত ভাগলে!'

'তা হলে কি হবে রামুদা, না হয় দোকান থেকে আনো, চা না খেয়ে মাথা ধরছে।' সুনীল ব্যস্ত হয়ে বললে।

দেখি বলে রামু চলে গেল, দুজনে ঘরে ঢুকলো। অবাক বিস্ময়ে সব ঘরদোর আর বাথরুম দেখতে লাগলো। আলমারী খুলে দেখলো সব সাজানো, ঘরদোর যেন পাল্টে গ্যাছে, এ বাড়ী এত সুন্দর ছিল? এ যে ভোজবাজী। বৈঠকখানায়, ট্রের ওপর কাজ করা টিকোসী ঢেকে চা নিয়ে এলো, কাপ ডিস সব ঝকঝক করছে। ট্রের ওপর ম্যাট দিয়ে সব সাজানো হয়েছে, যেন বড় হোটেল।

রামু বললে, 'দুধ নেই ওই কন্দমিল্ক আছে ওতে চলবে।'

অবাক হয়ে দুজনে চাওয়াচাওয়ি করল। সুনীল কাপে চা ঢেলে তৈরি করে চুমুক দিয়ে বুঝলো, এ চা রামু কিনতে পারবে না। মালিকের স্বরে রামুকে বললে, 'বাড়ী সাজানো, চা খরিদ এ সব কে করলো? কাকে থাকতে দিয়েছিলে আমায় না জানিয়ে সত্যি বল।'

'বলা নিষেধ।'

'ভাড়া দিয়েছিলে?'

সুনীলের দিকে কড়া চোখে চেয়ে রাগতভাবে রামু বললে, 'আমায় বিশ্বাস নেই? সব জানতে পারবে, এখন চা বিস্কুট খাও জুড়িয়ে যাবে।'

সুনীল এই স্বর চেনে, চুপ করে মাথা নীচু করে চা খেতে লাগলো, সুপ্রকাশ একটু

হেসে কাপ তুলে নিল। রামু চলে গেল। চা খাওয়া শেষে সুনীল বললে, 'সুপ্রকাশ একটু গড়িয়ে নে, আমি ষ্টুডিওটা দেখে আসি।' রামুর কাছে চাবি আনতে গেল। রামু তাকে রান্নাঘরের ভেতরে ডেকে নিয়ে নিম্নস্বরে বললে, 'দিদিমণি চার পাঁচ দিন বিকেলে এসেছেন। গত রবিবারে লোক লাগিয়ে বাড়ী ঝাড়াই পোঁছাই করিয়েছেন। ক'দিন এসে তোমার ছবি আলমারী জামাজুতো সব ঝাড়াঝুড়ি করেছেন। আমার খরচা ফুরিয়েছিল দিয়েছেন, চা চিনি দুধ বিস্কুট কিনে দিয়ে গ্যাছেন, এসব কথা সুপ্রকাশদার সামনে বলি কি করে?'

সুনীল চাবি নিয়ে স্টুডিওর দরজা খুলে চমকে উঠলো। টেবিলের ওপর কি সুন্দর-ভাবে তুলি রঙ সব প্রয়োজনীয় আঁকার জিনিস সাজানো, ঘরের চারিদিক দেখে মুগ্ধ ও ভারাক্রান্ত মনে চেয়ারে বসে পড়লো। সব জায়গায় হাতের কাজ করা ঢাকা, ছাপা খদ্দরের চাদর দেওয়ালের ছবি সর্বত্র হাত পড়েছে ওর। অনুশোচনায় বেদনায় ভরে উঠলো মন। প্রত্যাখ্যানের ছবিটা কেমন যেন দাগ চোখে পড়লো। হাত দিয়ে ছুঁতেই দেখলে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত কাটা। তার পেছনে পেলো একটা চিঠি।

প্রিয়তমেষু, নিজেকে সংযত করতে পারলাম না, তোমার বহু পরিশ্রমের সৃষ্টি কিন্তু এটা আমার চক্ষুশূল। এটা আমি নষ্ট করে দিলুম। কবে এটা খেয়ালের বশে এঁকেছিলে, বিধাতা সত্য করে দিলো, মিথ্যাকে মর্যাদাদানে, আমার মত দম্ভে। স্বপ্নেও কোনদিন যা কল্পনা করিনি। সেদিন থেকে আমি অনুতপ্ত, তোমার কাচে ক্ষমা চাইবার সুযোগ দাওনি! এটা নষ্ট হলো, তুমি স্রষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী, পূরণ কোরো অন্য কিছু করে। আমার ভুলের শাস্তি আর দিও না, আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না, আমায় সেবা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। ইতি সুলেখা (প্রেয়সী নয়, সেবিকা)।

সুনীলের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। মায়া করে কেটেছে ছবিটা টুকরো করে জায়গায় জায়গায় কেটে রাখলো। চিঠিটা পকেটে রেখে, চোখ মুছে ডাকলে, 'রামুদা আর একটু চা দাও চলে যাবো।' মনে মনে বললে, 'পত্নী, সহধর্মিনী, বধূ, গৃহিনী, সেবিকা অনেক মেলে কিন্তু প্রেয়সী মেলা দুর্লভ।' সুনীল চলে গেল বৈঠকখানায়। সুপ্রকাশ তাকে দেখে বললে, 'প্রবলেম, সমাধান।'

'তোমার আবার কি প্রবলেম?'

'যা কিছু প্রবলেম তোমার?'

চিন্তিতভাবে বললে সুনীল, 'তাই তো মনে হয়।'

'আবার কোলাব্যাঙের মত মুখ করেছো?' চটে বললে সুপ্রকাশ।

'কি করি, মুখটাই এই রকম?' সুনীল বললে।

সুপ্রকাশ তাকে ঠেলা মেরে বললে, 'হাসো ভাই হাসো, তুমি জয়ী হয়েছ, প্রমাণ পাওয়া গ্যাছে এখানে।'

'পরক্ষে আমারও হার, মরমে চোরা বাণে!'

'ভালই হলো যাও, সটাং পদতলে উপুড় হয়ে দেহিপদপল্লবমুদারম্ এইটেই প্রবলেম সমাধানের সোজা সটকাট রাস্তা।'

সুনীল যখন বাড়ী ফিরলো সন্ধ্যা পেরিয়ে গ্যাছে। আনন্দময়ী হাত পা ছড়িয়ে বারান্দায় বসে। সুনীল মেজেতেই শুয়ে পড়লো কোলে মাথা দিয়ে। আনন্দময়ী বললেন, 'কি মতলব? দেখা হলো সব?'

'আর বলো না মামণি, ভূতের নেত্য লণ্ডভণ্ড! ছবিটবি ছেঁড়া কাটা একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার!'

সুলেখা ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলো, বললে ভীত কণ্ঠে, 'রামুদা রয়েচেন লণ্ডভণ্ড হবে কেন?'

আনন্দময়ী অবাক হয়ে একবার সুনীলের দিকে চেয়ে, সুলেখাকে বললেন, 'তুই কি দেখেচিস?'

'বলচি রামুদা রয়েচে, ঘরে ঘরে চাবি দেওয়া!' করুণভাবে চাইল সুনীলের দিকে।

সুনীল মুচকি হেসে চোখ টিপে, আনন্দময়ীর দিকে ফিরে বললে, 'ও এমন কিছু না, ঠিক করে এসেছি তোমায় ভয় দেখাচ্ছিলুম।'

'বদমাস ছেলে।' গালে একটা চড় দিলেন।

সুলেখা দুষ্টুমি বুঝে চলে গেল ঘরে। এতদিন চোখ ঘুরিয়ে চলছিল, আজ এক জন্ম বাদে দেখলো মুচকি হেসে চোখ নাচানো, ঠিক আগের মত মুখটা এখনও আছে। মনে আনন্দের দোলা নিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

॥ ১৩ ॥

সুনীল ছবির তলায় পাওয়া চিঠিটা বারবার পড়তে পড়তে চিঠিটা হাতে নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে দোতলার চিরপরিচিত ঘরে। ঘুম ভাঙলো পানিদারের জলের শব্দে। চোখ খুলে দেখলো হাতের চিঠিটা বিছানায় গড়াচ্ছে, তাড়তাড়ি তুলে বালিশের তলায় রাখলো। চিঠিটা পেয়ে যে আনন্দ অনুভব করেছিল, 'সেবিকা' শব্দটায় যেন কাঁটার মত বিঁধে আছে। কাল ওর দিকে চেয়ে মুচকি হেসেছিল, ওর মুখের ক্ষীণ হাসির কোন রেখা ফোটেনি কেমন যেন নীরবে চলে গেল; ওর মজার কথায় আমল দিল না। এই প্রশ্ন নিয়েই সে ঘুমিয়েছে। ঘুম ভাঙায় পর বারান্দায় মুখ ধুয়ে সে আবার শুয়ে

পড়লো। আনন্দময়ী নিজে সকালের চায়ের কাপ নিয়ে এলেন, আশা ছিল ও আসবে। সুনীল ভাবনায় পড়লো, বললে, 'তুমি কেন দোতলায় বয়ে আনছো মামণি, আর যাকে হোক পাঠালেই পারো।'

আনন্দময়ী হেসে বললেন, 'তোমার যে সকলের হাতে রোচে না বাবা!'

'মামনি একটু বসবে কটা কথা আছে।'

'সকালে আমার কাজ নেই?'

মামণির হাত চেপে ধরে সুনীল বললে, 'বেশী সময় নেবো না একটু!'

'কি বল!'

লজ্জিত স্বরে সুনীল বললে, 'আর পাচ্ছি না মেজাজ বজায় রাখতে, কষ্ট হচ্ছে সুলেখার মুখের চেহার দেখে, কি করি এতদিন তো কখনও কথা বন্ধ থাকেনি আগে!'

'যাও মিটিয়ে নাও, এখন সব বড়সড়ো হয়েচ মিটিয়ে ফ্যালো নিজেরা।' আনন্দময়ী বললেন উদাস ভঙ্গিতে।

'মামণি তুমি বুঝছো না এখন আমি বিলেত ফেরত আর্টিস্ট, প্রেস্টিজের প্রশ্ন ভেবে দেখো?'

তার মাথার চুলগুলো নেড়ে আনন্দময়ী বললেন, 'ঝগড়া করার সময় মনে থাকে না? ওরও কি প্রেস্টিজ কম এখন? ও যদি না আসে, তোমাকে যেতে হবে।'

'তোমার সঙ্গে যেতে রাজী।'

'বেশ এখন নয় ওর স্কুলের তাডা, সন্ধ্যেবেলা দেখা যাবে বলে রাখবো, এখন যাই সব কাজ পড়ে।' আনন্দময়ী চলে গেলেন।

সুনীল কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলো। সুলেখার প্রতি তার মনোভাবে কি দেখছেন মামণি, বুঝে উঠতে পারছে না। অসুখের পর মামণির, ফণীজেঠুর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে কিন্তু সেটা কি পরিষ্কার হচ্ছে না, মামণির ব্যবহারে আগেও যা এখনও তাই সেই স্নেহময়ী, একবিন্দু কম নয় বরং বেশী, চিঠিতে সুলেখা প্যারীতে যা সব লিখেছিল, সেটা সাময়িক না অসুস্থতার পর দয়ামায়া? সুপ্রকাশের কাছে শুনে আর কাল চিঠি পেয়ে সুলেখা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত কিন্তু মামণির মনে আমাদের ভাই-বোন সম্পর্ক বজায় রয়েছে কি?

এইসব জটিল প্রশ্ন নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে মনটাকে হালকা করার জন্যে স্কেচ খাতা নিয়ে হেদোর দিকে গেল সুনীল।

সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে কলঘরে মুখ হাত-পা ধুয়ে কাচা পাজামা পাঞ্জাবী পরে দোতলায় ঘরে বসে, আঁটা হাতে কার্টুন ছবি সুলেখার, ভালভাবে ফিনিশ করে টেবিলে

রেখে দিল। কামিনী চা জলখাবার এনে দিয়ে গেল। সে একটু হতাশ হয়ে বসে রইলো খাওয়া শেষে। বেশ কিছুক্ষণ মামণিকে আসতে না দেখে নীচে নামলো, মামণিকে উপাসনায় বসে থাকতে দেখে ফিরে এলো।

উপাসনা সেরে হাসতে হাসতে আনন্দময়ী সুলেখার ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে হাসতে দেখে সুলেখা বললে, 'কি হলো মা, এত হাসচো যে ?'

আনন্দময়ী বললেন, 'মেজাজী বাবু কুপোকাৎ! তোকে বলেছি না কতদিন থাকবে রাগ, সকালে আমার হাত চেপে ধরে বললে, 'আমি আর পাচ্ছি না মিটিয়ে দাও মামণি, মিটমাট করিয়ে দাও। তুই চুল ঠিক করে কাপড় বদলে আয় আমার সঙ্গে, দিনও ভাল চল।' সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে আনন্দময়ী বাইরে গেলেন।

ব্যাকুলতার কম্পন লেগে গেল সুলেখার দেহে। লজ্জা লাগছে কেমন করে যাবে মায়ের সঙ্গে! কাঁপতে কাঁপতে প্রসাধন করলো ওর যেমন পছন্দ চুল বাঁধা, শাড়ীটা বার করে পরলো, আয়নায় দেখে নিল নিজেকে।

আনন্দময়ী ডাকলেন, মন্থরগতিতে বেরিয়ে এলো সাবধানে রেলিং ধরে সে ওপরে উঠলো; আনন্দময়ী ঘরে ঢুকে বললেন, 'তুই ডেকে নিয়ে আয়।'

সুনীল উঠে গেল, তার ধবধবে সাদা মুখ হলো লাল কান পর্যন্ত, কাঁপা গলায় ডাকলে 'সুলেখা ভেতরে এসো।'

সুলেখা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ভেতরে এলো। আনন্দময়ী তার ডান হাত সুনীলের বাঁ হাত ধরে নিয়ে এসে বসালেন বিছানায়। তারপর ব্রহ্মনাম জপ করে সুনীলের হাতের ওপর সুলেখার হাত রেখে বললেন, 'এই তোকে দিলুম সুনীল, তোর মুখপুড়ীকে দেখিস, বড় অভিমানী মেয়ে!'

অবাক বিস্ময়ে সুনীল তাঁর দিকে চেয়ে প্রণাম করলো, সুলেখাও। দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন অশ্রুভরা চোখে, বললেন, 'দাঁড়া একটু মিষ্টিমুখ করতে হয়।' নীচে গেলেন।

সুনীল অবাক স্বরে বললে, 'মামণি তোমায় দিয়ে দিলেন সুলেখা! আমি কত অভিমান করেছিলুম!'

সুলেখা সুনীলের দিকে চেয়ে বললে, 'তুমি সুখী তো ?'

দুহাত বাড়িয়ে সুলেখাকে জড়িয়ে, তার দুটো চোখে কপালে গালে, শেষে ওষ্ঠে চুম্বন করলো। বললে, 'আমার স্বপ্নের প্রেয়সী, সেবিকা কদাচ নয়।' সুলেখা সুনীলের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলো আকুল আগ্রহে।

সিঁড়িতে শব্দ হতে তারা তফাতে দাঁড়ালো। শ্বেত পাথরের রেকাবীতে নানা রকমের

মিষ্টি নিয়ে এসে একটা সন্দেশ সুনীলের মুখে দিয়ে বললেন, 'আধখানা খাবি, আধখানা খাওয়াবি সুলেখাকে।'

'আমার মুখের এঁটো?'

'হ্যাঁ।'

'কি যে করো মামণি!' সুনীল হেসে বললে।

তার মুখের আধখানা সন্দেশ নিয়ে সুলেখার মুখে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে দুজনকে ভাগ করে খেতে হবে মনে রেখো। তোমরা গল্প করো আমি নীচে যাই, কর্তা হয়তো ফিরেছেন।' যেতে যেতে ফিরে এসে বললেন, 'আর ঝগড়াঝাটি করো না বাছা, এখন সামলানোর দায়িত্ব আমার নয়, নিজেদের।' তিনি চলে গেলেন।

সুনীল দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, 'ভুলে যাওয়ার উপদেশ, প্রয়োজনে আজীবন অপেক্ষা করবো সব মাঠে মারা গেল।'

সুলেখা বললে, 'দশ বারোটা ছবি আঁকা, ভুলে যাওয়ার আর একটা নমুনা।' সুনীল বললে, 'দুজনে জেঠুকে প্রণাম করে আসি চলো।' তারা উঠে পড়লো।

লাইব্রেরী ঘরের সামনে যেতেই শুনলে, গল্প আর হাসি কর্তাগিন্নীর। মনে হচ্ছে তাদের নিয়েই হাসি তামাসা কানে এলো ফণীবাবুর গলা, 'বেটারা আমার কাচে তো এলো না আনন্দ?'

'আসবে, আসবে, আগে নিজেদের সামলাতে দাও।' হাসতে হাসতে বললেন আনন্দময়ী।

'তোমার বাবা কিন্তু আমাকে খুব ভুগিয়েছিলেন তোমার জন্যে আমাকে অনেক সইতে হয়েচে।' ফণীবাবু বললেন।

'আমরা যে বড় ছিলুম।' বললেন আনন্দময়ী।

ঘরে ঢুকলো সুলেখা, পেছনে সুনীল। তারা ফণীবাবুকে গিয়ে প্রণাম করলো। ফণীবাবু তাদের মাথায় হাত দিলেন বললেন, 'বস।' দু'জনে বসলো, সুলেখা আনন্দময়ীর পাশে, সুনীল ফণীবাবুর পাশে।

ফণীবাবু বললেন, 'একটা সামাজিক অনুষ্ঠান প্রয়োজন আছে না?'

সুনীল নিম্নস্বরে বললে, 'জেঠুবাবু, আমরা রেজিস্ট্রি করে নিলে হয় না? আপনার কি মত?'

'আমার কোন মতামত নেই এটা তোমাদের ব্যাপার।' ফণীবাবু বললেন।

সুনীল বললে, 'প্রচলিত অর্থহীন অপব্যয় বিবাহ অনুষ্ঠানে এখনকার দুর্দিনে আমার ভাল লাগে না জেঠুবাবু, কন্যাপক্ষকে এর জন্য খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। আমাদের

বরপক্ষ কন্যাপক্ষ যখন একই আমাদের কোন সমস্যা নেই খুব নিকট-জনদের নিমন্ত্রণ করে চা-পানে আপ্যায়িত করা এবং চিঠিতে লিখে দেওয়া উপহার লইতে অক্ষম ফেরত দিলে ক্ষমা করিবেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।'

ফণীবাবু খুশী হয়ে বললেন, 'তুমি সুন্দর প্রস্তাব দিয়েছো বাবা; বাঙালী সমাজের মঙ্গল হবে। আনন্দ তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি সন্তুষ্ট নও। বল তোমার কি বলার আছে।'

আনন্দময়ী বললেন, 'পাঁচজনে কি বলবে? বলবে ফোকটে মেয়ের বিয়ে সেরে দিল, কাউকে পাত পাততেও দিল না, ঘরের বর, বরপণও লাগলো না। আমার সুনীল সুলেখা কিছু পেলো না এ কি করে ভাল লাগে বলো!' দুঃখিত হয়ে আনন্দময়ী বললেন।

একটু গম্ভীর হয়ে ফণীবাবু বললেন, 'আরো পাঁচজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা, গরীব মধ্যবিত্ত কন্যাদায়গ্রস্ত, বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাবে, তাদের মনে সাহস সম্ভ্রম জাগাবে, তোমার কন্যা-জামাতাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবে। এরাও তো পাঁচজন?'

আনন্দময়ী ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, 'তবু তো বিয়েতে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে ছেলেমেয়েরা।'

'তা করুক না ঘরোয়াভাবে, বড়লোকদের বেড়ালের বিয়ে না দেখালে আর আমোদ আহ্লাদ হয় না? আর সেকাল নেই, বদলাতে হবে সব কুঅভ্যাস! আমার মতামত দিলুম এরপর সবাই যুক্তি করে স্থির করো।'

সুনীল বললে, 'আমরা রেজিস্ট্রি করে নি জেঠুবাবু?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। এরপর ঘরোয়া যা করতে চান তোমার মামণি করবেন।'

সবাই উঠে গেল খাবার ঘরের দিকে কামিনীর ডাকে, 'খাবার দেওয়া হয়েছে মা।'

উপসংহৃতি

স্বর্গীয় শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে একটি বিশেষ দিন। প্রফেসর ফণীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে সব অনুষ্ঠান শেষ করে সুনীল সস্ত্রীক ফিরেছে স্বধামে। ফণীবাবু, মন্টু দুটি ঘোড়ার গাড়ী করে সুলেখার নিজস্ব জিনিষ, বই-পত্তর আর কিছু উপহার পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

সুলেখার সঙ্গে এসেছেন আনন্দময়ী ও সুলেখার বান্ধবী হিসেবে গুপ্ত পরিচয়ে, সুপ্রকাশের রেজিষ্ট্রি করা বিবাহিতা নমঃশূদ্র শিক্ষিকা স্ত্রী, সুনীলের অজ্ঞাতে তাকে চমক দেওয়ার জন্যে।

কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠানে অনীহা সুনীলের মনস্তুষ্টির জন্যে সুপ্রকাশ আনন্দময়ীর সঙ্গে গোপনে এই ফুলশয্যা হিসাবে দিনটিকে আনন্দ মুখর করতে চায় নিজেদের মধ্যে।

বিবাহ রেজিষ্ট্রি করার পর কদাচিৎ সুলেখা সুনীলের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, কেমন যেন লজ্জা লজ্জা ভাব উভয়েরই। আইনতঃ স্বামী-স্ত্রী হলেও এ কদিন রাত্রে মায়ের কাছে শুয়েছে সুলেখা, দিনে স্কুলের কাজে। সুনীল ঘোরাঘুরি করেছে হেদোয় রাত্রে দোতলার ঘরে। রাত্রে খাবার সময়ে একসঙ্গে খাওয়া। আনন্দময়ীর মুখে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

মামণির মুখের চেহারা সুনীলের চেনা প্রায়ই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আদর করে, 'কেন এত ভাবনা করছো মা, আমরা তো তোমার কাছেই থাকছি, যখন খুশী তুমি যাবে আমরা আসবো।' ফণীবাবুর কোন পরিবর্তন বাইরে চোখে পড়ে না।

তিনি একদিন খাওয়ার সময় বলেছিলেন, 'তুমি যদি শান্তিনিকেতনে কলাভবনে যেতে চাও আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু কলকাতা ছাড়তে হবে। এখানে কিছু হওয়া ভাল তোমাদের দুজনের জন্যে, আমাদের কাছেই থাকবে। তোমার পাটনার একটা ফয়সালা হয়ে গেলে ভাবতে হবে না। আমি আছি, প্রয়োজনে লজ্জা করো না, শচীনও যা আমিও তাই। শচীন আজ কত সুখী হতো আমি জানি, সুলেখাকে বড় ভালবাসতো সে।' শেষের দিকে তাঁর গলাটা একটু ভারী হয়ে এসেছিল, সামলে নিলেন।

সুনীল আদর্শবাদী মুক্তচিন্তার এই মানুষটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। এ যুগের এঁরাই এখন ভরসা।

ডালি সাজি ভর্তি ফুল, তোড়া গোড়ে মালা, যুঁই, বেল, গোলাপ, রজনীগন্ধা, ঝাউ-পাতা, দেবদারু পাতা ফুলের মেশানো পাপড়ি একটা লোকের মাথায় নিয়ে উঠে এলো।

সুপ্রকাশ। দোতলার বারান্দায় রেখে লোকটাকে পয়সা দিয়ে বিদায় করে চেয়ারে বসে পড়লো। ভেতর থেকে সুনীল এসে ফুলের রাশি দেখে, চটে গিয়ে চেঁচামেচি সুপ্রকাশের সঙ্গে; সুনীলের বক্তব্য শুধু মালা আনলেই হতো এতসব কেন? তাদের চেঁচামেচিতে আনন্দময়ী বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে সুপ্রকাশ বললে, 'দেখুন মামণি, (সেও মামণি বলতে শুরু করেছে) আমার খুশী আনবো, তোর কথায় কি, আমি আমার পয়সায় এনেছি। আমার ইচ্ছে, বোনের ফুলশয্যার জন্যে যদি ফুল আনি, তুই বলার কে? ওই ইডিয়েটটাকে মুখ বন্ধ করতে বলুন নয়তো আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো!'

আনন্দময়ী জোরে হেসে উঠলেন, দরজার আড়ালে দুই যুবতীর চাপা হাসি।

সুনীল তেড়ে এসে বললে, 'আবার গালাগালি, বেরিয়ে যা বলছি—বোনের বিয়ে দেখাতে এসেছে! মামণি তুমি ওকে প্রশ্রয় দিও না, ওর কাণ্ডজ্ঞান নেই!'

'ওঃ কি কাণ্ডজ্ঞানওয়ালা মনিষ্যি! সরে যা মুখ দিয়ে যা তা বেরিয়ে যাবে আজকের দিনে।' সুনীলের দিকে পিঠ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে। ফুলের ডালা সাজি নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন আনন্দময়ী। তখুনি রামু এসে বাকি সব নিয়ে গেল।

একটু পরে চায়ের ট্রে, ডিসে গরম নিমকী নিয়ে রামু এলো, রেখে বললে, 'খেয়ে নাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

দুজনেই বললে, 'যা যা নিয়ে যা।' রামু কিছু না বলে তুলে নিয়ে গেল মুচকি হেসে।

আনন্দময়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কি হলো রামু?'

'ভাববেন না মা, ঠিক হয়ে যাবে আমার দেখা আছে।'

আনন্দময়ী ঘাবড়ে গিয়ে সুলেখাকে বললেন, 'যা দেখ দুজনে কি কাণ্ড বাধিয়েচে। দুদিকে মুখ করে বসে আচে। চা ফেরৎ পাঠালো!'

সুলেখা বারান্দায় গিয়ে দুজনকে দেখে সুনীলের কাঁধে একটা ঠেলা মেরে বললে, 'কি হচ্ছে কি ছেলেমানুষি, মা ভয় পেয়ে যাচ্ছেন!'

সুনীল বললে, 'আচ্ছা সুলেখা, আমাদের কথা ছিল, আমরা বিয়েতে কোন বাড়াবাড়ি হতে দেবো না, ওই বড়লোকটা একগাদা টাকা খরচ করে বোনের ফুলশয্যা করাতে এসেছে! তুমি বলো?'

সুলেখা মুখ টিপে রইলো চোখে হাসির উদ্ভাস।

সুপ্রকাশ চেঁচিয়ে বললে, 'বেশ করেছি খরচ করেছি আমার খুশী, তুই বর তোর এতে নাক গলানো কেন, রাগ হয় না?'

সুলেখা ডাকলে, 'রামুদা চা দিয়ে যাও।' রামু ট্রে আর ডিস নামিয়ে দিল টেবিলে।

চা তৈরী করে সুলেখা এক কাপ সুপ্রকাশের হাতে দিয়ে বললে, 'ওখানে নিমকী নিও।' তারপর সুনীলের হাতে দিয়ে বললে, 'নাও, নিমকী তুলে নাও খেতে বেলা হবে।'

সুলেখা ভেতরে গেল, নীরবে দুজনে চায়ে চুমুক আর নিমকীতে কামড় দিতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে রাগ সব জুড়িয়ে জল, চিন্তিত ভাবে সুনীল বললে, 'সুপ্রকাশ বিকেলে লোকজন আসবে, কি হবে ভেবেছিস?'

'লোকজন বলতে ফণীজেঠু মণ্টু, তুমি আমি, লোকের মধ্যে গণ্য নই, শুধু বাইরের লোক অমিত আর আর্ট স্কুলের বিভাষ ওঁর ভেবে কূল মিলছে না, আকুল মহাশয়!'

দুজনেই চুপচাপ বসে রইলো, কালবৈশাখী ভেসে গেছে। সুলেখা সঙ্গে ছদ্মী বান্ধবী মালতী। সুলেখা বললে, 'প্রকাশদা রেজিষ্ট্রি অফিসে সেদিন বললে তোমার নাকি অর্ধাঙ্গটি হাতছাড়া হলো মানেটা বুঝিনি।'

সুনীল বললে, 'বুঝে কাজ নেই, ভেতরে যাও ডান হাতের ব্যবস্থা—'

কথা শেষ করার আগেই সুলেখা বললে, 'তোমায় চিন্তা করতে হবে না স্বয়ং অন্নপূর্ণা আছেন, আনন্দময়ী দেবী আমাদের ছুঁতে দিলে তো!'

'ঠিক আছে তাহলে বসো একটা গল্প বলি, 'বলদের বিবাহ', সুপ্রকাশের কম্পোজিসন।

সুপ্রকাশ বললে, 'ওটা পুরোন হয়ে গ্যাছে, একটা তো চুকলো।'

'কিন্তু জোড়টির হোক! কি সুলেখা?'

'নিশ্চয় একটা বলদ কাজের বার!'

'একশোবার।' সুনীল বললে।

সুপ্রকাশ হেসে বললে, 'কেন আমার পেছনে লাগলে জোড়মাণিক।'

জাল মালতী এদের কথাবার্তা বেশ মুচকি হেসে শুনছিল।

সুনীল বললে, 'তুই আমার জন্যে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিলি, এখন সুলেখার সাহায্যে কোন কলিগ শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ সংলাপ পরে প্রেমালাপ করে সমস্যা মিটিয়ে ফ্যাল।'

মালতী আর সুলেখার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সুপ্রকাশ নাকে কানে হাত দিয়ে বললে, 'বাবা যা লঙ্কাকাণ্ড করলে, রক্ষা করো প্রেমট্রেমের ব্যাপারে আমি নেই ভাই!'

'ওহো, সাক্ষাৎ 'ফ্রয়েড' নিদেন, গিরীন্দ্রশেখর, জানো সুলেখা, টাকা-পয়সা বাগাবার মতলব আছে প্রেম-ট্রেমে নারাজ।'

সবাই হাসলো জোরে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কারণে।

'হ্যাঁ রে সুলেখা, গুলতুনি করবি না খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবি ? এদিকে একটা বেজে গেল।'

ভেতর থেকে আওয়াজ এলো আনন্দময়ীর। সুলেখা মালতী ভেতরের দিকে গেল সুনীল বললে, 'চল মুখ হাত ধুয়ে নি।'

বেলা পাঁচটার মধ্যেই এসে, অসিত, বিভাস, বৈঠকখানায় হাঁক-ডাক গল্প-গুজব জমিয়েছে সুপ্রকাশ সুনীলের সঙ্গে। একদফা চা এসে গেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরে ঘোর কুয়াশার মত অবস্থা। সুনীল বললে, 'ভাই আমি একটু বারান্দায় বসি, নাক চোখ জ্বলছে।'

'যাও যাও নাবালক!' বললে অসিত।

ছ'টা নাগাদ মণ্টুকে নিয়ে ফণীবাবু এলেন; বৈঠকখানার অবস্থা দেখে সোজা ভেতরে চলে গেলেন। আনন্দময়ী তাদের খাবার ঘরে বসিয়ে দিলেন। সুলেখা, মালতী, সুনীল এসে তাদের সঙ্গ দিল। ফণীবাবু খুশী মনে চারিদিক দেখতে লাগলেন। আনন্দময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়া শেষ করতে চাও কি না ?'

তিনি উত্তরে বললেন, যদি হয়ে গিয়ে থাকে আপত্তি নেই।

সবাই মিলে কাঁচের প্লেট ডিসে সব সাজিয়ে দিল টেবিলে। আনন্দময়ী বললেন, যেটা ভাল লাগে খাও লজ্জা করো না ভেতরে আরো আছে।

ফণীবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'এতসব করলো কে ?'

সুলেখা বললে, 'মা আর রামুদা।'

ফণীবাবু, মণ্টু উঠে গিয়ে ঘরের কোণে হাত ধুয়ে এসে খেতে বসে পড়লো।

মণ্টু বললে, 'সুনেদা তোমার পাঞ্জাবির রঙটা চমৎকার মানিয়েছে।'

'যা ইয়ারকি মারতে হবে না।' সুনীল বললে।

মণ্টু বললে, 'না না সত্যি বলছি!'

আনন্দময়ী বললেন, 'তুমি কিছু খাচ্ছ না যে, ভাল করে খাও ভয় নেই সোডা আনা আছে।'

ফণীবাবু হেসে বললেন, 'আনন্দ সাবেকি আইনে, সন্তানবতী না হওয়া পর্যন্ত কন্যার বাড়ীতে জলগ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল পিতামাতার, আর আমরা চব্যচোষ্য চালিয়ে যাচ্ছি আর কি চাও ? কালে কালে কি হলো দেখছো ?'

খাওয়া শেষে হাত ধুয়ে ফণীবাবু বললেন, 'সুনীল মাস্টার বৈঠকখানায় আমার যাওয়া ঠিক নয়।'

সুনীল তাড়াতাড়ি বললে, 'আপনি আমার স্টাডিতে চলুন, নিরিবিলি আপনার অসুবিধা হবে না।'

সুনীল তাঁকে নিয়ে শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে গেল। তিনি সাজানো ফুলশয্যার ঘর দেখে বললেন, 'চমৎকার সাজানো হয়েছে!'

সুনীল বললে, 'দেখুন না এসব সুপ্রকাশের মতলবে!'

'বেশ তো একদিন বই তো নয় একটু বৈচিত্র জীবনে, দোষের কি?'

তাঁকে বসিয়ে সুনীল বৈঠকখানায় গেল। সবাই খুব জমিয়ে রেখেছে।

একটু পরে খাবার ডাক এলো, চার বন্ধু, দুই কন্যাকে বসিয়ে দিলেন আনন্দময়ী। কাজ সব শেষ হয়ে যাক, মেয়ে সাজানো, ফুলশয্যা আছে। মেয়ে-জামাই ঘরে প্রবেশ করলে, মালতী সুপ্রকাশকে তিনতলার ঘরে তুলে দিয়ে তবে তাঁর ছুটি। ফণীবাবু, মণ্টু, তিনি, আজ বৈঠকখানাতেই শোবেন, চাদর বালিশ পাল্টে, বড় তক্তাপোষ কোন অসুবিধা হবে না।

কনে সাজাতে সময় নিল মালতী। ফুলের মুকুট, কান পাশা, গলার হাতের গয়না সব ফুলের। মুখ, চোখ, গাল, ঠোঁট, চুলের কুন্তল ঢেউ, চোখের ভুরু, কাজলের টান এত নিখুঁত প্রতিমার মত হয়েছে।

আনন্দময়ী চেয়ে চেয়ে বললেন, 'কি সুন্দর হয়েছে মালতী।'

মালতী হাতে লবঙ্গ নিয়ে কনে-চন্দন দিতে শুরু করেছে। আঙুলের ওপর তার শিল্পীর দখল।

সুলেখার সাজা শেষ হতে আনন্দময়ী বললেন, 'আয় মালতী তোকেও একটু সাজিয়ে দি, বড় ম্যাড়-ম্যাড়ে দেখাচ্চে তোকে।' তার রঙ খুব ফরসা বেশী সময় নিলেন না আনন্দময়ী, কনে-চন্দন তার লাগবে না, চোখে কাজল আর ঠোঁটে ফিকে রঙ দিতেই সুন্দর স্বাভাবিক সাজ হয়ে গেল। দুজনেই বিষ্ণুপুরী গরদের শাড়ী ব্লাউজ। সুলেখার সূর্যাস্তের লাল আর সোনালী পাড়। মালতীর কচি কলাপাতা আর রূপালী পাড়।

সাজা শেষ হতে আনন্দময়ী বললেন, 'এইবারে তোরা লুকিয়ে থাক তিনতলার ঘরে, ডাকবো।' আনন্দময়ী ডাকলেন, 'সুনে, সুনে এদিকে আয় বাবা।'

সুনীল এসে দাঁড়াতে তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললেন, 'চুপ করে বস, মুখটা পরিষ্কার করে দি।'

'কেন?'

'কেন কি রে, তুই যে বর, সাজতে হবে না?' গামছা দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে ঘসে, মুখে হেজলিন স্নো মাখিয়ে পাউডার দিয়ে ঝেড়ে দেখলেন ঠোঁটটা একটু রঙ

না দিলে ফ্যাকাশে লাগছে। একে ফরসা রঙ তায় পাউডার দেওয়া। তিনি সাবধানে একটা আঙুলে রঙ নিলেন।

সুনীল চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি করো মামণি, তুমি আমায় ভূত করে ছাড়বে।'

'ভূত না ভবিষৎ পরে দেখো।' সাবধানে ঠোঁটে রঙ দিয়ে মুছে দিলেন, তারপর কপালে গালে লবঙ্গের ফোঁটা দিয়ে বললেন, 'এতক্ষণে বর বলে মানাচ্চে।'

সুনীল হেসে বললে, 'বর নয় বরবর।'

'বেশ তাই, এখন যাও ওই কাপড় জামা পরো।'

'সিল্ক আমি পরবো না।'

'ওগুলো হাতে কাটা গরদের, বিয়ের সময় সবাই পরে।'

'আমি বাইরে যাচ্ছি তুমি পরে নাও।'

কাপড় জামা পরার পর আনন্দময়ী বললেন, 'দেখ তো কত সুন্দর দেখাচ্চে, যা তোর ঘরে বসগে যা, আর বাইরে বেরোবি না।'

সুনীল তাকে প্রণাম করতে তার মাথায় চুমু খেয়ে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা।'

অনাড়ম্বর বিবাহের জন্যে আনন্দময়ীর অন্তরের ক্ষোভ আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লোপ পেলো। খুশী মনে আজ সব কিছু করে চলেছেন।

সুনীল গিয়ে আরাম কেদারায় বসে, দেখলে ঘরের চারিদিকে শয্যায়, ফুলের সাজানো কৌশল, রঙ মেলানো সাধারণ হাতের নয় নিপুণ শিল্পচেতনা স্পষ্ট! দেখতে দেখতে সময়ের জ্ঞান ছিল না। সারা বাড়ী নিঝুম নিস্তব্ধ; দরজা দিয়ে যেন স্বপ্নের পরী দুটি এসে ঢুকলো মন্থর পদক্ষেপে, তাদের পেছনে আনন্দময়ী, সুপ্রকাশ, মণ্টু, রামু।

আনন্দময়ী ডাকলেন, 'এদিকে আয় সুনীল।' সুনীল সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আনন্দময়ী বললেন মালতীকে দেখিয়ে, 'বৌদিকে প্রণাম করো।'

সুনীল হতবুদ্ধি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চোখে সকলের দিকে তাকালো।

আনন্দময়ী আদেশের স্বরে বললেন, 'প্রণাম করো 'তোমার বৌদি।'

প্রণাম সেরে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সুনীল বললে, 'কে মামণি, কি বললে?'

'সুপ্রকাশের বৌ, তোমার গুরুজন।'

চেঁচিয়ে উঠলো সুনীল, 'শালা আমা…। ইস্ মামণি তুমি এখানে! চলে যাও আমি ওকে দেখছি।'

সকলে খুব হাসতে শুরু করলো, সুপ্রকাশ মামণির পেছনে দাঁড়ালো, সুলেখার মুখে মোনালিসার হাসি, মালতী মাথা নীচু করা।

'বৈজ্ঞানিক! প্রেমট্রেমে বিশ্বাসী নয়, আর ডুবে ডুবে এত! আমি আমার সব

কথা বলেছি, ওই বদমাসটা আমায় ঘূণাক্ষরে জানতে দেয়নি। বিশ্বাসঘাতক আমায় বেকুফ বানিয়ে দিল।'

'বেকুফ যখন হয়েছ এখন নিজের মালা বদল শেষ করে মামণিকে ছুটি দাও, সারাদিন একদণ্ড বসতে পাননি।' সুপ্রকাশ বললে।

সুনীল মামণির কাছে গিয়ে বললে, 'আর কি করতে হবে বল মা!'

আনন্দময়ী বললেন, 'ঐ যে বিছানায় এসে বসো দু'জনে।' ওরা গিয়ে বসলো। আনন্দময়ী দু'জনের হাতে দুটো গোড়ে মালা দিয়ে বললেন, 'দু'জনে মালা পরে নাও, বদল করো।' মালতী সুলেখাকে সাহায্য করলো, সুপ্রকাশ সুনীলকে, তিনবার মালা বদল করিয়ে ফুল ছড়িয়ে সবাই বেরিয়ে ঘরের দরজা টেনে দিলো।

সুনীল গিয়ে চারিদিকের দরজা পর্দা দেখে, বিছানার কাছে এসে দেখলো, সুলেখা যেন শঙ্কিল অসাড়, মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁটের সেই হাসি নেই, আচ্ছন্নভাবে খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে বসে।

ভয় পেয়ে সুনীল ব্যাকুলভাবে বললে, 'কি হোল সুলেখা, তুমি কি অসুস্থ? শরীর খারাপ লাগছে?'

তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে সুনীল বললে, 'কি হয়েছে বল সুলেখা, যাতে তোমার সুবিধে হয়, যে ভাবে তোমার আরাম লাগে, তুমি সেইভাবে শোও; আমি আঁকার ঘরে চলে যাচ্ছি, তোমার কোন ভয় নেই তুমি নিশ্চিন্ত শুয়ে পড়ো।'

সুনীল যাবার জন্যে পা বাড়াতেই সুলেখা দু'হাত বাড়িয়ে বললে লজ্জা জড়ানো কণ্ঠে, 'সুনীল যেও না, আমায় আর ছেড়ে যেও না।'

সুনীল ফিরে গেল তার পাশে, সুলেখা তার বুকে মুখ লুকিয়ে খুব আস্তে বললে, 'আমার বড় ভয় করছিল, বড় লজ্জা করছিল!'

সুনীল ভীত স্বরে বললে, 'তোমার মুখের পরিবর্তন দেখে আমার সেই ভয়াবহ রাত্রের কথা মনে পড়েছিল।'

সুনীলকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চোখে গালে বারবার চুম্বন করতে করতে সুলেখা কান্নার সুরে বললো, 'আর কোনদিন যেন সেদিনের কথা তোমার মুখ থেকে শুনি সুনীল। তুমি আমাকে নাও, পুরোপুরি নাও, আমার সমস্ত দেহমন তোমার সেবায়, তোমার জন্যে। আমায় তুমি নাও। আমি অনেক প্রতীক্ষা করেছি, অনেক পরীক্ষা পেরিয়ে এসেছি, শুধু তোমারি জন্যে। আমায় তুমি নিঃসংকোচে নাও, আমি তোমারি সুনীল, একমাত্র তোমারি প্রেয়সী হতে চাই।